প্রকাশ : জুন ২০২৩
(Published on : June, 2023)

Edited by : Partha Acharya

Co-Editor : Abhijit Mondal

First Cover : Yalanda de Sousa
4th Cover : Arpita Acharya

Illustration : Nemai Dasgupta

Published by :
Partha Acharya
Kalyannagar, Panshila,
Kolkata 700 112

বিশ্ব কবিতা সংখ্যা
(international poetry issue)

সমান্তরাল ভাবনা
samantaral bhabna

সম্পাদক
পার্থ আচার্য

সহ সম্পাদক
অভিজিৎ মণ্ডল

প্রচ্ছদ
প্রথম প্রচ্ছদ : ইয়োলান্দা ডি সুসা
চতুর্থ প্রচ্ছদ : অর্পিতা আচার্য

অলংকরণ
নিমাই দাশগুপ্ত

শব্দগ্রন্থন ও বিন্যাস
অরিন্দম দাস

প্রকাশক
পার্থ আচার্য কর্তৃক কল্যাণনগর পানশিলা
কলকাতা ৭০০ ১১২ থেকে প্রকাশিত

Website: www.samantaralbhabna.com
email: avijitmondal54@gmail.com
Contact : 8240440205 / 8768716678

মুদ্রক
জ্যোতি গ্র্যাফিক্স
৬-ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিনিময়
৩৫০.০০ টাকা
(350.00/-)

samantaral bhabna
ISSN : 2455-3700

সম্পাদকীয়

কথা দিয়েও রাখতে না পারার যন্ত্রণা বোধকরি একজন সম্পাদকই সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তাই আবারও মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি পত্রিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের দরুন। প্রচলিত ধারার বাইরে দাঁড়িয়ে 'সমান্তরাল ভাবনা' চিরকাল ব্যতিক্রমী কলমের অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে, প্রাধান্য দিয়েছে বিশ্ব ভাষাচর্চার মুক্ত চিন্তাকে—এ সংখ্যাতেও তার অন্যথা হয়নি।

আন্তর্জাতিক লেখক ও কবিদের লেখা মূল ভাষায় প্রকাশিত করে থাকি আমরা। তবে এই সংখ্যায় সার্বিক পাঠকের কথা চিন্তা করে কিছু কবিতার ইংরেজি তর্জমাও মূল লেখার পাশাপাশি রইল।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কবি ও লেখকরা যেভাবে তাঁদের সৃষ্টিকে নিঃসংকোচে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আশা রাখি ভবিষ্যতেও এভাবে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আরও সুদৃঢ় হবে বিশ্ব সাহিত্যের এই পারস্পরিক সেতু। মুদ্রিত পত্রিকার পাশাপাশি 'সমান্তরাল ভাবনা'-র নিজস্ব ওয়েবসাইটেও আমরা নিয়মিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য প্রকাশ করে থাকি, আশাকরি পাঠক সমান উৎসাহে সেগুলিও পড়বেন।

পার্থ আচার্য

২৫ মে, ২০২৩
কলকাতা

Editorial

Perhaps only an editor understands the pain of not being able to put it into words. So once again I apologize for this unintentional delay in publishing the magazine. Standing outside the mainstream, 'Samantaral Bhabna' has always sought out exceptional pens, championing free thought in world linguistics—and this issue is no different.

We publish the writings of international writers and poets in their original languages. However, in this issue, considering the general readership, the English translation of some poems was also kept along with the original text.

I am grateful to poets and writers from all over the world for freely sharing their works with us.

Let's hope that this mutual bridge of world literature will be stronger with your sincere co-operation in the future as well. In addition to the printed magazine, we regularly publish literature in different languages on 'Samantral Bhabna's own website, hopefully the readers will read them with equal enthusiasm.

Partha Acharya

25 May, 2023
Kolkata

সূচিপত্র

কবিতা

কালীকৃষ্ণ গুহ ... ৭
দেবদাস আচার্য ... ৮
নন্দদুলাল আচার্য ... ৯
বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ... ১১
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩
নিবেদিতা আচার্য ... ১৫
সার্থক রায় চৌধুরী ... ১৯
গৌতম মণ্ডল ... ২১
বিদিশা সরকার ... ২৩
দীপঙ্কর বাগচী ... ২৮
শবরী শর্মা রায় ... ৩০
শোভন ভট্টাচার্য ... ৩২
সুদীপ্ত চক্রবর্তী ... ৩৫
পলাশ দে ... ৩৮
সবর্ণা চট্টোপাধ্যায় ... ৪১
সোমা চৌধুরী লামা ... ৪৪
অয়ন চৌধুরী ... ৪৭
রত্না মুখোপাধ্যায় ... ৫১
গোবিন্দ ধর ... ৫৩
পার্থ আচার্য ... ৫৬
অভিজিৎ মণ্ডল ... ৫৮

Khosiat Rustam ... 113
Sherzod Artikov ... 116
Alina Velazco-Ramos ... 119
Tania Martinez Suarez ... 126
Corina Oproae ... 130
Melita Mely Ratkovic ... 134
Julia Piera ... 135
Zapatillas Rojas Sin Tiempo ... 138
Alberto Prado Morales ... 142
Luis Pabón ... 144
Gustavo Hermógenes Arrieta López ... 148
Elena Ershova ... 151
Miriam Mancini ... 157
Marcela Romn ... 162
Polidora Gomez ... 165
Ebelis Corzo Oñate ... 169
Lucía Pérez ... 172
Chen Hsiu-chen ... 175
Gerardo Ciancio ... 177
Teresa Korondi & Gili Haimovich ... 181

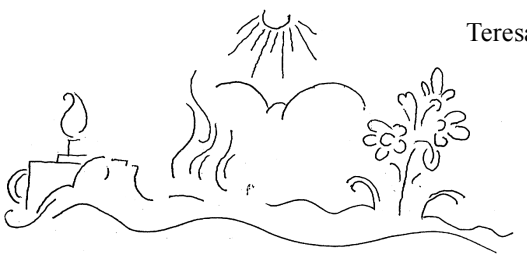

সূচিপত্র

ছোটগল্প

কমরেট চুনুলাল

৬১

সৈকত রক্ষিত

‘হামাকে মাইরো না। মাইরো না! আমার সংসারটাই শেষ...’ নামসংকীর্তন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হরিমন্দিরে একটিও লোক নেই।

❖

অঙ্কের দিদিমণি

ভিক্টর ভৌমিক ৭৩

বাবার দিকের আত্মীয়রা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে যায়, “এবার বাবার দায়িত্ব তোর।”

❖

দলিতা ও পবিত্র নদী

১০৭

ঊর্মি

পড়ন্ত সূর্যের অস্তরাগ দেখতে দেখতে কখন যেন আনমনা হয়ে আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু নুড়ি পাথর দিয়ে একটা একটা করে ঢিল ছুড়ছিল জলে...

Article

Six months with him… 185

Debasish Dutta

“what are you trying to do?” I was a little shocked to hear his question. He himself had given me the responsibility of this work.

❖

Novella

Rasgulla Vanished, Sanyal Sahab

(Translated from : ‘Rasgulla Gayab, Sanyal Sahab’)

191

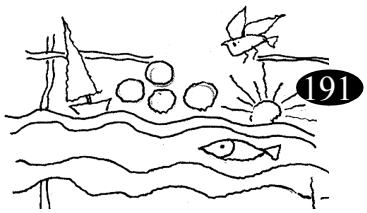

Anindya Sanyal

...there was a rumour spreading throughout the town at that time of some inmates escaping some Mental Hospital. Sanyal Sahab ignoring the rumour said, Let him enjoy his freedom....

❖

Article

225

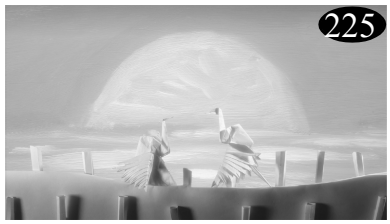

Artículo sobre mi arte

Chantal Rosengurt

কা লী কৃ ষ্ণ গু হ

১৯৪৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাজবাড়ি (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার ছাইবাড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা- কিরণচন্দ্র গুহ এবং মাতা- আশালতা দেবী। ষাটের দশক থেকে তিনি নিজের মতো করেই কবিতা চর্চায় নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর কবিতায় যেমন চমক নেই, নেই কোনও নাগরিক স্মার্টনেস। অথচ আছে সুগভীর এক দার্শনিকতা বোধ যা আমাদের ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও একাকীত্বের মর্মস্থলে অনায়াসে বিচরণ করে। তাঁর চোখ দিয়ে আমরাও দেখতে শুরু করি নিজেকে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে', 'নির্বাসন নাম ডাকনাম', 'হে নিদ্রাহীন', 'অন্ধত্বের প্রশ্নে জড়িত', 'খণ্ডিত সেই সূর্যোদয়', 'অক্ষয়বটের দেশ পার হই', 'শূন্যতা শাসিত ঘরবাড়ি' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এবং 'নির্বাচিত গদ্য' প্রকাশিত হয়েছে।

বসন্তের দিন

বসন্তের দিন শেষ হয়ে গেল।
জীবনের বসন্তও বহুদিন আগে
শেষ হয়ে গেছে।

তবু বসন্তের গানগুলি শোনা
এখনও বাকি আছে।

বাকি আছে শেষ কয়েকজন বন্ধুর
নাম ধরে ডাকা—
আর রাত্রির কিছু নির্জন উৎসবে যোগ দেয়া।

আর কী কী বাকি আছে?

বসন্ত তার গান লিখে যায়...

দেবদাস আচার্য

১৯৪১-এর অগাস্ট বাংলাদেশের বন্ডবিল গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন। পিতা- দয়াময় আচার্য, মা- আশালতা আচার্য। তাঁর কবিতায় কোনও নাটকীয় উচ্চারণ নেই, নেই কোনও ঘটনার ঘনঘটা।

তাঁর কবিতায় আছে মাটির গন্ধ। প্রান্তিক মানুষের অসহায়তার পাশাপাশি জীবনের প্রতি সুনিবিড় একাত্মতা, মূল্যবোধ। সর্ব অর্থেই তিনি বাংলা কবিতার একজন নিবিড় সাধক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি', 'মৃৎশকট', 'মানুষের মূর্তি', 'ঠুঁটো জগন্নাথ', 'আচার্যর ভদ্রাসন', 'সুভাষিতম', 'নাস্তিকের জপতপ' ইত্যাদি। 'আদম' থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থ। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'আলপনা আচার্য স্মৃতি পুরস্কার', ২০১৭-তে 'আদম সম্মাননা' এবং ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমি প্রদত্ত 'জীবনানন্দ দাশ স্মারক সম্মান'-এ ভূষিত হন তিনি।

আউই

উদগ্রীব মুখ
স্বপ্নময়
পুড়তে পুড়তে উঠে যায়
নীল আকাশে
পরম উৎসাহে

আলোর উচ্ছ্বাস
রঙের ফোয়ারা
কিছুক্ষণ
মনোমুগ্ধকর
তারপর
ভস্মাবশেষ

আহা রে জীবন

নন্দদুলাল আচার্য

জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ পুরুলিয়ার মধুতটি (বিলতোড়া) গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস পশ্চিম বর্ধমান জেলার শাঁকতোড়িয়া। গান প্রিয়, যাত্রা প্রিয় পিতা দ্বিজপদ আচার্য-র কাছেই কবিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন শৈশব কৈশোরে। মাতা নারায়ণী মাত্র সাড়ে ছয় বছর বয়সে প্রয়াত হন। শৈশব-কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছেন সীমান্ত বাংলার কয়লা খনি অঞ্চলে। রাঢ় বাংলার বিস্তৃত লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। আনন্দবাজার, দেশ, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন, যুগান্তর, পরিচয়, প্রতিক্ষণ সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রচুর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস। এ পর্যন্ত ১৫টির বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে', 'শেষ তীর্থঙ্কর', 'কালচক্র' প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি গ্রন্থ। বেশ কিছু সাঁওতালি কবিতা ও গীতির অনুবাদ করেছেন তিনি। সম্পাদনা করেছেন পশ্চিম বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সহ বেশ কিছু মূল্যবান বই। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদেমি থেকে 'বিভা চট্টোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার' পেয়েছেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ডাকে সাহিত্য সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান। বই পড়া, গান শোনা ও লোক সংস্কৃতি চর্চাই তাঁর একমাত্র নেশা।।

অন্ত্যজদের কথক

আদাড়া ঠাকুর

অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার চৌদল সাজিয়েছ।
ঘোড়াটি বিপুল আর নীলকান্ত ধ্বজা ওড়ে
স্তম্ভের উপরে।
ই দিকে তাকাও কত্তা, গাঁ-কে গাঁ উজাড়।
ডাইনির নজরে শ্যেষ,
মড়াকান্না শোনে জানগুরু।
আমরা মুদুন কাঁধে গিধরা-পিধরা নিয়ে
কোথায় বসত গড়ব আদাড়া ঠাকুর?

জাহের হাড়াম

ক্যেঁদ ঝোড়, বেগুন্যালাটা, আঁশ শেওড়া ঝোপের ভিতর
কাড়ি কাড়ি চাঁদির পাহাড়।
জাহের হাড়াম বলছে, নাই থাকব বাহা হাতু গাঁয়ে।
দণ্ডবৎ করে বলি, কেনে কত্তা, কি করেছি বল?
জিহড় লতায় নামছে ঘুটঘুট্যা আঁধার,
গ্রাম দেবতার চোখে জল।

কাণ্ডেশ্বর

ডিঙি দুলছে কালো ঢেউয়ে,
কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধুলো;
ঊর্ধ্বমুখ শ্রীকালি গর্জায়, মড়া গড়াচ্ছে শ্মশানে।
পিঙ্গল বিড়ুলে ধায় পতন-সংকেত।
চতুষ্পথে আর্তধ্বনি : বাঁচাও... বাঁচাও...

কাণ্ডেশ্বর মুখ তোলো, যদি শেষ রক্ষা হয়...

লখন মাঝি

তড়াং-দাড়াং ডিঙে ধুল ধুল পায়ে,
আসছে লখন মাঝি দূরদেশ থেকে।
কাঁধে মড়া সঙ্গিনীটি, মুখ খোলে সারেঙ্গায়,
এই ঠেনে পুঁতে দে আমাকে।
মড়া পুঁতে ওখানেই গড়ে উঠল হাসাহাতু গ্রাম।
পাশে জোড়, লিগিড়ধা... লিগিড়ধা জল বয়
গাঁও বুড়া হাঁক পাড়ে, হুঁ হুঁ বাপ
লখন মাঝির আমরা লতা বেড়া,
কিরা খাঁইয়ে বলছি, ইনি যে সে বঙা লয়।

বাগরাই সিং

মট-বিড়া লিয়ে ভাগছি ইঁদাড়া-পিঁদাড়ে,
মাগ-ছ্যেলা লিয়ে ভাগছি সেনেড়ার জোড়ে;
রণ-বন ভাইঙ্গে ভাগছি হুড়ালের ডরে।
কুথায় হে গোষ্ট কাকা,
কেঁদ ঝোড়ে লুকালে কোথায়?
হামদেরকে হিম্মৎ দাও, বাগরাই সিং

আং সিং বাং সিং

আং সিং বাং সিং ডাঙাল্যা পাড়ার,
বাগাইলার ঘর কুনঠা বল
যদি লিখি গীত, বলছে হাত কাটে লিব,
তবে কেনে বাজিছে মাদল?
কেনে ছোটে গোয়ালিনী রণ-বন ভেঙে,
ছিন্ন ভিন্ন কত্তার পাহারা।
বতরে পিরিতের ফুল ফুটে আধা রাইতে,
হড়পার বান রোখে কারা?

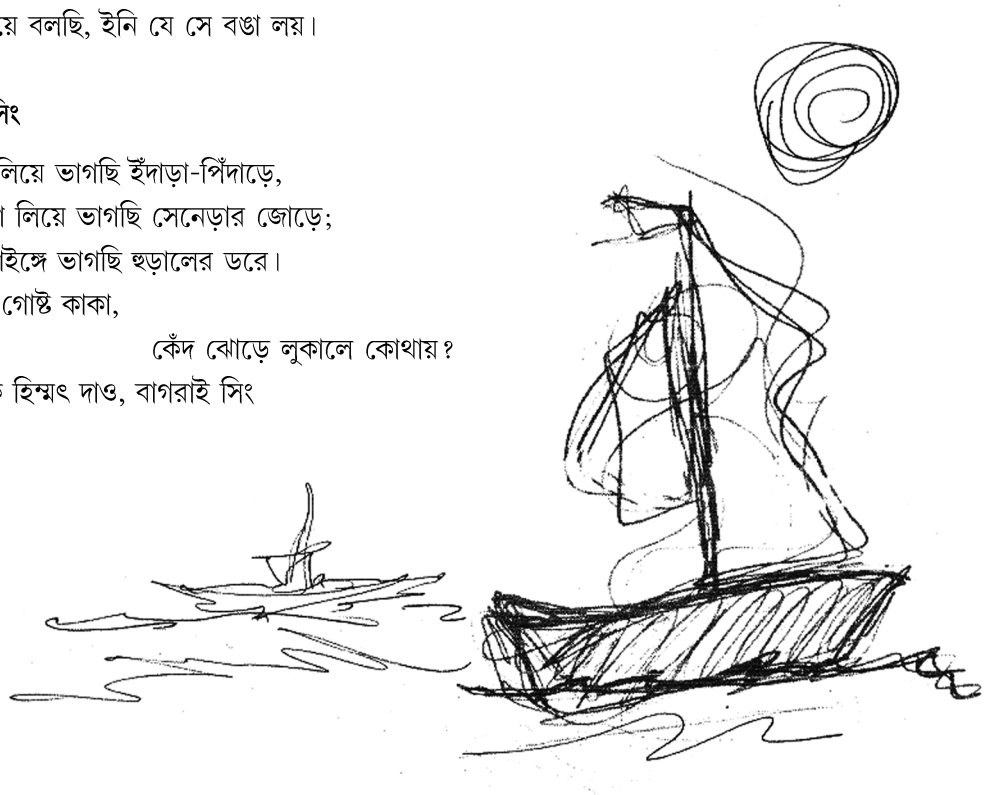

বি শ্ব দে ব মু খো পা ধ্যা য়

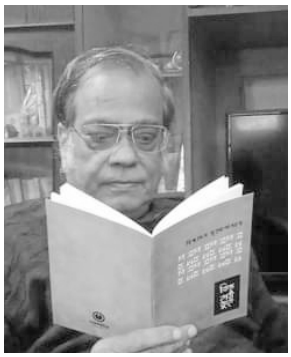

১৯৪৫-এ জন্ম, কলকাতায়, কিন্তু মনে মনে আজীবন বসবাস বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। তাঁর মাতৃপিতৃভূমি কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের গ্রাম। বিশ্বদেব তাঁর দৌহিত্র। তিনি একইসাথে একজন কবি, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, নাট্যকার, পদার্থ বিজ্ঞানী—এমনকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সর্বজনবিধিত। এ পর্যন্ত তাঁর দু-খণ্ডে প্রকাশিত ‘কবিতা সমগ্র’ পাঠক সমাজে সমাদৃত। হাইকু ধর্মী কবিতা নিয়ে তাঁর রচিত ‘কিছু হায় কুহু’ কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার সম্পদ। কবিতা ছাড়াও তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘সানন্দনের পথ’, উপন্যাস ‘আইল্যান্ডের বামন মোয়াই’, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ‘বিজ্ঞান ও বিশ্বচৈতন্য’; ‘নাস্তির অস্তিত্ব’ এবং সঙ্গীতের সাথে পদার্থবিদ্যার যোগসূত্র নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘সঙ্গীতের ভাষা’ পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয়। ২০১৯-এ আজীবন কবিতা যাপনের জন্য ‘আদম সম্মাননা’ এবং সম্প্রতি ‘ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার’ লাভ করেন।

বেহাগ

ভাণ্ডের ভিতর শূন্য। রাত নাই। ঈশ্বর আছেন।
উপরে নীলাণ্ড গোল। ছাত নাই। ঈশ্বর আছেন।
বাহিরে ন্যুব্জ ও নুলো মহাকাল।
হাত নাই। ঈশ্বর আছেন।
মহাকাশে মীনলগ্ন—ফাৎনায় নিঃসর আছেন।

নীচু লঘু-সপ্তর্ষি বঁড়শিবৎ—মাঝে সূত্রহীন
অযুত-আলোকবর্ষী শূন্য—তার শেষে অবলীন
নিরালম্ব তৎপুরুষ—জ্যোৎস্নায় নিহিত আছেন।
তিনি তথা তিনকাল সারারাত বেঁধেছেন বীণ
খরজ নিখাদ গান্ধার—বিশ্বময় ত্রিস্বরে বাজেন
কখনও অনন্ত সুরে, কখনও বা দূরে মগ্ন মীন।

নান্দনিক

বীরভূম প্রত্যন্তে কিছু ছোট ছোট তালবৃত্ত ঘেরা
সান্ধ্য গণ্ডগ্রাম—

বিশ্ব মানে তো এই?—

ট্রেনের বাইরে একা সাঁওতাল মেয়েটি তার চোখে
এই প্রশ্ন এঁকে

যখন উধাও—আমি জানলা দিয়ে পরের স্টেশনেই
বিশ্ব নয়
নন্দলাল বসুকে দেখলাম।

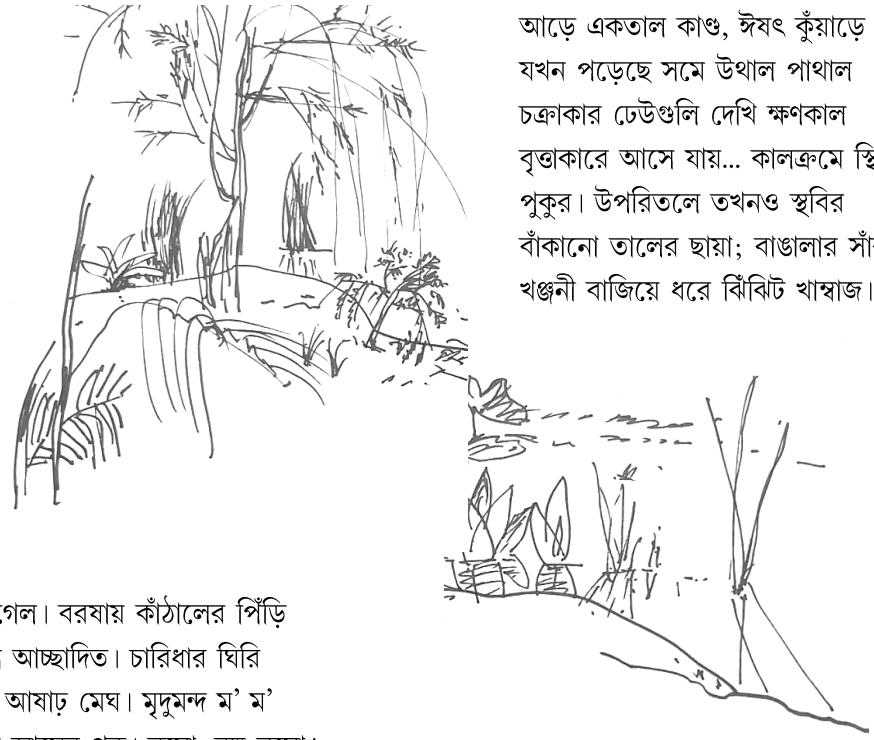

রস

জ্যৈষ্ঠ গেল। বরষায় কাঁঠালের পিঁড়ি
আম্ররস আচ্ছাদিত। চারিধার ঘিরি
আসিল আষাঢ় মেঘ। মৃদুমন্দ ম' ম'
বাতাসে আমের গন্ধ। নমো, বঙ্গ নমো!

কত বর্ষ ভজি নাই আহা বঙ্গ নাম
মজিনি কীর্তন ঢপে!... শোভাবিষ্ট গ্রাম
উঠোনে রসালো আমসত্ত্ব, রজো, তমো—
ত্রৈগুণ্যবিষয়া অঙ্গ... নমো, বঙ্গ নমো।

আষাঢ়, শ্রাবণ... ক্রমে ভাদ্র মাস গতে
লেপন করিয়া নিত্য পরতে পরতে
পুতের বাৎসল্য আর পতির শৃঙ্গার
সর্ব রসে রসনার স্বর্ণবর্ণ সার:

অন্ততত্ত্ব, বিশ্ব কয়, নাহি যায় সম
বধূর মধুর রস, বঙ্গ নারী নমো।

সান্ধ্যগীতি

রাধিকাপ্রসাদ গীত বিস্মৃত সে সুর
ঝিঁঝিট-খাম্বাজ নাম, গ্রাম বিষ্ণুপুর।
আষাঢ়ে বরষা শুরু গুরু গুরু ধ্বনি
শ্রাবণে মৃদঙ্গ মেঘে মধুর শাওনি—
কল্যাণে মুখর শুনি মনে বনে কোণে
কে বাজায় মণ্ডবাঈ সান্ধ্য গ্রামোফোনে!
ভাদর তালের মাস পুষ্করিণী পাড়ে
আড়ে একতাল কাণ্ড, ঈষৎ কুঁয়াড়ে
যখন পড়েছে সমে উথাল পাথাল
চক্রাকার ঢেউগুলি দেখি ক্ষণকাল
বৃত্তাকারে আসে যায়... কালক্রমে স্থির
পুকুর। উপরিতলে তখনও স্থবির
বাঁকানো তালের ছায়া; বাঙালার সাঁঝ
খঞ্জনী বাজিয়ে ধরে ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

দুটি হাইকু

গণনা

নদীটি তার
নিরক্ষর তীর
ঢেউ গুনছে।

আবিষ্কার

গোরস্থান কি
সাক্ষর? এপিটাফ
পড়তে পারে?

মি হি র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

জন্ম ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৬, বরানগর, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক। পেট চালানোর তাগিদে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেও মূলত কবিতাই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী।
তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্যের বই 'জাতকের জন্য অনুবাদ' (১৯৯৫), 'রেশমশিল্প' (২০০২), 'কেবিনম্যানের চিঠি' (২০০৫), 'উৎসবে বাংলা কবিতা' (২০০৮), 'গরিবের আয়ু কম' (২০২৩)।

সহস্র এক আরব্য রজনী

যখন সমুদ্র ঢুকে পড়ছে খাঁড়িতে আর নোনা হাওয়ায় ফুলে উঠছে পাল
যেন শঙ্খচিল ডানা মেলছে আর স্রোতে ধুয়ে গেছে নোঙরের সমূহ ওজন
আবার দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ আশার ডিঙায় তোলা হয়েছে আহার্য পূর্বরাগ ও ভাটিয়ালি

এবার আমার যাত্রা পূবে অথবা পশ্চিমে উর্ধ্বে অথবা অধোঃতে
শুধু কোনো পথ নয় পিপাসায় কয়েকটি জাদুদ্বীপ
ঘাসের স্বদেশ নয়
ধান সেদ্ধর ঘ্রাণে সোনালি কুসুমের শুধু ফুটে ওঠা নয়
ক্ষুধার্ত ওই দানবের হাঁ-করা গহ্বরে অপলক ঢুকে যাওয়া আর লাল
ঝোল মেখে জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না কী ভাল
সেই ঘ্রাণ সেই তিক্ততা, ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ

২
প্রথম সমুদ্র পথের যে গপ্পে মাস্তুল ভাঙা সে সব বলেছি তোমাকে, আজ তাই বলা নয়
আজ কোনো অতিকায় লেজের দাপটে অ্যাকোরিয়ামের মাছ তুমিও

উত্তাল, তোমার নাসিকা ফোলা সমুদ্রের ঘ্রাণে আর নাবিকের হুল্লোড়
বন্দরে বন্দরে। তাদের শিরায় জড়ানো আদর ও তোমার বারে বারে ধর্মান্তর
সামুদ্রিক জল হাওয়ায় তোমার স্বাদু জিভ মরুভূমি থেকে এসেছে বলেই না শুষে নিচ্ছে
তোমার পর্বত তোমার ঘাসজমি নতুন ভঙ্গিমায় ওই নাভিপদ্ম, কাঁপতে থাকা পাতায় পাতায়...
ফুঁসে ওঠা অন্ধকারে ঘা মারতেই প্রলাপের পর প্রলাপ
যেন প্রবল জ্বর থেকে সেরে উঠছে চৈতন্য অথবা মরণ মরে যাই! মরে যাই!
ওহোঃ তীব্র জলধারা, পৃথিবীর গর্ভ থেকে উঠে আসা
বন্যাধারা অথবা বন্যা নয় সম্মোহন আগ্রাসন সোঁদাভাব যেন কোনো হুড্ররাস ডুডুমার জলপ্রপাত

৩

এতদিনে তোমাকে ভাবছি বলি গল্প নয় তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব
দামাস্কাস-বাগদাদ-মিশর বা ভারত বন্দরে
স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার হাজার দিনার ফেলে ছুটে আসছো তুমি, আমি ঘুরলে
তুমি ঘুরছ আমার পেছনে অথবা ঠিক পেছনে নও, আমার অন্নভাগে
আমার কুয়োমুখ আধো অন্ধকারে
ভেসেছ সেখানে তুমি কালিবর্ণ জলে। তুমি আর স্থির ভাঙা চাঁদ
আমার তো জন্মদোষ চাঁদ দেখলে হাত বাড়াই আয় টিপ আয় টিপ বলে

৪

কতটা ঝুঁকতে থাকি কতটুকু রোদে পিঠ কতটুকু কমলার রস
সে সব মাত্রা বোধ—রাখাল বাঁশির টান টৈ টৈ মাঠ
ঝুপ শব্দে খসে পড়া আর কুয়ো মধ্যে অন্বেষণ শেখা
যে ডুবছে সিন্ধুজলে লোকে জানে উঠবেই হিসেবের ঝিনুক কুড়িয়ে;
যে ডুবেছে কুয়োমধ্যে বচসা হোক তার জন্য ডুবুরি বা কাঁটা ফেলা নিয়ে
জগৎ বিভক্ত হোক—
কে উঠবে কাঁটা গেঁথে আর কে শোয়া জলের অন্তরে

নি বে দি তা আ চা র্য

জন্ম পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিসেরগড়ে। পিতা নন্দদুলাল আচার্য বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি, অতএব শৈশব থেকেই কবিতার আবহাওয়ায় মানুষ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। এম ফিল। বি এড। বার্ণপুরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। নিবেদিতা মেধাবি আবেগের কবি। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এছাড়া টাইমস অব ইন্ডিয়া, দেশ, যুগান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, পরম্পরা, সমান্তরাল ও কবিকণ্ঠ সহ একাধিক মূল ধারার পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। 'জল ডাঙানি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'সমুদ্র গর্জন' এবং 'অজানা আছে গো' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত সিগনেট প্রেস থেকে। 'দুটো তারার তিমির' তাঁর ব্যতিক্রমী কাব্যপুস্তিকা। 'চর্যাপদ সম্মাননা' ও 'তারক সেন স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিতা। নিভৃতচারী এই কবির ব্রত বাচ্চাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা।

তোমার প্রেমিক তিলেক দাঁড়াক জানলায়

প্রিয় বন্ধু, প্রিয় আনন্দ কয়েকটি তাজা শ্বাস নেওয়ার জন্য
তোমার কাছে এসেছি,
দেয়ালে টাঙানো হিরণ মিত্র, তলায় ছাব্বিশ দিন টানা আড্ডা।
ঘরের ভেতর সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ত,
ঢুকে পড়ত বাদল পোকার দল।
আমরা বুঝেছিলাম এই নোনা জলের মাঝে
শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় থাকাই যথেষ্ট নয়,
সেই প্রাচীন গমগমে আওয়াজ বুঝতে গেলে বসুন্ধরার
দশম দিক খুলে নিয়ে আসতে হবে
কঠিন শিক্ষাপর্ব, শাল্মলী বৃক্ষছায়া।
ভেসে যেতে যেতে পৃথিবীকে ধরতে হবে বিদ্যুৎবর্ণ খড়কুটো।

প্রিয় বন্ধু প্রিয় আনন্দ সাদা ফুল লাল ফুলের পাশে তুমি বলতে
দিদার গল্প,
কু-বাতাস তাড়ানোর মন্ত্র, গম ঝাড়ার আওয়াজ।
আমরা ছুঁয়ে ফেলতাম তোমার সীমানা ছাড়ানো গানের কিনার,
ব্রজমানিক গাঁথা সেসব গীত গাওয়ার জন্য
তুমি আড়াল নিতে অর্জুন গাছের ডাল।
আমাদের জানলারা একদিন দূরে সরে গেল,
হাতগুলো খসে পড়ল পরস্পরের হাত থেকে,
কটু গন্ধ ঘিরে ধরল আমাদের লিভিংরুম,
দুটি ফ্ল্যাটের মধ্যে গভীর খাদ।
খাদের ভেতর শ্বাপদের দল ঢুকে পড়ল।

ঢুকে পড়ল রাগী রোদ, শাস্তির চিহ্নরা।
আমাদের দুটি বাংলোর মধ্যে গজিয়ে উঠল পাহাড়।
বুড়ো প্রজাপতি যথা নিঃশব্দে সরে গেল কাঁকর বিছানো রাস্তারা,
মাথার ওপর পেঁচাদের নিভৃত ডাক।

প্রিয় বন্ধু প্রিয় আনন্দ কয়েকটি তাজা শ্বাস নেওয়ার জন্য
তোমার কাছে এসেছি, দেয়ালে হিরণ মিত্র।
তোমার পিঠ বেঁকে গেছে, ঘাড়ের হাড়ে চিড়।
তবু তুমি ধরে রেখেছ নোনা জলের স্মৃতি, তরঙ্গ
সুগন্ধিত সেইসব ভোজসভা।
বন্ধু প্রতিটি ভোজ সভায় থাকত তোমার দাদার স্মৃতিলেখ,
শাল গাছের পাতা বোনা মেয়েরা, পবিত্র কাকুর ডাঙালা ঝুমুর,
প্রিয় বন্ধু প্রিয় আনন্দ আজও তুমি ভাবো
আমাদের হাতগুলি জুড়ে যাবে ফের,
মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভেতর ঠা ঠা প্রান্তর,
কাঁটা ঝোপ, কুমিরের গায়ের চামড়ার মতো
ধু ধু বালি, পার হওয়া সম্ভব।

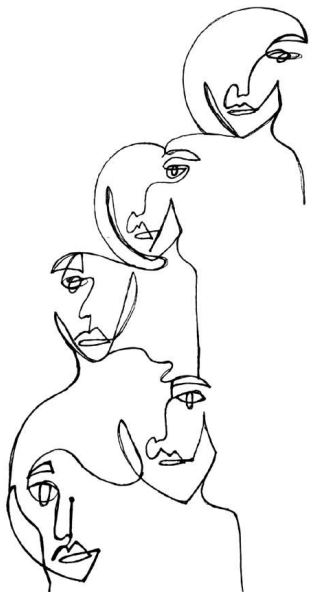

প্রিয় বন্ধু আমি এসেছি দুই বাংলোর মাঝখানের পাহাড় ডিঙিয়ে
পাহাড়ের কাঁধের একপাশে বর্ষা ঋতুর গর্জন
পথ পিচ্ছিল, ঘাতক পাখি ওত পেতে বসে পাথরের খোদলে,
কালো রঙের দৈত্য আমাকে আটকে রেখেছিল লিভিংরুমে একা।

একা দিন এসে দাঁড়াত দরজায়,
বন্ধু চিহ্নহীন, আড্ডা চিহ্নহীন, বুড়ি চাঁদ চিহ্নহীন।
একাকীত্বের বুনো জন্তু ঘুমোয় না, জেগে থাকে সারা রাত।
খবরের কাগজ থেকে খসে পড়ে পোড়া শরীর, কাটা হাত,
লোভী, দুরাচারী রাজমন্ত্রীর হুঙ্কার।

মৃত সৈনিকের কফিন ঘিরে কান্না।
বন্ধু তুমি কোন সাহসে এখনও কিনে ফেল রবীন্দ্র চিত্রের বিপুল সংগ্রহ,
আমার শ্বাস গ্রহণের জন্য মেলে ধরো
সত্তর বছর পার করা কবির দুঃসাহসিক কারুকাজ।

এই মুখাকৃতিতেই কি কবি পুরে দিয়েছেন
পৃথিবীর অসুখ, কৃতি আর অকৃতির
কান ঘেঁষে নেমে যাওয়া গভীর খাদ ?
চুপ মেরে যাওয়া নৌকার মতো দুলতে থাকে আমার লিভিংরুম,
প্রিয় বন্ধু এই মুখাকৃতিতেই কি কবি পুরে দিয়েছেন
কৃষ্ণ বাতাস, মানুষের অন্তহীন চলা, যারা হাসে আর কাঁদে,
যারা মাটি আর নদীর গান গায়।

সেই সব বিহঙ্গ মানুষ, শব্দ আর জল দিয়ে তৈরি মানুষ।
আমার বাংলোর চারিদিকে দুর্ভেদ্য পাহাড়।
একাকীত্বের পশু লালা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় নির্জন ঘরে,
বাইরে ঘাতক পাখি, বাইরে হত্যার চক্রান্ত,
বাইরে ধাতব স্রোত, বাইরে কৃত্রিম উল্লাস,
বাইরে ক্লিপটো কারেন্সির মায়াবী হাত, জটিল ঘূর্ণি,
প্রিয় বন্ধু, প্রিয় আনন্দ তুমি এখনও সাজিয়ে রাখো
গাছ আর কুশন—আমরা বসব তাই।

দেয়ালে হিরণ মিত্র, বেনারসের ঘাট, সিঁড়ি
ওপরে রঙিন ছাতা। স্রোত বয়ে যায়।
বয়ে যাওয়া আঁকা স্রোতের পাশে, তুমি বলছ নতুন প্রেমিকার কথা,
যে তোমার ডানা পুড়িয়ে দেয় মোমের শিখায়,
তোমার অন্য প্রেমিকা, যাকে তুমি নাম দিয়েছিলে আগুন পতঙ্গ,
জাদুবলে তোমাকে নেকড়ে বানায়, আর শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেয়,
বন্ধু কাটা চিবুকের মেয়েটির পাশে
তুমি ছিলে সাদা ঘোড়ার রূপধারী, ছদ্মবেশী রাজপুত্র, নিঃশ্বাসে সুগন্ধ,
মেয়েটি তোমার কেশর কেড়ে নেয়।
তুমি বনে-বাদাড়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ওঠো—
আমার কেশর, আমার কেশর,
তোমাকে দেওয়া হয় চাবুক আর অঙ্কুশের খোঁচা।
তবু তুমি ছিলে তার অনুগামী বাহক।
তার কন্যাকে নিয়ে আসতে সাঁতারের ক্লাস থেকে।
আয়োজন করতে মহাভোজ সভার,
মাসের পর মাস আমি বিশ্বাস করতাম
খোলা জানলাওলা তোমার ফ্ল্যাটটাকে, হিরণ মিত্রের ওই ছবিকে।
প্রিয় বন্ধু তুমি এখনও স্বপ্ন দেখো ?
সাদা ঘোড়ার লাফ, নোনা জলের গর্জন, লাল ফুল, সাদা ফুলের বাগান।
এখনও ভাবো ষোলো সিটের উইংগার বুক করে
আমরা বেরিয়ে পড়ব বুড়ি চাঁদের দিকে,
আসাননগর, চুয়াডাঙা, মানিকেশ্বরের দিকে।
বন্ধু দুনিয়া জুড়ে ক্লিপটো কারেন্সির রণভেরী।
দেবতাহীন শহরেরা দাঁড়িয়ে পর পর,
কয়লা আর চুনাপাথরের খনির ঘস ঘস আওয়াজ,
ত্রস্ত পায়ে হাজির হয় আমার আত্মা।
ঝোড়ো হাওয়া আর রাতের সঙ্গী সে।
কানের কাছে ধাক্কা দেয় স্মৃতিহীন তুলা বীজের মতো হারানো
মানুষের শেষ ডাক।
বন্ধু তুমি এখনও বলে চলেছ, একটা জীবন শিল্পের জন্য দণ্ডিত থাক।

বলছ শ্বাস গ্রহণ করো কবির চিত্রকলায়, শক্তি সঞ্চয় করো।
আমার হাতে তুলে দিয়েছ তেরোটি হাওয়ার সাগর,
তুলে দিয়েছ জাহিরুল হোসেন, পুতুল নাচ, মানিকেশ্বর মন্দিরের সিঁড়ি।
প্রিয় বন্ধু আমাদের জানলারা সেজেছে নতুন পর্দায়।
কথা হোক, জানলাদের কথা হোক।
তোমার অবুঝ প্রেমিকা তিলেক দাঁড়াক জানলায়।
তুমি তাকে প্রতীক্ষা দিও, তাকে দিও সোনার চাকাওলা গাড়ি আর মেঘ।
যার চুলে লেবু পাতার সুবাস, কফি বীজের সুঘ্রাণ।
বৃষ্টি নামুক।
তোমার কুশনে ঠেস দিয়ে আমি দেখতে থাকি কবির চিত্রবই।
মুখাকৃতিতে লুকোনো মানুষের স্রোত। টিকে থাকার অদম্য জেদ।
জানলাদের কথা হোক, লেবু পাতার গন্ধওলা চুলের ওপর বৃষ্টি নামুক।

সার্থক রায় চৌধুরী

জন্ম: ১৯৬৯, ১লা নভেম্বর, কলকাতা। পেশা: অধ্যাপনা। কাব্যগ্রন্থ: 'অন্ধকারের অনুবাদ', প্রকাশিত: ২০০০ সাল, প্রকাশক: কলকাতা প্রকাশনা। 'বিপজ্জনক বাড়ি', প্রকাশিত: ২০১৭, প্রকাশক: দূরত্ব পত্রিকা ও ভাষালিপি। 'আত্মার আশ্চর্য সেল্ফি', প্রকাশিত:২০১৭, প্রকাশক: গুরুচন্ডালি। এছাড়া বহু পত্র-পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক।

দোল পূর্ণিমা

সে মদে চুর, একবার আমাকে
বড়লোক বলে গালাগাল দিচ্ছে
পরমুহূর্তে ছোটলোক বলে শাপ-শাপান্ত
করে পড়ে যাচ্ছে ঘাসে,...
ঘুমিয়ে পড়ছে প্রায়... আর প্রজাপতির
ঝাঁক তাকে ঘিরে ধরলেই চিৎকার করে
সরিয়ে দিচ্ছে তাদের, আমাকে দেখিয়ে বলছে—
'উয়াকে কামড়া, উয়াকে'...

আমি তার মুখের উপর
গাছের ছায়া এনে ঢেলে দিচ্ছি...

আমি তার পা,
নদীর জলে ডুবিয়ে দিচ্ছি বার বার...

বাবা

বয়স হলে কি চোখ বন্ধ করে থাকবে সারাক্ষণ?
ওইদিকে কি রঙের অবিশ্বাস্য ফুল
ফুটেছে দেখবে না!...

যে গান ঘুরে ঘুরে তোমাকে প্রদক্ষিণ করে রোজ, যে
গন্ধ লাজুক তবুও প্রত্যাশী... আমি সবাইকে তোমার

সন্নিকটে আজ বহুবার দেখতে পেয়েছি...

কারা জানলা খুলে রাখে শীতের রাত্রে?
কারা অদ্ভুত টিভির সামনে অপেক্ষা করে অন্ধ
জোনাকির!... কারা এখনো মিলিয়ে নেয়
কে কে বেঁচে আছে... আজ
যে মঞ্জরী ওই গাছে গাছে ফুটেছে
তারা এসব জানে না...

দৃশ্য:

ফুল ওয়ালী বসে আছে,
সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোক।

: কেউ তো কেনে না তেমন তুমি বসে আছো
ক্যানো?

: ওই... একটু বেলার দিকে দু'একটা মানুষ আসে,
ঠাকুমা ঠাকুমা বলে, ফুল কেনে, নিজেরাই মেতে ওঠে
হাসি ঠাট্টায়...

: দু'একটা লোকের জন্য তুমি বসে থাকো?
তোমার তারাই সহায়!

: হ্যাঁ রে বাবা দু'একটা মানুষ পেলে
একটা জীবন চলে যায়..

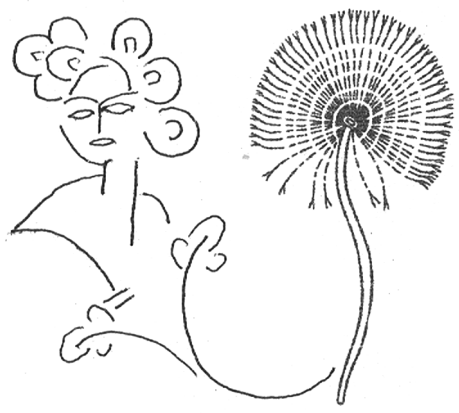

স্বপ্নদোষ

কুয়াশাকীর্ণ এ শরীর তুমি নাও,
মেলে দাও ওই রৌদ্রের অনুরোধে,..
যে গান তোমাকে শোনাতে চেয়েছি কাল
সে আজ ফিরেছে হৃদয়ের অবরোধে...

হৃদয়!.. সে এক পৃথিবী,.. অন্য নাম...
তার প্রণিপাত,.. তার প্রতিঘাত,.. ক্ষয়
ছলকে উঠছে ঘৃণা,.. ভালবাসা,.. বোধ..
এই পৃথিবীর মরে যাওয়া বিস্ময়

আমি আর তুমি সামান্য প্রতিফল,
আশাহত কিছু উন্মুখ উপহার
সাজিয়ে রেখেছি নিজের সামনে... ওই...
স্খলিত হচ্ছে অগণ্য পারাবার...

জল ভাসলে... ভাসো না... হাওয়ায়
বিদীর্ণ হও সুবিপুল প্রতিশোধে,
কে যেন আজকে আবারও সমাদৃত
একটি অলস ওড়বার অনুরোধে!..

যে ভাবে তুমিও... আসলে কাহারো নও...
অথচ সকলই বহুল.., পরিবৃত,..
ফকির ল্যাংটো,.. নিচে পোড়ে প্রতিভার
পোশাক... উড়ছে.. ভাসমান,... ক্রমে স্ফীত...

হতে থাকে আর ধুলোকণা ভেসে ওঠে,..
এত অসংখ্য এত অবশ্য স-ব...
আমি ভাসমান খাটিয়ায় শুয়ে ভাবি,..
মানুষের শালা,.. স্বপ্নেও সম্ভব!.

গৌতম মণ্ডল

জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। কবি ও গদ্যকার। ‘আদম’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এ পর্যন্ত কবির ১০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘উজাগর আঁখি’ (১৯৯৪), ‘কন্দমূলের আকাশ’ (১৯৯৯), ‘ভূপাখি ভস্মপাখি’ (২০০৫), ‘অলসরঙের টিলা’ (২০১১), ‘বিবাহের মন্থর আয়োজন’ (২০১২), ‘অরচিত অন্ধকার’ (২০১৯) এবং ‘কবিতাসংগ্রহ-১’।

তাঁর প্রকাশিত একমাত্র গদ্যগ্রন্থ ‘জলদগ্ধ লিপি : গৌতম বসুর কবিতাবিশ্ব’। এছাড়াও তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘আমার স্বামী কমলকুমার, দয়াময়ী মজুমদার’ (২০১০), কমলকুমার মজুমদারের চিঠি (প্রশান্ত মাজীর সঙ্গে যৌথভাবে), গদ্যসংগ্রহ: গীতা চট্টোপাধ্যায় (২০১৫), কবিতাসংগ্রহ: অরুণ বসু (২০২২), কবিতাসংগ্রহ: সঞ্জীব প্রামাণিক (২০২২), কবিতাসংগ্রহ: বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত (২০২২), সাক্ষাৎকারসংগ্রহ: গৌতম বসু (২০২২), অগ্রন্থিত কবিতা: গৌতম বসু (২০২২)।

ঠিকানা

নীরবতার রং মেখে
আমি এসেছি এখানে
এই দগ্ধ প্রান্তরে
তুমি ডাক দিলে
বুকে ক্ষত নিয়ে
আবার চলে যাব দিগন্তের কাছে
হয়ত তখন মাথার উপর
সূর্য থাকবে না
চাঁদ নিজে এসে
রচনা করে দেবে
আমার যাত্রাপথ
অনিশ্চিত পথের ঠিকানা

স্ফুলিঙ্গ

এই নদী প্রবহমান
এই মোহনা রাত্রির অবসান
আকাশ যার করতল
তার আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে ওঠে তালবন
বনের ধারে কারা পায়চারি করে?

সাইকেল থেকে নেমে
হেঁটে যায় বনের ব্যাস বরাবর?

ছায়া পড়ে;
অবসন্ন রাত্রির ছায়া।
ছায়ার ভিতর নিঃশব্দে ছড়িয়ে যায়
বিলুপ্ত জ্যোৎস্নার জল।

প্রভাতকালের স্ফুলিঙ্গ

গোলাপ

আর কিছু নয়
শুধু একটা গোলাপ ফুটে আছে

আমি দেখছি তার আলো
নশ্বর আঁধার

আলো ও আঁধার পার হয়ে
যিনি আসছেন তিনি ঈশ্বর

তাঁকে দিই
গোলাপের অশ্রু ও ঐশ্বর্য

নির্জন

ডানায় ধরে আছ জল

আর শেকড় ছড়িয়ে দিচ্ছ
মাটির গভীরে, অন্ধকারে

অন্ধকার রাত্রির তারা
যতবার ওই তারার কাছে যাই
ততবার দেখি তোমাকে
দেখি, কাছে ও দূরে
আলোর বেগে চক্র ঘুরছে

পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে নির্জন

সমাধি

সকল নদী মোহনার দিকে যেতে চায়
তাই চিরকাল মোহনায়
গড়ে ওঠে দিগন্তের সমাধি
মানুষ চায় ওই সমাধির রং
যেভাবে গাছ নীরবতা ভেদ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একা
মানুষও তেমনি রং নিয়ে
একা জেগে থাকে সমাধিতে

সমাধির নীচে ঘুমায় মানুষ

রং

ফাল্গুনের নীল ময়ূর, তুমি কোথায়?
কোন বিজনে মেলে রেখেছ
তোমার পেখম? অরচিত অভিসার?

তোমার ছেড়ে যাওয়া পালক ছাড়া
নীল ময়ূর, আমার তো আর কিছুই নেই।
আলো নেই, অন্ধকারও নেই।
আমার সকল গান বেজে ওঠার
আগেই নিভে গেছে।

নির্জন প্রচ্ছদ থেকে
ঝরে গেছে নির্জনতার রং।

বিদিশা সরকার

কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। ২০০৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ১১টি কাব্যগ্রন্থ ও একটি উপন্যাস (তৃতীয় সংস্করণ) সহ একটি ব্যক্তিগত গদ্যের বই প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে ভুবনেশ্বরে। লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় কবিতা ও গল্প সাহিত্যের জগতে একটি পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত সাধনাও জীবনের অনেকখানি জুড়ে। ত্রিপুরার 'স্যন্দন' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এই নিয়ে চারবার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

দায়সারা

যে গাছটার সঙ্গে আমি অবৈধ
তার গুড়ি বেয়ে উঠছে পরজীবীরা
মণি আন্টি
পিউমণি
আরও
আরও সব আমার মত অবৈধরা

এইসব দেখতে দেখতে জমাট হতে হতে পাথর—

আমার অবৈধ বলে,
দোলনা বেঁধে দেব বুনো গন্ধ মাখিয়ে
আমি জানি সব অন্ধকারই দোলনা
রাত আটটার পরে পার্কের গেট বন্ধ হয়ে যায়
শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় দোলনা
অন্ধকারকে পাহারা দেয় একেকটা লাইট পোস্ট...

লাস্ট ট্রেনে করে ঘরে ফেরার নাম দায়সারা

প্রাসঙ্গিক

মাঝে মাঝে দূরত্বগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে
আমি রোদ্দুরকে বলি
এভাবে জ্বলতে জ্বলতে

কেন পুড়িয়ে দাও
কেন অবগুণ্ঠনের অন্তরমহল?...
একান্ত বাথরুমে কত ভ্রূণ গর্ভপাতের কান্নার
সঙ্গে মিশে গেছে
নর্দমার পাকজন্মে!
চৌর্যের অপরাধে অভিযুক্ত মুখগুলো
আজ নির্জন সৈকতে নুলিয়াকে উপচে দিয়েছে
সাংসারিক স্বচ্ছলতা।
একটা ব্ল্যাক-পার্লের মালা মাড়িয়ে দিয়ে গেল
জরুরি ছিল কি

কয়েকটা বেডকভার দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি সমস্ত জানলা
কারণ এক্ষেত্রে পর্দা যথেষ্ট না
অথবা পর্যাপ্ত অন্ধকারও
চোখ বুঁজে অনুমান করছি
একজন দমন করছে তার প্লাবন
রোদ্দুরে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে আরেক শূন্যতায়
যার বিষয়ে আমরা প্রায়শঃই আলোচনা করি।

শঙ্কর দয়াল সিরিজ : পঞ্চম পর্ব

রজনীগন্ধা নয় রোজ রাতে একটা করে ফুটে ওঠে জবা।

রোজ রাতে সন্তর্পণে সিঁড়ি ঘেঁষা দেওয়াল ধরে ধরে
ওখানে পৌঁছাতে হয়
এত রক্ত এত সিঁদুরের বাড়াবাড়ি
বেজন্মার জন্ম হয়?
শুনেছ দয়াল?

এ লক্ষণ ভালো নয়
কর্কট রাশির জন্মক্ষণে
এ অধম ধরিত্রীকন্যার
যন্ত্রণায় কি যে সুখ
পিতাও জানো না?

বেছে নিয়ে দয়াল জীবন
কেন যে সম্পৃক্ত করো দ্রবণে দ্রবণ

এখানের সমস্ত পাগলিরা মন্দিরে ঘুমায়
শঙ্করের পুজো হয় খুব ভোরে উলু দেয় ওরা
কখন যে ফিরে যায় কথোপকথন
কখন যে খোঁপায় জবাটি গুঁজে মুখাগ্নি সমেত
রাত্রি ধুয়ে মেলে দেয় তারে

নয়নতারাকে যেন ছোট কোরো না

শাপগ্রস্ত পঞ্চমুখী একাই ফুটবে রাতে

বাহার পৃথিবী থেকে দৈববাণী
নগরভ্রমণে যায় রাসে

মলমাস

এক

হারিয়ে যাচ্ছ
বারবার
হারিয়ে যাচ্ছ তুমি

খুঁজে আনছি খুঁজে ফিরছি
আবার
আবার

কত রাত পার হল
কত সন্ধ্যা সাড়ে সাত থেকে মাঝরাত

ছড়ানো নুনের ছিটে
জোঁকের প্রকোপ
রক্তে ভেজা দুই পায়ে
আলতা ভেবে সে পুরুষ
চাটাই বিছিয়ে

আর পারছি না এই মলমাসে
বারবার খুঁজে পাওয়া
এখনও
এখনও...

দুই

বাউলাঙ্গে বোলপুর রসকলি
চর্চিত নাগরালির
অন্যদেশে?

ঘটুক এখানে ঘটে যাক কণ্ঠীবদলের অনুষ্ঠান
ঘটনাবহুল সেই একাদশ অধ্যায়ের শেষে
জামানত বাজেয়াপ্ত

দেবার্ঘ্যের নিমিত্ত মাত্র
মোর গৃহে আভাসটুকুই
চেয়ে দেখো রাধারাণী জ্বলে

কল্পনা দি

যারা খোঁজ নিয়েছিল এই তুমি
সেই তুমি কিনা
স্কিপিং
কবাডি
হার্ডেল রেসে হেরে যাওয়া
গৃহবিজ্ঞানের কল্পনাদির মত
ব্যাগের ভেতর একটা সংসার গুটিয়ে
লাস্ট পিরিয়ডে

তারা কল্পনাদির খোঁজ করেনি কখনও
মৃত্যুর পরেও নয়

সুপ্রভাত

বড্ড ছড়িয়ে থাকে সকালবেলা
স্পষ্ট অবিন্যস্ত
কেউ যেন একটা ওলোট পালোট করে দেওয়া
ঘরটাকে নিয়ে
নাক সিটকে...

ঠিক সেই সময়ে পাশের বাড়িতে শুটকি মাছ
রান্না করছে কেউ
অনেক পাশের বাড়ির একটাতে

চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি একটা উচ্ছন্নে যাওয়া ঘরটার আদ্যোপান্ত

তিনটে অন্তর্বাস নিয়ে খেলা করে গেছে বেড়াল ছানা দুটি
প্লাস্টিকের সবুজ ঝাড়ুটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম
এখনও পড়ে আছে
ওরা মজা পায় আমাকে রাগাতে

যে টেডিটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি
এখন বোতামের চোখ নিয়ে আদিখ্যেতা চাইছে

ঘুমের ওষুধের খালি স্ট্রিপগুলো নিয়ে আকচা আকচি
করছে ছানাদুটো
কাল একটা পায়রার ছানাকে মেরে, খেলছিল
কী নিষ্ঠুর খেলা—
শেষে কেড়ে নিয়ে মুখে গঙ্গার জল দিয়ে...

মানুষের অবশ্য মৃত্যুর আগে জল দেওয়া হয়
মৃত্যুর পর তুলসী পাতায় চন্দন লাগিয়ে
মালার পর মালা
এক গোছা রজনীগন্ধা
আশ্চর্য রজনী লিখতেই গন্ধা এসে যুক্ত হল নিজে নিজেই
বহুব্রীহির সমাহার দেখতে দেখতে
পঞ্চুদার হুইসেল

মরা পায়রাটাকে জঞ্জালের ভিতরে চালান করে দেখছি
পায়রার বাবা মা সঙ্গমে লিপ্ত

প্রকাশ্য দিবালোকে এখন প্রাণীদের মত
মানুষও মানুষকে ধর্ষণ করে
সকাল শুরু হল একটা ধমনী কেটে দিয়ে
ঠিক এই সময়ে রক্তপাত জরুরি
কিছুটা ভারসাম্যের প্রয়োজনে
তারপর
হোয়াটসঅ্যাপে দশটা সুপ্রভাত করলাম

টোকেন গেটপাস

এরপর মিটে গেল মিটার বনাম গজের দূরত্ব
নটে গাছটি চাপা দিয়ে রেখেছিল কেউ
ঝুড়ির ভিতরে টোকেন গেটপাস
টাইম বোমারা নিষ্ক্রিয়
পরপর এইসব একটানা চিহ্ন লোপাট

ঘুনসিতে গুঁজে রাখা বশীকরণ
এক ঢিলে "পালাও এবার"
ভুলে যাও থিম সং
নগর জীবন কা খাইবার পাস

একজোড়া প্রজাপতি আপ্যায়ণে
একলা সানাই
শুনছে না কেউ, কেন?
ঘরে বসে আমি তো শুনলাম

বিধান

মাঝে মাঝে বিষ নাও
বিষতুল্য হও
গন্ধ নাও পরপুরুষের
গন্ধ বমি কর
এসব শুক্রের ফের
ফিরিবার পথ নেই জেনো
মুখোমুখি বসিবার মাঠ নেই
তাবিজ মাদুলি ইউনানি
জল ঢালো এসব প্রয়োগে
জপের অধিক কোনও ক্রিয়াকর্ম
এক্ষেত্রে হবে না

ধুনো দাও ঘরে
ধোঁয়ায় হারিয়ে যাবে
যেতে দিতে হয়
যেতে দাও সিরিজের শেষে
আগুন পুড়িয়ে দেবে সমস্ত প্রমাণ

মনে মনে

সহিতে সহিতে শেষে শ্যামনগরে এসে এমন লোকাল!
চায়ের খুরিতে ছেঁকা লিজ্জত পাঁপড়ে মাখা আমের চাটনি,
সবই মনে মনে
মনে মনে দুড়দাড় ওভার ব্রিজের সিঁড়ি ছাপোষা ধোঁয়ায়
কেমন হারিয়ে যায়
ফিরে যাওয়া তোর
এও মনে মনে!

কাল কত বৃষ্টি হল
সভাঘরে ভিজে ভিজে ভেজার কবিতা
ফ্লাইওভারের নীচে একান্ত দাঁড়িয়ে থাকা
স্ট্রবেরি বালিকা
আমার মতই
বিকিনি সন্ধ্যার নীচে শীত শীত
বাড়ি ফেরা
বাড়ি ফিরতে হয়—

তারপর রাত জেগে ফর্দ লেখা
কী কী স্বপ্ন দোষে গুণে
ছিটকিনি খুলে দিয়ে
ঝড়ের রাতের সম্প্রদান—
প্রতিবেশী ঘুমেরা ঘুমাবে
ঘুমের ওষুধে আমি অতল আহ্বানে সাড়া দিতে দিতে
কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম!

কবিতার রাত ১

কণ্ঠস্বর বদলে নিতে হয়
কণ্ঠস্বর প্রয়োজনে বদলে যায়
আত্মস্তুতি যে একটা প্রয়োগ কৌশল
বুঝতে বুঝতে মাঝরাত পর্যন্ত মেট্রো রেল

বিছানায় হিম পড়লে কোলবালিশ ফেটে তুলোর পাহাড়
মুখ গুঁজে পড়ে থাকা রেবেকা পৌঁছতে পারে না
হারমোনিয়াম অব্দি
তার আগেই গরম তরল স্বরবর্ণের পঞ্চম অক্ষরে
উৎকণ্ঠা জুড়িয়ে গেল কণ্ঠস্বর বদলে যায় বৈকি

কবিতার রাত ২

সেরামিক দেওয়ালে এসে থেমে গেল
প্রভুত্ববিলাস
সিঙ্গল বিছানা জুড়ে বিসুভিয়াসের লাভাজ্বর
টিকোজিতে চাপা দেওয়া ফিল্টার কফির ক্রাইম সিরিজ
ওসবেই দেখে নেওয়া কুত্তি বানিয়ে সারা ভাদ্রমাসে
নরম পোশাকে নীল কতখানি লোহিতের
শিবির বানায়—
এরপরও বলেছিলে পরিব্রাজক হয়ে ইতিহাসে যারা
হরপ্পা আদলে ছিল শিল্পকলা
ফসিল উপমা

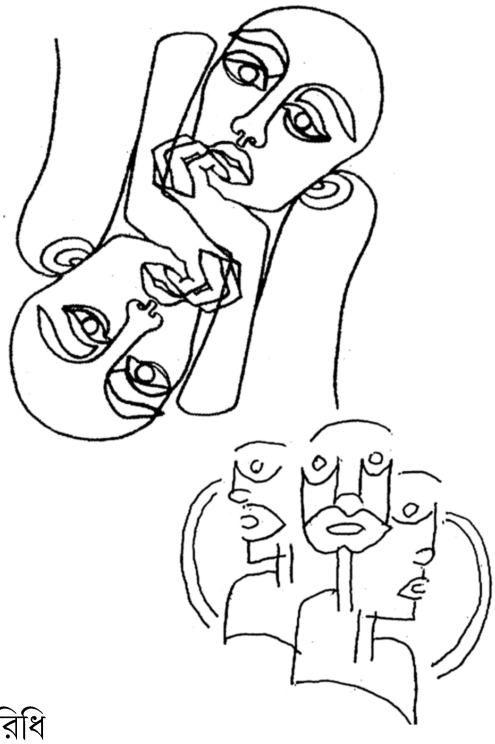

পরিধি

উপহারের ফুলগুলোতে কুণ্ঠা,
আমার বিষয়েও—
এই অন্যমানে যদিও সন্দেহপ্রবণ নয়
তবুও পূর্ণিমা বিষয়ে আর কথা, থাক
আজ থাক বাকস্বাধীনতায় সংযম
যা আমাদের বরাবরই ঠেলে দিয়েছে
এক একটি প্রকোষ্ঠে
আমরা চাষ-আবাদের মধ্যে
জলসেচের প্রয়োজনে নিযুক্ত করেছি শ্রমিক মৌমাছি
মধুঃক্ষরণের অ্যাপিয়ারি থেকে অন্নদাসকে বরখাস্ত করেছি
আচরণের বর্ণবৈষম্যে
অভিবাদনের পালক টুপি
হারিয়ে ফেলেছি
অনুশোচনায়
হয়ত তুমিও জানো বিষাদের কারণে অবগুণ্ঠন
সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর যেখানে সংরক্ষিত থাকে সন
খ্রিস্টাব্দ সহ

দীপঙ্কর বাগচী

“

জন্ম ১৯৬৮, ২৩ অক্টোবর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে এম এ, এম ফিল ও পি এইচ ডি। সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে আরও উচ্চতর গবেষণায় নিযুক্ত। দশটি কাব্যগ্রন্থ ও পাঁচটি গদ্যগ্রন্থ আছে। এছাড়াও নিয়মিত নানা পত্রপত্রিকায় লেখেন।

কুয়াশা

শতক শতক জুড়ে যুদ্ধের দামামা শুধু বাজে
স্কন্দকাটা মূর্তিগুলি গড়ায় শহরে...
উপনিষদের বাণী ছিল
আলোকিত দিব্য বিভা তার...
হংসের ধ্বনির মতো, আবছায়া করেছে বিস্তার
পথে ঘাটে, নিরালোক আলোর সন্তান

ভিতরে তাকাও তুমি; তবে জেনো দেখা
দেবে সেই—
সারাৎসারে অন্ধ বালকেরা
সত্যদ্রষ্টা ঋষি তারা

প্রতিবিম্ব জুড়ে শুধু ছড়ায় কুয়াশা

বাচালতা

থেমে যেতে হয়; বাচালতা বিস্তর হয়েছে
অনর্গল জলের শব্দের মতো
গাড়ি ছুটে যায়—
এ পাহাড়ী রাস্তা জুড়ে, শুধু অন্ধকার
দু-তিনটি কুকুর, কথা বলে; নিজের ভাষায়
আমরা সফলতা ফেলে দিয়ে কোন এক

অচেনা রাস্তায়...
পাক খেতে খেতে, উঠে যাই চড়াই উৎরাই

বাচালতা বড় বেশি হয়ে গেছে বুঝে
বাকহীন নিশুতি ঘনায়।

উত্তর

ঢুকে পড়ো নিজের ভিতরে আরও দূর
ধমনি ও শিরায় শিরায়...
ভোর হতে এখন অনেকটা বাকি
আজকাল জানালা, খুললেই আমি
নিজের মুখের ছবি দেখি
অস্পষ্ট ছায়ায়...

কিন্তু হে ঈশ্বর হে পিতার পিতা
আমি শুধু তোমাকেই দেখতে পাবো
এই ভেবে সারারাত নিজেকে ছেনেছি

আরও দূর যেতে হবে—এ জীবনে
যাওয়া কি সম্ভব!!!
রাত্রিমাতা দিল না উত্তর

রাত্রিমাতা

চিৎকার করে যারা, ভালোবাসি বলে
আমি ততোধিক, চুপচাপ হয়ে যাই
নিঝুম রাত্রিকে মনে হয়
এর কোনও শেষ, শুরু নেই অনন্ত অবধি

অথচ আমি তো, রাত্রিমাতা বলে, আশ্রয় চেয়েছি
কতদিন...
কত বিষণ্ণ দুপুর, শেষ হতে না চাওয়া দুপুর
গোধূলির কারুকার্য শেষে
আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে
তুমি রাত্রিমাতা—

আজ কেন এত ফাঁকা লাগে, মনে হয়
কেউ নেই
অন্ধ শেয়ালেরা তাড়া করে
বেড়ায় আমায়...

ধ্বনি

হরির শ্রীপাট পাশে রেখে যে রাস্তাটা
পাঁচশো বছরের পুরনো গলির দিকে
ঝুঁকে গেছে...
আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম
চিনতে পারো—শ্রীনিবাস

আজ কত সাল কিংবা খ্রিস্টাব্দের
অবিরল ধ্বনি ফুটে উঠল
ওই গাছের ছায়ায়...

এত মানুষের ভিড়ে আমি জানি
তুমি ঠিক অনর্গল,
আমাদের কথা শুনে যাচ্ছ এই
বিকেলের আবছা কুয়াশায়

রাধা

যার প্রেমে রাধা নেই আমি সেই প্রেম
চাই না শ্রীবাস...
রাত্রি কত হল—ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অমৃত উঠল কি আর...?
দূরে দূরে শেয়ালেরা, জঙ্গলের অপর কিনারে

ভাগিরথী দিয়ে, কত জল; এপার ওপার।

শতাব্দীর পর শতাব্দী হারায়
আমাদের বেঁচে থাকা সঙ্গোপন
এই ছেলেখেলা...

লেখা হবে অগণিত তারায় তারায়—

শ ব রী শ র্মা রা য়

থাকা

এত বড় পৃথিবী
অথচ পালানোর জায়গা নেই
থাকারও নেই
তবু পালাই
থাকিও

আমাদের থাকাটাই পালানো

বরফ

শীত আসছে
ভয়ংকর শীতের বাজনা
এখন বরফ শিখব আমরা

বরফ, এক অভ্যাস
নিজের ভেতর নিজেকে জমানোর

ফোস্কা

প্রথম মাছ ভাজার দিন
তেল ছিটে ফোস্কা পড়েছিল
জানা ছিল না
বোয়াল মাছ ঢেকে রাঁধতে হয়

জন্মস্থান - শিলং (১৯৬০ সাল)
বর্তমানে শিলিগুড়ি নিবাসী।
কাব্যগ্রন্থ - 'বুক ভর্তি তোফা',
(সুতরাং প্রকাশনা ২০১৪)
'জলের জানলা খুলছে'
(একশো আশি ডিগ্রী ২০১৮)।

এখন ঢেকে রাঁধি
তেল ছেটে
ফোস্কা হয়
ঢাকনার তলায়

পাত্র

এখানেই যাত্রা শেষ হল
এরপর লেখো ইতি
নাম লেখো

নাম তোমার নয়
নাম তো নামের
সে তোমাকে
একটা রাখার জায়গা দিয়েছে

মৃত্যুও একটা রাখার জায়গা
পাত্রটা মাটির

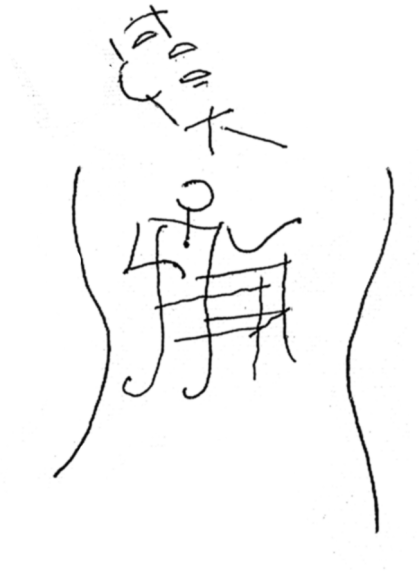

পরশ

বুকের ভেতর একটা চেয়ার আছে
কাঠের

তুমি বসলে
সিংহাসন মনে হয়

পাতাকুড়ুনি

এই দীর্ঘশ্বাস এক খোঁজ
খোঁজ সেই পাতাকুড়ুনির
সেই পাতা
গাছ যাকে ভাসিয়ে দিয়েছে আলতো হাওয়ায়
গাছের ঘরসংসার ছেড়ে
নেই দেশে সে চলেছে
তার চলায় ফকির সুর

তাকে বাঁধবে কে
গাছের মতো গৃহস্থ যাকে বাঁধতে পারেনি

শোভন ভট্টাচার্য

জন্ম ১৮ অগস্ট, ১৯৭৪, কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিভাগে স্নাতক। তবে আইন পড়তে পড়তেই কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া এবং ভবিষ্যতে আইনজীবী হওয়ার পরিবর্তে 'কবিতার দোষে কাপালিক হয়ে যাওয়ার' সংকল্প গ্রহণ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ব্যক্তিগত আলেখ্যের প্রতি' প্রকাশ পায় ২০০০ সালের কলকাতা বইমেলায়। ২০২৩ পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। ২০১৫ সালে ভোপালের 'ভারত ভবন' আয়োজিত 'পশ্চিমবঙ্গ মহোৎসব'-এ পশ্চিমবাংলার পাঁচজন কবির একজন হিসেবে আমন্ত্রিত। লিখেছেন দেশ, নন্দন, অনুষ্টুপ, অনুবর্তন, ভাষাবন্ধন, শতজল ঝর্নার ধ্বনি সহ অসংখ্য ছোট বড় পত্রপত্রিকায়। ২০২০ কলকাতা বইমেলায় 'ভাষালিপি' থেকে প্রকাশ পায় কাব্যসংগ্রহ। পেশাগতভাবে একটি জাতীয় স্তরের বিজ্ঞাপন সংস্থায় সিনিয়র কপিরাইটার পদে নিযুক্ত। শখ ভারতীয় মার্গ সংগীত শ্রবণ। বাংলা ভাষায় প্রিয় কবি মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্মরণিকা—গৌতম বসু

অগ্নিকে ছুঁয়ে-থাকুক প্রকৃত শ্মশানবন্ধু... জল...
একদিন বন্ধুর সাথে গিয়ে 'রাজেশ্বরীদের বাড়ি'
পেয়েছি প্রথম দেখা। সবে লেখা হচ্ছে 'রসাতল'।
'অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে' ছিল কি আভাষ তারই!

দূরভাষে যোগাযোগ মোটেই ছিল না বলা ভালো;
মাঝেমধ্যে দেখা হলে হয়ে যেত, না-হলে হতো না;
কিন্তু দেখা হলে সেই হাসিমুখ-উপচে-ওঠা আলো
মনে পড়ছে খুব। আপনি, বিশ্বাসে-সংশয়ে আনাগোনা

করতে করতে ইদানিং ডুব দিচ্ছিলেন কোন জলে,
শুনতাম খানিক আর খানিক নিঃশব্দে টের পেতাম।
গৌতম দা, এরকমই সবেগে আপনার যাওয়া চলে?
প্রস্তাব করলেন আজ আকস্মিক কে আপনার নাম?

পাতালে নিহিত ছায়া হাত-বাড়িয়ে স্বয়ং ডাকলেন?
নাকি হালিশহরের কালীখেকো রামপ্রসাদ সেন?

'ঈশ্বর নিবাস'

প্রশ্ন ছিল—'স্যার আপনার ঈশ্বরে বিশ্বাস
আছে?' প্রথম প্রতিক্রিয়া—তাঁর ব্যাজারবদন
জানলামুখী হাজার নীরবতা...

তারপরে যা সুচিন্তিত নাটক-নিচু কথা
তার তাজ্জব সারকথনটি এই
'আমাদের এই বাড়িতে কোনো ঠাকুর-আসন নেই'।
কথায় কথায় হলো আরওই আজব সংযোজন
'বাংলাদেশের বন্ধুরা সব আসেন এ বাড়িতে;
যাঁর যেমন ইচ্ছে হয়, থাকেন;
এই বাড়িতে ঠাকুরদেবতা, জাতপাতের বালাই নেই কোনও...'

আমি ভাবছি 'হা ঈশ্বর, কোথায় এসে পড়লাম?'
ঈশ্বরকে 'ঠাকুর' ইনি সজ্ঞানেই কি ডাকেন?
আরও কয়েকটা প্রশ্ন ছিল তারপরেতেও করার
কিন্তু তাঁর কাছে যাবার তাগিদ আর জাগেইনি কখনও।

তথাপি ভাবি—রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কাছে, ঈশ্বর
কখনও প্রভু, কখনও প্রিয়, সখাস্বরূপ ছিল জীবনভর,
তাঁকে এযুগের 'জড়' চিন্তক দেখলেন কী চোখে?
কী মন্ত্রবলে ঢুকলেন গিয়ে তাঁর 'আনন্দলোকে'?
কীভাবে ম্যানেজ করলেন সেই ভক্তকবির বিশেষজ্ঞ পদ?
নিজের কবিতাতেও কেন গড়লেন মেকি রবীন্দ্র-জগৎ?

জানতেন না 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে?'
তা কি হয়?
আমাদের মতো অর্বাচীন, মূঢ় পাঠকের কাছেও
'সহজ কথা ঠিক ততটা'ই লোপ্পা অতিশয়।
ভাবেননি কি কোনও পাঠক এমনি করেও ভাববে?
তাই লিখলেন 'সহজ' প্যারোডি কোষ্ঠকঠিন-কাব্যে?

তারপরেতেও 'আচার্য'কে এইসমস্ত প্রশ্ন ছিল করার...
যিনি একাধারে 'কবি' ও 'ভাবুক'
সমসাময়িক বাংলাভাষার লোকমান্য 'অভিভাবক' যিনি;
কাট-নাস্তিক, স্মার্ট-নাস্তি, তবু কী কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথ
ঘাঁটতে গিয়ে, কাটতে গিয়ে, খুঁড়লেন স্বখাত?
নিঃশব্দের বর্মতলে নীরবতার শরণ
যদিও স্বভাবতই নিয়েছিলেন;
সত্য কি তবু শেষমেশ চাপা থাকে?
আবক্ষ-পাঁকে ডুবিয়েছে তাঁকে আরোপিত 'আবরণ';
ফলস্বরূপ, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির বহু আগেই
নবীন জিজ্ঞাসুর আঘাতে হয়েছে তাঁর ধারাবাহিক মরণ।
'সূর্যাবর্ত' হাসিল করেও সমাজতলীর এঁদোগলির হাটে
যাঁর সমগ্র প্রার্থনাকাল ফেণাচক্রের আবর্তনেই কাটে
কী শেখাবে তাঁর ছলকবিত্ব, ণত্বষত্ব, 'শিষ্ট আচরণ'?

গুহ্য গান

তোমায় গান শোনাই মনে মনে
তোমায় গান শোনাতে ভারী ব্যথা
তোমায় গান-শোনানো কত স্মৃতি
মিড়গমকে পাহাড়তলী ঢেউ...
আমার ব্যথা, তোমার ব্যথা, কেউ
বুঝবে? কোনো মুখর ছায়াবীথি?
যা অশ্রুত, মনে রাখবে কে তা?
নিঝুম সুর কাঁদাবে কোন জনে?

তবুও গান শুনতে কেন চাও
আমার গানে তালিম নেই কোনো
আমার গানে কান্না বাঁধে সুর
দিকবিদিক হারানো সেই কাঁদা...
অপার নদী, অশ্রু দিয়ে সাধা,
তোমার দ্বারে ঘাট দেখেছি দূর,
বোবার স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে প্রাণ,
বোবার গান তুমি শুনতে পাও?

আষাঢ়ের অমিত্রাক্ষর

কামনা, শাঙন ঘন, দেহের দিগন্ত ঘিরে আসে;
মেঘবাষ্পে ধুয়ে দেয় অলকলতার কেশদাম;
ছুঁয়ে দেয় দিকবধূর প্রত্যেকটি গোপন বিভাজিকা,
ছুঁয়ে দেয় নবহর্ষে উদ্ভাসিত যৌন রোমরাজি।
কামনা, শাঙন ঘন, এক দস্যি-দামাল প্রেমিক
আদরের আতিশয্যে ওঠায় প্রিয়ের নাভিশ্বাস;
বাতাসের বাঁশি ধরে শীৎকারের সঘন সংগীত;
দিগন্ত ছাপিয়ে মেঘ মাটিতে উপুড় হয়ে শোয়।
ধারাজল নেমে আসে আকাশের শরীর ঝাঁকিয়ে;
কুড়েঘরবাসী টের পায় প্রকৃতির রাগমোচন;
বিদ্যুতের আস্ফালনে চেনা দেয় সাবেক পৌরুষ;

চরাচর ঝলসে ওঠে গর্ভচেরা সুতীক্ষ্ম আলোয়।
ধরিত্রীর আর্ত হাত দেহ খামচে ধরে আকাশের;
গর্ভবতী স্বপ্ন ছেয়ে যায় দিগন্তের বীজধান...

আমরা চেয়েছি অ্যালবামে, সাদাকালোয়
রঙ-রোশনাই ছোঁয়াতে।
যদিও সে রঙ অতিবেগুনি রশ্মি,
গ্রিনহাউসে আজ জ্বলছে;
নগর মাত্র অপরিণামদর্শী
সে কথাই যেন বলছে।

স্মৃতির মহানগর

নগর, তোমার স্মৃতিভ্রংশ পথঘাট
মনে রাখে না কিচ্ছু;
কয়েক দশক আগেও তোমার ফুটপাথ
ছিল কেমন নিঃঝুম।
কয়েক দশক আগেও ধীরেসুস্থে
মানুষ কাজে আসত;
সাঁঝে আড্ডায় নাগরিক মন বুঝতে
কতই না ভালোবাসত।
কয়েক দশক আগেও গোপন প্রিয়ারা
অন্ধকারের আড়ালে
লুকিয়ে রাখত ধারালো চোখের ইশারা
মাঝ-ময়দান ছাড়ালে।
গালিব স্ট্রিটের আধভাঙা চাঁদ সন্ধ্যায়
কার্নিশে গেঁথে থাকত;
ধর্মতলার মদির রজনীগন্ধায়
নেশা ছিল পর্যাপ্ত।
আরও দুর্গম প্রাচীন গলির বিবরে
শোনা যেত রাগরাগিণী;
বটপাকুড়ের দেয়াল-ফাটানো শিকড়ে
আমরা তো বাঁধা থাকিনি।
আমরা গড়েছি নবদিগন্ত, ভেঙেছি
ঐতিহ্যের সীমানা;
কুলীন ব্রিটিশ কালচারে টেনে এনেছি
ভরপুর আমেরিকানা।
রাত পুড়ে যায় আজ বেলেল্লা আলোয়
দিনগুলো আরও ধোঁয়াটে;

নাগরিক নির্জনে

নির্জন খালপাড় ধরে একাকী একটানা পথ...
সন্ধেবেলা একেকদিন পৌঁছোয় বাইপাসে।
ফুটপাথের ধারে বসে খুরিতে চা খাই।
কোনওদিন হয়তো কিছু ভাবি, কোনওদিন কিছুই ভাবি না।
মোবাইলে মিড়বহুল ইমনের আলাপ চালাই।
সামনে দেখি রাজপথ, তার ব্যস্ত যাতায়াত দ্যাখে না আমাকে।
আমিও নিশ্চিন্ত থাকি ওদের না দেখে।
শহরের ব্যস্ততাই যে আমার সবচাইতে নিশ্চিন্ত আড়াল।

কেন এ-আড়াল খুঁজি আমি?
কেন এই একাকীত্ব বাসনা আমার?
ব্যর্থ বা বাতিল যাকে বলে,
তা তো আমি নই কোনোদিনই।
ভরাট সংসার।
বাবা-মা-স্ত্রী-কন্যা থাকে সর্বদা আমারই মুখ চেয়ে।
কলেজস্ট্রিটে, যাদবপুরে, বাগবাজারে কিংবা নাকতলায়,
প্রাণের বন্ধুরা থাকে দীর্ঘ অপেক্ষায়।
কাউকে তেল না-মেরে যেটুকু কবিযশ,
সে-পাওয়া চাওয়ার চেয়ে বেশি।
তবে কেন একা হতে চাই!
কেন যে একাই হতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে!
শহরের প্রান্তে বসে দেখি নাগরিক সন্ধ্যা, কামিনী-সার্কাস।
ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে ওঠা সাদানীল টুনি-উন্নয়ন।
তার ওপারে মুখ-লুকিয়ে থাকে যত বিন্দুবৎ মহাজাগতিক;
ডাকে শুধুমাত্র তাকে, বহু প্রিয় সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও যে একা।

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

জন্ম-১৯৭৪। প্রকাশিত কবিতার বই—'জলের শহর' (২০০৫), 'স্মৃতি ও পুনর্জন্ম' (২০১০), 'কাঠবেড়ালির সেতু' (২০১৬), 'হরিণবাড়ি' (২০২২)। এছাড়াও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে গল্প ও কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতা অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি, হিন্দি ও উজবেকিস্তান-এর ভাষায়।

পুষ্টি

বহুদিন এভাবে কেউ খায়নি আমায়

ব্যথা যে কীভাবে
প্রেমে ও ক্ষুধায় ওঠে বেজে
তীব্র দংশনের মুহূর্তে
প্রতিটি রোমকূপের সন্ধান সে
পেয়েছে কীভাবে
সেসব অচেনাই থাক

অজানা থাক এইসব খাওয়াদাওয়া
তৃপ্তির ঘন শ্বাস ও প্রশ্বাস সমূহ

আমাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সুস্থ ও
স্বাস্থ্যবান করেছ তুমি

আসলে খাবার বলে কিছু নেই
আছে পুষ্টির আনন্দ

প্রিয়তমা, আজ সন্ধ্যাবেলা
তুমি সে সংবাদ দিলে

বিভাব

মোহনার মাঝে পেয়েছি নিজেকে
মহুয়ার দেশে চলে যাব

মাটিতে লুটায় বাড়তি আঁচল
ল্যাংটার মতো খাবি খাব

সে যদি বেজায় নিমরাজি আজ
বর্ষাকালের কই যেমন

অন্য পুকুর নিভৃত ডোবা
ব্যাঙাচির বাপ ব্যাঙ হব

জলের ধারায় এসেছি এদেশে
বাতাসের সাথে উড়ে যাব।

নোনা হাওয়া

পাশের বাড়ি থেকে ইলিশের গন্ধ ভেসে এলে বুঝি
আমার ভিতরে এক বেড়াল বাস করে
জানালার ফাঁকফোকরগুলি বড় হয়

অতঃপর গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে
প্রিয় মৌরির মতো সুগন্ধী মেনিটির সাথে
প্রবাসে দুপুর কাটাই

আমাদের সিন্ধু দর্শন হয়

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হতে থাকে।

বাহার

জল ঢালি বা ঘি ঢালি ওই
ছাই উড়ে যায় রাত্রিদিন
শ্বাসের বাতাস ছাই হয়েছে
পূজার বেদি অন্তহীন

বাসি ফুল, নষ্ট প্রসাদ
শ্মশান জোড়া পূর্ণিমা
বলির কাঠে নধর পাঁঠা
কাঁসর ঘণ্টা ডোমের ছা

জল ঢালি আর ঘি ঢালি আজ
ছাই উড়ে যায় রাত্রিদিন
কুত্তা চেঁচায় উচ্চ গলায়
চাঁদের প্রতি ওঁদের ঋণ

অন্তরীক্ষ বিরাট বৃক্ষ
শেকড় ছাওয়া অনন্ত
কে জানে কোন কথার ফেরে
থমকে থাকে বসন্ত

কোকিলের বাসা

(উৎসর্গ : উইলিয়াম ব্লেক)

হয়তো দুদিন পর কথা হবে
হয়তো বা হবে না কখনও

হয়তো বা শরীরের বিন্দু যত
এক চমকপ্রদ ও অতিশয় বৃত্ত হয়ে
একসাথে নাগরের দোলায়
দোলাবে সংসার, প্রতিবেশী
অন্ধকূপ ও ট্রাপিজের যুগপৎ
হতভাগ্য বালক বালিকা

হয়তো বা মৃত্যুপূর্ব দেহদানে শুধু
আমাদের আপাত পবিত্র যত সংশয়
সংক্রামিত হবে

হয়তো বা কিছুই হবে না
কথা হবে ব্যথা হবে

একটি গাধা মানুষ না হয়ে
অনায়াসে বাঘ হয়ে যাবে

সম্পর্ক

যেন বা জল
সুদূরপ্রসারী কোনও সম্ভাবনা
আপাত টলমল, আর
অন্তঃস্থলে প্রবল ঘূর্ণিপাক

বাবুদের পোষা পায়রা
এই হাড়হাভাতের ঘর
আফিমের জল, ছোলা
ঘুলঘুলিময় তাঁর বিষ্ঠা ছড়ানো

যেন বা কিছুই নয়
কিছু নয়, পায়রার উড়ে যাওয়া

জল
সবকিছু জলের মতো সোজা

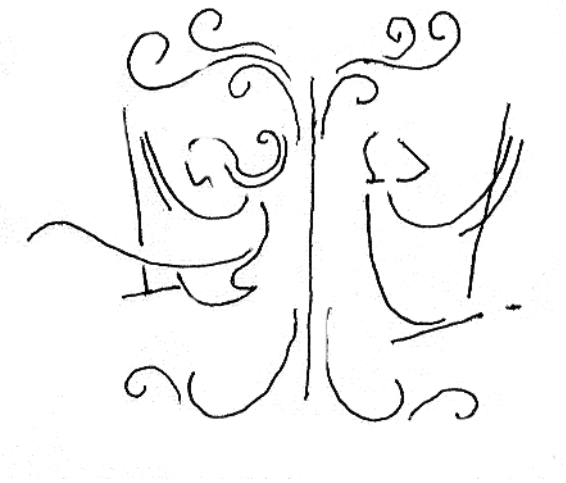

প লা শ দে

সুন্দরবন

এই সুন্দরবনে আমি কি করব

পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে তুমি আসো
মধু সংগ্রহে আসে কতজন
বিরল পাখি আর নির্জন দ্বীপ দ্বীপ শূন্য

এই যে আমার বন সুন্দর অপেক্ষা করছি
কবে এসে তছনছ করবে তুমি!

গরল ধরে আছি যেন স্বাদুজলে দীর্ঘশ্বাস না মেশে
দু-দিন এক রাত্তিরের পর্যটক এসে মদ খায়
জোনাকি দ্যাখে আমার... ফুর্তি করে

জঙ্গল ফাঁকা হতে হতে নার্সিংহোম হয়ে গেছে
এরপর যদি নদী টপকাই? বাঁধ ভাঙি!
ঢুকে পড়ি শহরে তোমার?

বেপরোয়া বেপরোয়া বেপরোয়া বেপরোয়া

জন্ম

বৃক্ষরোপণের মুহূর্তে

সেই গাছের অনুমতি নিচ্ছ কি তুমি

ওর-ও তো পছন্দসই অঞ্চল থাকতে পারে

জন্ম ১৯৭৮। ছিন্নমূল পরিবারের ছোট সন্তান। প্রথম কবিতা বই এবং প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা প্রকাশিত হয় একইসঙ্গে ২০০৬-এ। 'একা' পত্রিকার সম্পাদক। শব্দ-নৈঃশব্দ-দৃশ্য আর ফাঁকায় ম্যাজিকের প্রতীক্ষায় থাকা এক শ্রমিক।

স্বীকার

ইচ্ছে করে না দৃশ্য, আমার অন্তর ইচ্ছে করে না

দেখি, কিচ্ছু নয়, কিছু না-কেই দেখি
তুমি রং মাখিয়ে যাও প্রস্রবণ মিশিয়ে যাও
জল আর পাতা একসঙ্গে নড়তে নড়তে যায় অপমান

ইচ্ছে করে না মিলন, আমার একা ইচ্ছে করে না কিছুতেই
শুনতে পাই, সন্দেহ, দেহ নিঃসরণ

মায়ের পেট ফুলে যাওয়া
শিরা উপচে মুক্তি পেতে চাওয়া বাবুর রক্ত

এইসব মিলেমিশে তুমি হলে কীভাবে
কপাল হয়ে তোমার ঠোঁট শীৎকারে ঢুকে ঢুকে পড়ে

মৃত্তিকার সঙ্গে কীটের সম্পর্ক কী?—উর্বরতা
ফসল আর বাতাসের মধ্যে!—প্রাণ
কষ আর সাঁতারের ভেতর?—উজান
সহ্য এবং মেনে নেওয়ার তফাৎ!

—অস্বীকার অস্বীকার... শিকার

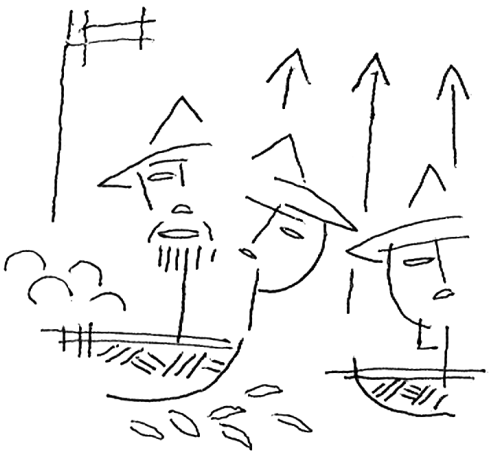

রজঃস্বলা

তোমার জন্য কি বাজার করব বুঝতে পারি না
পোকা ঝুলছে লাউমাচায়
আলু গাজরের পাশে থরে থরে
সাজানো কৃষকের মুণ্ডু...কীটনাশক
ধানিলঙ্কা নিজেই বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে কোল্ডস্টোরে
কেরোসিন আর গ্যাস সিলিন্ডার সমস্ত বুকিং শেষ

দেহপাপড়ি খুলে খুলে প্রস্তুত হচ্ছে

কি অলৌকিক নিয়ে যাব তোমার কাছে
পচনশীল কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না

চিৎকার যে এমন চুপ এবং রিফিউজি হতে পারে
টেরই পাইনি

রজঃস্বলা হই তোমার দিকে তোমার হই রজঃস্বলা

উদ্বাস্তু

আমার মা বাবা বনে জলে থাকতেন
জল, বন থাকেন আমার মা বাবায়

বৃক্ষছাল পশুপাখি আগুন সহায়
মৃত্তিকা সীমানা করা গুহার জানালা
সন্ধে থেকে ভোর হল মা বাবার চোখ আলো কী
নিষিদ্ধ কী সন্দেহ অনুমতি আমি আর আমার মা, তুমি,
আর বাবা খুঁজছ আমাকে বাইসনের বদলে

আপেল কামড়ে দিল যেই মা বাবাকে
পেটে আমি... কামড় পড়ল হা পৃথিবী

তাহলে তোমার নাভি ফাটিয়ে মেটাব
ভুখ? রাঙ্গা হব আমি নিষাদ টাঙিয়ে!

ডিম সরে যাচ্ছে ভাঙে সমস্ত কুসুম
পাহারা দিয়ো গো তুমি বীজের দুনিয়া

সেই গল্প শোনাও না আঁজলা পেতেছি লোকাল বারান্দা
হাজির হয়েছে আর
'কাঁচালঙ্কা দিয়ো কিন্তু হে মুড়ি মাখায়'

ভাঙে ঈশ্বর... মায়ের মত সে নিঃশ্বাস
ছাপ ফেলছে কোথায় দাগ, আমি যাই সেলাই হয়নি
কেন তোমার রাস্তায়?

আঁকার শরীর পাতা, জন্মলগ্নে সেতু
তুমি পেরোও তোমাকে, পেরিয়ে চলেছে উদ্বাস্তু
বাংলার শব্দ, সহ্য ও ফকিরি
আসে দোয়া... হাত ওঠে, 'হেই ভগবান'

ভাগের নিঃশ্বাস রাখা, জল, বনফল
অপেক্ষা... ইচ্ছের তুমি সব, সরকার

খালি হয় পোটলা ও আঁচলের দেশ আমার
বয়স থেকে মিছিল পর্যন্ত
অভাব এই যে রান্নাঘর ভাগাভাগি
দাগ টানা কাঁচামিঠে তোমার নির্জন

অস্ত্র বাছাই হয়েছে এতক্ষণে আজ
স্তন দাও, যোনি আর যত কাঁটাতার
দেশ হারালো কিভাবে তোমাকে ডিঙিয়ে!

ক্যাম্প ফিরে আসে ফিরে ক্যাম্প আসে ফিরে

হাতে ওরা ফড়িং ও কবুতর আর
কখন গেরিলা হল তাকানো তোমার

আমি তো ডরাই আমার নেশায় দেখো, পলক পড়ার
শব্দে জোনাক হাঁপায়

সে মন বাছাই হচ্ছে অন্য গন্ধ, রোদ

আমাকে ফসল ভেবে তুমি কেটে যাও

দোসর

আর কখন থেকে যে তোমার বাহন সেজে উঠছি
কবে থেকে হয়ে উঠছি অংশ

খড় মাটি রং ঘামতেল পেরিয়ে
এখন লাইট পড়ছে আমার দেহে
গুঁড়ো গুঁড়ো দর্শক আসছে

তোমার কাছে বলতে না পারা সমস্ত মানত
সিঁদুর মাখাচ্ছে কপালে আমার

বলো বলো সব ফাঁস করে দেব!

তোমার ওই সব হাহাকার
কিভাবে মাইক বাজিয়ে পাহারা দিচ্ছি আমি

স ব র্ণা চ ট্টো পা ধ্যা য়

শূন্য দশকের কবি। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চন্দননগরে। কেমিস্ট্রি নিয়ে অনার্স করার পর কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতকোত্তর। পরবর্তীকালে হঠাৎই ২০১৮-তে কবিতায় আত্মপ্রকাশ। কবিতার ভাষা সহজ-সরল হলেও নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট। গদ্য কবিতার পাশাপাশি ছন্দে লিখতেও সমান পারদর্শী। ২০১৮-তে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশ পেয়েছে সবর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চারদেওয়ালি চুপকথারা'। ২০১৯-এ পেয়েছেন সোনাঝুরি সাহিত্যসম্মান। ২০২০ সালে করোনা আবহে বইতরণী থেকে প্রকাশ পায় তাঁর 'সাদা হরফের হাঁসগুলি', ডিজিটাল এডিশনে। ২০২১ ও ২০২২ সালে পূর্বা থেকে প্রকাশিত হয় 'রোদসংসার ও তারামন্ডল' এবং 'যেকোনো ব্রেকআপ আমায় স্তব্ধ করে দেয়'। দ্বিতীয় বইটির জন্য পেয়েছেন কৃত্তিবাসের তরফ থেকে তারাপদ রায় সম্মাননা। ২০২৩ সালে সপ্তর্ষি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার সাম্প্রতিক কবিতার বই 'জীবনানন্দ হাসছেন'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, দৈনিক এবং ওয়েব ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর কবিতা। এ ছাড়াও প্রবন্ধ লেখেন বিভিন্ন বিষয়ে। কিশোর সাহিত্যেও তুমুল আগ্রহী অন্তর্মুখী কবি সবর্ণা।

তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?

তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?
আর এই যে গড়িয়ে পড়া জল,
সরু ক্ষীণ, হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো যেন
চড়া এড়িয়ে চলছে তো চলছেই

সেকি মৃত্যুরই সন্ধান?

আমার হাতের শিরা কেঁপে ওঠে,
জল পড়ার ঝমঝম শব্দে চাপা পড়ে যোনির চিৎকার—
কতভাবে আর চলে যাওয়া বোঝাতে নিজেকে
অদৃশ্য করবে শূন্য?
জং ধরা বুড়ো হাড়ে ঝনঝন করে আলো,
তন্ত্রী ছিঁড়ে নাচতে চায় ঝুলন্ত খিদে,
এই যে নিঃশব্দ গার্হস্থ্যে তবু নির্লিপ্ত ঈশ্বর সেজে আছো
এ রঙ মেটাবে কি করে?

রঙের নিচে রঙ, তার নিচে আলকাতরার মতো
চটচট করে কাম,
নিস্তব্ধ নিঝুম নামে বালিচরে—
কেটে যাওয়া পায়ের পাতায় যেটুকু লাল রক্ত,
তাকে স্বপ্ন মনে হয়!

তুমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছো?
অথচ দেখো, আমি এক উন্মাদ বিকৃতের মতো
তোমাকে নিয়ে সমুদ্র সমুদ্র খেলি।
এত ঢেউ, ছড়িয়ে দিই প্রতিটা মারমেডের দিকে,
তারাও তো জলপুষ্ট দেবী, আমারই মতো
অপেক্ষা আঁকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায়,
নিজেকে বৃদ্ধ করে তোলার অসুখ তোমার ঘুমের ভেতর
খসে পড়ে তরল বীর্যের মতো—
আর আমি, বহু বহুদূর কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে
দেখি একের পর এক মৃত্যুকে যারা আমাকেও জড়
এক কবিতার মতো রেখে গেছে পাথরে খোদাই করে!

ঠিক এমনই এক রাত্রিতে

ঠিক এমনই এক রাত্রিতে
পাশাপাশি বসে, তোমার কাঁধ ছুঁয়ে যাবে যেই চাঁদ
এ হাতে ধরবে আমার হাত
ও হাতের মুঠোয় শক্ত করে চুলের মুঠি,
আমি কি পারি না ভেবেছ, কামুক এক রাক্ষসীর
মতো চুষে নিতে সব কলঙ্ক দাগ?

সামনে বয়ে চলে জল, অধীর—শান্তধারা
পায়েতে চুমু দিয়ে বলে, একবার মলটি হারাও—
তারপর দেখো খুঁজে এনে দিতে পারি কিনা?

ভয়ে ভয়ে দেখি। এত কেন প্রলোভন তার?
কেন এত হারানোর সাধ?
আঁচলের নিচে লুকিয়ে রাখি তার মুখ
জিভ ঠেলে নড়ে স্তন,
এতো সেই নদী বহমান, বছর বছর ধরে প্রতিটা
পূর্ণিমা যাকে গর্ভবতী করে!

ঠিক এমনই এক রাত্রিতে
মুখোমুখি দুজন, টেনে নেব ক্লান্তির রস
মহুয়ার মাতনে হুঁশ থাকবে না আর, মিশে যাবে
পতনের ছাপ। আসলে পতন, সে তো ষড়যন্ত্রের খেলা
কে জানে কোথায় কখন অদৃশ্য সে দূত নিয়ে যাবে
হিড়হিড় করে টেনে, দূর থেকে দূরে আরও বহু বহু দূরে
তবু এমনই এক রাত্রিতে
আমি লিখব আবার কিভাবে দিগন্ত বিস্তর ফারাকে
সঙ্গমে উন্মত্ত হয়েছি বারবার
নগ্নতার ওপর বয়ে গেছে আলো মাখা নদী—
যেন তখনই নিস্তেজ হয়েছি দুজনে সবেমাত্র
অলৌকিক বীর্যরস মেখে!

হে কলকাতা

একটা শহর বড়ো ঘরের মেয়ে যেন
রোদ পিঠে মুখ ফিরে শোয়।
আলতো ঠান্ডায় উড়ে যায় শিফনের স্কার্ফ
হে কলকাতা, বিশ্বাস করো না এ শীত
তুমি আজও থার্টি সিক্স, টোয়েন্টি ফোর, থার্টি সিক্স।
আজও বিভঙ্গে অঙ্গে তোমার রাশি রাশি কালো ভ্রমর।
অনায়াসে হেঁটে যায় ময়দানে কালো থার্মাল আর হাফপ্যান্ট,
দুটো সাদা ঘোড়া ভিক্টোরিয়া চত্বর ঘুরে ঘুরে ঘাস খায়,
আর তুমি জোড়া শালিখ দেখে ঠুকে নাও নমস্কার।
তুমি তো গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়ায় রাজনীতির আড্ডা
ঠোঙা ভরা চিনে বাদাম আর লাল চা
পাশ ফিরে থুথু ফেলে অজানা হকার
তুমি ছুটে এসে ডান্ডা ঘোরাও
তুমি তাকে বৃষ্টি দিয়েছ কলকাতার
শীতে তার হনুমানটুপি আর কম্বলের চাদর
কাঁপতে কাঁপতে খালি পায়ে ছোটে কালো দুটো পথশিশু
মা তাদের ফুটিয়ে রেখেছে ডাল ভাত
এ মেয়ে ব্যস্ত, ব্যস্ত বড়ো
রাতের প্রদীপ জ্বলেছে আকাশে বাতাসে
হে কলকাতা, বিশ্বাস করো না এ বসন্ত
তুমি আজও কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ।
গোটা নন্দনের কবিতার গন্ধ
পার্কস্ট্রিট থেকে সারি সারি আলো সাজিয়ে
রেখেছে তোমার দীর্ঘকোমর।
তুমি এক মোহময়ী রহস্য নারী
নাভির গভীরে যার রাখা আছে হীরের নোলক!

আজকাল মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে হাঁটছি

আজকাল মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে হাঁটছি। বয়স বাড়লে এমন হয়। এক এক সময় উদাসীন হতে ভালো লাগে।

কৃশ ক্ষীণকায় চেহারার এক ছায়া গ্রাস করছে শরীর। এসব একা হওয়ার বাহানা মাত্র। বাড়ির সকলে
ভাবে আমি ডুবে আছি লেখায়।

ডিসেম্বরেও বৃষ্টি হয় এখন। মনকেমন ঘিরে থাকে। চারদিকে বড়ো খিদে। কটা মাত্র হাঁড়িতে ভাত ফুটছে...
মা বেড়ে দিচ্ছে ঘুম। মায়ের কি কোনও গায়ের রঙ হয়?

খবরটা ছড়িয়ে পড়া মাত্র চারদিকে নিন্দের ঝড়। ছটফট করছে সাংবাদিকরা। পেপারে একগাদা বানান ভুল লিখে বিজ্ঞাপন হয় বাংলা ভাষার। আমি এক ঘুমন্ত শিশু। ট্রামে চেপে মুখে চুষি ঠুসে মায়ের স্তনের গন্ধ নিচ্ছি। মাও আজকাল ইংরাজিতে কথা বলে। চাকরিহীন একটা দেশে ইংরাজিটাই মুখ হয়ে উঠছে। অথচ আমার বয়স বাড়ছে আর গুলিয়ে যাচ্ছে আদপে আমার কোনও ভাষা ছিল কিনা!

নিঃশব্দ আহ্বান

চোখের আড়ালে বাড়ে রোগ
উড়ে যায় সাদা সাদা বক, এক ঝাঁক
আকাশের কোণায় কোথাও—মিলিয়ে যায় মেঘে।
তুমিও যেমন দূরে যাওয়া মানে—অদৃশ্যতা,
আমি আবার তাকেই দৃশ্য করে তুলি।

আগলে আগলে ঢলঢলে রাত, জলের ভেতর ঝাঁপ দেয়।
গভীর থেকে গভীর, আরও গভীর হতে হতে
যে টান নাভি ছিঁড়ে খায়
তার প্রতিটা তারে আঙুল বেজে ওঠে।

টেনে ধরে জিভ,
ঘোর ভাঙলে দেখি রক্তকরবীর মতো ফুটে আছে
আদুরে দুটো ঠোঁট,
নিঃশব্দে আহ্বান জন্ম দেয় আবার নিশ্চিত ঘুম।

একটা সাদা পায়রা

রূপকথা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে আলো,
কী তীব্র, নিষ্ঠুর।
বুকভাঙা শব্দে ঘুম ভাঙে
বৃষ্টির মতো রক্ত ঝরে বুক ফালা ফালা করে।

অন্ধ ভিখারি ভরসার হাতটুকু কাঁধে রাখে,
অথচ সামনে—খোলা ম্যানহোল
কালো হয়ে যাওয়া তৈলচিত্রের মতো জড়ো হয় বিস্ময়!

গতির পিছনে মৃত্যুর ছুট—
জলের ভেতর ভুড়ভুড়ি কাটে শ্বাস।
একটা সাদা পায়রা, রক্তাক্ত, উড়ছে তবু উড়ছে
যতক্ষণ না মৃত্যু তাকে চিনিয়ে দেয় স্তব্ধতা!

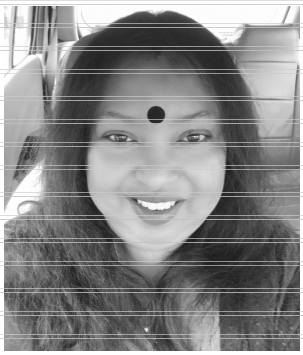

সোমা চৌধুরী লামা

মধ্যাহ্ন

কতগুলো উল্লেখ পাশাপাশি ছিল
তবু বদলের কথা ভাবিনি
হয়তো প্রত্যাশার রং
ঘুমের ভেতরেও ছিল সজাগ,
নির্দিষ্ট শব্দের অর্থে নিভন্ত মোমবাতি
মেঘরাত ফাটিয়ে জ্বলেছিল সেদিন
অথচ, তুমি বলেছিলে—

দরজা খোলা সহজ নয়।
দুপুরবেলার একটা গলিপথে
একাকী দাঁড়িয়ে থাকা ঐ সবুজ দরজাটা
ওরই শব্দে মোমবাতি নেভে বারবার।
বলতে পারা সব রকম টান
ভালোবাসার গল্পের গলিপথ ঘুরে
একদিন দুদিন সব দিন মাখামাখি করে
কখন যেন বড্ড শহুরে বনে যায়।
অথচ, তুমিই বলেছিলে—

এই উজ্জ্বল দুটো ঠোঁট
খেলা শেষ হলে আর খুলতে বোলো না।
ছেঁড়া দাগের কাটাকুটি খেলায়
অবিশ্রান্ত অথচ আজও নিমগ্ন আমি।

সোমার জন্ম চুঁচুড়ায় ভাগীরথী নদীর পাড়ে এক প্রাচীন জনপদে। ঘেরাটোপ জীবনের ধরাবাঁধা গণ্ডির ভেতর বেড়ে ওঠা। জীবনের একটা পর্যায়ে পুরুলিয়ায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এসে নতুন করে বাঁচতে শেখা। অলস প্রকৃতির মানুষ। খেতে ঘুরতে রান্না করতে ভালোবাসে। তিনজন চারপেয়ে বাচ্চার সঙ্গে আনন্দে থাকে।

হাতের তালুতে প্রখর দৃষ্টি
তালু ভর্তি আমাদের শ্বাস
ফিকে—
অথচ, তুমিই বলেছিলে—
সেগুলো ঘন শালপাতা রঙের—
একটা আশ্রয়
আর
খুব আঁটোসাঁটো।

উৎসব

আর কয়েক পা হাঁটলেই তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারব
ওই ছৌরঙা আকাশে।
দেখো, মেটে সিঁদুরে লাল হয়ে গেছে পথ
একমাথা জঙ্গল নিয়ে যুবতী ফিরছে মাদলের তালে
অনুচ্চার প্রসাধনে
নির্জন বাঁশির সুরে
সে কি ভুল কথা বলে?

একটা আগুন ছিল তার কান্নায়
বৃষ্টি হয়ে হয়তো ঝরেছিল অভ্যস্ত চোখে
তার কালো পা হার মেনেছিল তৃষ্ণার কাছে,
সে তৃষ্ণা আমার শ্বাসে।
বৃষ্টিরেখায় যখন কেটেছিল আমার সবুজ শরীর
তখনও আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে
চেপে রেখেছিলাম দুর্বল বিশ্বাস।
শুধু একটা আক্ষরিক চিঠির অসুস্থ প্রয়াস...

আলতার লোভ ওলট-পালট করেছে
আমার লালনের বেশ।
এক বুক বালিয়াড়ি নিয়ে তাই ইচ্ছে করে...
বড্ড ইচ্ছে করে...

ছদ্মনাম আঁকড়ে ধরে দৌড়াই—
ছোট ছোট খুশির ঢেউ
কানে কানে বলে,
আজঅ রমিতা ছ।
আজ উৎসব।
তোমাকে জড়িয়ে থাকার উৎসব।

শুয়ে আছে শব্দেরা

এক সীমান্ত আর সংযোজনের মাঝে
আমি বেঁধে রেখেছি আমাকে।
তাকে ছেড়ে চুপ করে লাশ হয়ে যাব?

আমি আর আমার মাঝে
অনেক নগ্ন পা
হাঁটুজল ভেঙে উঠে আসে।
সরু হয়ে আসা নদী ও কোমর
বিতর্ক ও আবেদনে মাঝিগিরি করে
পূর্ণ অনুচ্ছেদ।

ঘৃণা আর শ্বাসের মাঝে শুয়ে
শস্যহীন শরীর
মাথার কাছে আধগুঁড়ো মাটি
আমি হাত পাতি
আবারও আমার কাছে।
খুঁজি ভালোবাসা।
সংযোজন?
ঝাপসা সব—জলছবি
মোমবাতি হাতে কাঁটাতার খোঁজে, কবি।

ফিরে এলো প্রেম

কি অসহ্য মাদকতা!
আলগোছে লাফ দিল ধোঁয়াটা।
কাচের জানলার ওধারে আঁকা তুমি
কালচে নভেম্বরের শীতকাতুরে রাত
আধ ফাঁকা রাস্তার কিনারে
পান দোকানের জটলায়
থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

ধোঁয়াটা সরিয়ে দিল তোমার চুল,
তোমার ডান চোখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।
অসহ্য মাদকতা ভেদ করে
আমার প্রেমিক শরীরে
জ্যামিতিক বিন্যাসে দিঘি ঝুঁকে পড়ল।

শীতল চাহনির তীব্র হাওয়ায়
উড়ে গেল আমার পবিত্রতা,
তিরিশ বছর পর প্রেম ফিরে এল।

কখনও আধো ঘুমে

মহীনের ঘোড়াগুলি ওড়ে ঘাসের প্রান্তরে
জেব্রাক্রসিংয়ের ভিড়ে ওদের কাজ নেই।
অনন্ত কবিতার কালিতে বিষ ছিল
ছিল আলতো পায়ের আলস্য,
মহীনের ঘোড়াগুলি কি বুঝেছে সে কথা?

যে বিষণ্ণতা দেহখানি তুলে ধরে
নির্ভুল ফাঁকি দেয় হিসাবের খাতায়
যে ফুল ভালোবেসে ঝরে যায়
তার নিঃশব্দতায় চরে বেড়ায় ঘোড়ারা।

জানুয়ারি মাসে দেখেছিলাম একবার
উজ্জ্বল এক জন্মদিনে মহীনের ঘোড়ারা
খেলা করেছিল বনের আকাশে।
ধ্রুবতারার কানে হয়তো বা বলেছিল,
অনাসৃষ্টি সুখের সহবাস কথা—

মহীনের ঘোড়াগুলি কাছে আসে,
রাতের জ্যোৎস্না গলে, সাবধানে
আমাকে জাগায় অনৈসর্গিক পাপে।

কাঙ্ক্ষিত শিল্পের আদালতে আজ
চাতুরিহীন প্রবঞ্চনায় বিদ্ধ হই।
সীমাবদ্ধ আকাশে জেব্রার মুখোমুখি বসি,
ঘোড়াগুলি আসে, ভালোবাসে
অ-বিরোধী ভাবনায় ভেসে যাই একলা মানুষ।

শেষ চিঠি

পারলে আমাকে দিগন্ত প্লাবিত একটা চিঠি লিখো
যখন আমার মৃত ডানা দুটো
জানবে না মূল দরজাটা আজ কেন খোলা।
কোনও বধিরতা মূক করে দেবে আমায়
আর আমি দু হাতে অন্ধকার ঘাঁটব।
গায়ে লেপটে থাকবে শীতল মৃত্যু আর দুটো নিম ফল
স্থির হয়ে ভাবব হলুদ পাখিটার কথা
পড়ন্ত হেমন্তে ডানা মেলার কথা।
পারলে তখন আমায় একটা উপহার দিও।
আমার মৃত ডানা দুটোয় রেখো অনন্তের আগুন
তার নিজস্ব আলোয় আমি দেখব তোমার পিঙ্গল চাহনি।

তোমার বুঝি মনেই পড়ে না
স্পষ্ট উচ্চারণে আমি বলেছিলাম
ভালোবাসার কথা কোনও একদিন
তোমার প্রত্যাশায় ছিল নিশ্চিত উন্মীলন
শরীরে মনে অলৌকিক বিশুদ্ধ আলো।
বিবশতা কেটে গেলে দেখি
আমার আরক্ত ঠোঁটে ধরা আছে দুটো নিম ফল।

হাওয়া নেই কোথাও।
চারিদিকে সাদা-কালো আগুন
বীভৎস বিকৃত কিন্তু স্পষ্ট কঠিন বাস্তব
গ্রাস করে নিচ্ছে ভূমি... মা...
সেই থেকে মৃত আমার চোখ
আবছা হয়ে যাওয়া আমি
পুরনো ছবিটার মত দ্রুত ভেঙে যাব
আজ অথবা কাল।

তার আগে একটা চিঠি লিখবে তো আমায়?

অয়ন চৌধুরী

জন্ম ১৯৯৩। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে এনআইটি রৌরকেলায় গবেষণারত। প্রথম কবিতা প্রকাশ ২০১০ সালে।

এরপর ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন কাগজে অসংখ্য কবিতা প্রকাশ। পাশাপাশি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পাঁচটি। গল্পগ্রন্থও রয়েছে একটি। সম্প্রতি তাঁর উপন্যাস 'মাংস কাটার মেশিন' বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে সম্পাদনা করছেন 'স্রোত' নামে বাংলা সাহিত্য সাময়িকী। কবিতা ও সম্পাদনার জন্য বিভিন্ন সময়ে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হয়েছেন। 'যদি দু'টুকরো জেরুজালেম ছুড়ে দাও ঝুলবারান্দা থেকেই' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অন্যমুখ সাহিত্য সম্মান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য লালগোলা উৎসবে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সম্প্রতি কৃত্তিবাস পুরস্কারের অন্তর্গত তারাপদ রায় সম্মাননায় সম্মানিত হয়েছেন 'হে বিষ! হে অন্তরীক্ষ!' কাব্যগ্রন্থের জন্য। পাশাপাশি অয়ন একজন চিত্রশিল্পী। প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। সম্প্রতি অনেক বাংলা বই সেজে উঠছে তাঁর প্রচ্ছদে। আগ্রহ রয়েছে গ্রন্থেতিহাস ও অলটারনেটিভ সাহিত্য নিয়ে গবেষণায়।

দাগ

সকালের পাতাভাঙা পাতলা রোদের কাছে
তোমার উষ্ণতার মতো স্বরলিপি লেগে আছে
জলের আলপনা আর নিরন্ন পাখির কুহকে থমকে যাই
বিষাদের ক্যালিগ্রাফিতে শেষ দুঃখঘোরটুকু নামিয়ে দিই। ছায়া ডেকে আনি
খোলস ভাঙছে যে সাপ তার পুরনো দাহ কি সে ফিরিয়ে দিল!
এই অসহায় পর্ণমোচী বিকেলের দিকে তাকাতে বড় ভয় হয়। যে কোনো মুহূর্তে ঝুপ করে নিভে যাবে আলো
নিমগ্ন চেয়ার আর বিষাদগ্রস্ত উন্মাদের মতো পেয়ালার কাচে লেগে আছে ঠোঁটের সমস্ত নিয়মিত পাপ

রাস্তার খাঁ খাঁ আলো। দু'একবার ভিজে যাওয়া রুমালের শেষে লেখা থাকে

কান্নার দাগে মুছে যাওয়া মেঘাতুর রাত্রি
যখন আর কোনও গান নেই, ফাল্গুন এসেছে ধারালো শ্রমিকের শন শন অস্ত্রের মতো
তখন ভূতগ্রস্ত সন্তানের মতো সমস্ত গোপন চিরকুট উড়িয়ে দিয়েছ বাতাসে
একা একা হেঁটে চলে গেছ সাংঘাতিক স্পর্শের মতো রাত্রির দিকে
পড়ে আছে দাগ। দাগী আসামীর মতো বিবর্ণ বয়সে...

আরণ্যক

সেদিন তার করোটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল গর্ভবতী এক ফুলের দেহ
ক্রমে সে ফুলের কাছে পূর্ণচাঁদ নেমে আসে
তার চোখের ভাষায় লেগে যায় আরণ্যক জ্যোৎস্না
সেখানে গুটিয়ে থাকে বিষাক্ত ছোবল
সেখানে ফুটে ওঠে মাদারী গাছের ঘন ছায়া
দ্রাক্ষাবনের পথ চিরে ওখানে দাঁড়িয়েছে পুথির বিকেল
ঢোঁড়া সাপ ও জলের সঙ্গম
ঘোর হয়, ঘোর লেগে থাকে পাতায় পাতায়
বৃন্ত ছুঁয়ে নেমে আসে মেঘের গর্জন ভূর্জপত্র-জালিকা ও শিরায়

এত কিছুর পর সে রাতে তুমি তার কাছে সন্তান চেয়েছ।
চেয়েছ জাদুভ্রম ও মন্ত্রপাঠের মৃগনাভি সুর
সে তোমার দিকে চেয়ে আছে। অথচ তার মন ঘৃণার আতুর
করোটি খুলে দেখিয়েছে গোপনে রাখা কত বীজ নষ্ট হয়ে গেছে দিনে দিনে
ছায়া মেখে গর্ভ পড়ে আছে। শোক ঢাকা আছে মায়ার কাফনে...

অলীক

সেদিন সূর্যাস্তের আলোয় পাখিদের কান্না ভেঙেছিল
ওদের বাসা কত সামান্য, কত দুঃখ ছোপানো
আকাশে উড়ছে মেঘের অহংকার, চূর্ণ হীরের মতো তারাদের আলো
ছুরিতে লেগে থাকা রক্তের মতো আবছায়া ভেঙেছে যখন
জোড়া নিমগাছ, ফলের গন্ধ নিয়ে জল থেকে উঠে এল প্রেতের ছায়া
ঘোরানো পথের বাঁকে সাইকেল রাখা
মেঘে মেঘে ঢাকা জমির আলপথে প্রেমের খাতা খুলতে খুলতে সন্ধ্যার আরতি, শাঁখ
মায়ের বকুনি খেতে হবে বলে কত কত দিন পার হয়ে গেল, কত পার হয়ে গেল সমীহ শেখার বয়স
কত গাছজীবন শেষ হয়ে গেছে
কত লতা শিখেছে আদর। সকালের ফুলগাছে সাপ জড়িয়ে ছিল

কোনও আপেল নয় দু'টুকরো মাধবীলতাই এ সর্বনাশ ঘটালো
ওষ্ঠ ছুঁয়ে নেমে আসে অলীক অভিসার, নীল হয়ে যায়, নীল হয়ে যায় ক্ষতের মুখ
এ যেন শুধু বিষ আর বিষের অসুখ...

জঙ্গলের কবিতা

শহরের নির্বোধ গোঙানি শুনে সে রাতে থেমে গেল পশুদের ডাক
আগুনের চাপ খসে গেল মেহগিনি রঙের অগ্নিকুণ্ডে
আমি তখনও সাহস করে নাম ধরে ডেকেছি দু'বার
তাকিয়ে থেকেছি দূরে জোনাকির মতো ঘরের দিকে
প্রেম ও মৃত্যুর আলিঙ্গন সেখানে গাঢ় হয়ে আসে
এরপর টর্চ গড়িয়ে গেল। মনে হল পাহাড়ের আধখানা খুলে গেছে
মোহগ্রস্ত প্রেমের পর বাতাস উঠল। ঢালু হয়ে এল চোখ।
যত আমার দেহ কেঁপে ওঠে তত বসে যায় নখ। আয়ু ফুরিয়ে আসে।
অন্ধকার ফিকে হবে যখন, শিউলি ঝরেছে ঘাসে ঘাসে
বুকের উপর নেমে আসা সৌরমণ্ডল আর অন্ধকার আমাকে শুঁকে দেখে নিচ্ছে
টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদের কলোনীতে

এরপর বিস্ময় আমাকে অন্ধ করে দেবে...

সর্বনাশ

সামান্য বিরতির পর প্রতি শব্দের পাশে অহেতুক বিস্ময়ে কিছু স্বর পড়ে থাকে
পোশাকের প্রান্তিক আলোয় গোধূলি ঘনাল
দু'মুঠো চাল চেয়েছিল ওরা, চেয়েছিল একমুঠো বিশ্বাসের তুষ
বন্দুকের নলে লতা আর পাখিদের কোটর হয়ে আছে
পুকুরের পাড়, বেসামাল সাঁঝের নেশা লেগে আছে তোমার বুকে
বুকপকেটের মতো ছোট একটা হৃদয়, স্নানঘরে গান ভিজে যায় জলের তোড়ে
এভাবে হাতের কাছে মেঘ খুলে যায়, খুলে যায় পোয়াতি ছায়ার ভারী দেহ
সর্বনাশ আমাকে ভালোবেসেছে, গোপনে চেয়েছে শরীর
শরীরকে শরীরের কাছে ভেঙে ভেঙে ভোর হয়ে এলে
জলের সারগম, কুয়াশার শৃঙ্গার, সবজিখেতের ধু ধু সবুজ পেরিয়ে রাতের পাখিরা ঘরে ফিরে আসে
আমরা জখম ও তল্লাশি নিয়ে জেগে উঠে বিস্মিত বালকের চোখে রোপণ করি বিপর্যয়ের রাত...

একটি শারীরিক কবিতা

একদিন হুস করে তুমি দিনের ভিতর ঢুকে এলে।
তারপর রোজ টুকে রাখি সমূহ বিলাপ। নৈঃশব্দ্যের গর্জন।
কুচি কুচি কাগজ উড়িয়ে লিখে দিই দিনান্তের প্রস্তাবনা।
ও ঠোঁটের কাছে আত্মহত্যার মতো গোপন কোনো স্পর্শসুখ নেমে আসে
আহত বৃষ্টির মতো ছবিগুলি শুকিয়ে আছে দাগে, আঁচড়ে, ক্ষতের অধিক ক্ষতে
শূন্য খেত, ধু ধু আলপথে যেভাবে উপুড় হয় জ্যোৎস্না সেভাবে
কবে যেন এক বিন্দু ঘোর লাগা তোমার মণিকাঞ্চন ছুঁয়ে তিরতিরে নদী জেগে ওঠে।
আমি ডুবে যেতে যেতে একবার হাঁ মুখে এসে লেগেছিল তরল আগুন
সেই আমার উন্মাদের মোহ অথবা মোহের উন্মাদ

আগুনের ভাপে ঘেমে ওঠা এ শরীর এখন শীতল। শীতলতা ছুঁয়ে বসে আছ তুমি।
যেন আগলে রেখেছ দেহ, যেভাবে প্রতিটি ধ্বংসকে আগলে আছে নিয়তির আঁচল...

র ত্না মু খো পা ধ্যা য়

জন্ম এবং বেড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায়। বাবা কার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক ছিলেন, মা গৌরী চট্টোপাধ্যায় গৃহবধূ। কবি রত্না মুখোপাধ্যায় বর্তমানে টেকনো ইন্ডিয়া বিএড কলেজে কর্মরতা এবং কর্মসূত্রে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'একলা চাঁদ' ও 'ফেরারি বসন্ত'। সম্পাদিত পত্রিকা 'মনের ক্যানভাস'। সাহিত্যচর্চার জন্য উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে একাধিক সম্মাননা ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র (ঢাকা) আয়োজিত আন্তর্জাতিক গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু, ড. অরুণয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুমন্ত্র সেনগুপ্ত, শ্রী কাজল সুর, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বর্মন ও শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী সহ আরও একাধিক স্বনামধন্য বাচিক শিল্পীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি নানান সমাজসচেতনতামূলক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত।

দিনান্তে

বেলা পড়ে এলে, খোকন ঘরে ফেরে।
মা আলো জমিয়ে রাখে।
স্মৃতির ঘরে জিইয়ে রাখে
টমটম গাড়ি, বন্দুক, লাঠি লজেন্স
ঘুড়ি লাটাই, ফুটবল, ব্যাট বল,
ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগ আরও কত কী
কুল কুল করে বয়ে যাওয়া নদীটার
বালি সরালেই টলটলে জল!
মা খোকন আঁজলা ভরে জল তোলে
দাদুভাই এসে বলে, ঠাম্মি আজও চিলডেন্স ডে!
খোকন নড়েচড়ে বসে, মা মুচকি হাসে
মনে মনে বলে আট থেকে আশি সময়ে সব সমান্তরাল।
সময় পাশ ফেরে, মা খোকন আবেশে চোখ বোঝে।
স্লেট, পেনসিল, ধারাপাত, কিশলয়,
আগের মত ছড়ানো ছিটানো
ঠিক আগের মতই খোকা সুর তোলে—
অ-অজগর আসছে তেড়ে
একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ।
মায়ের কোলে খোকন,
খোকনের কোলে খোকন...
এক সুরে পাঠ করে

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"
সেই আশাবরী সুর ঘর ছেড়ে
পায়ে পায়ে দিগন্তে পা রাখে।।

হাঁক

আগে ঘুম ভেঙে গেলে
জাগতে রহো হো হো হো হো
চৌকিদারের হাঁক শুনতে পেতাম।
আমি তখন মনে মনে বলতাম
আমি জেগে আছি।
এখন রাত...
আমি গা এলিয়ে শুয়ে আছি
মায়ার সোহাগে বাহুবন্ধনে
মোহ রিপু, ছেলেমেয়েরা
আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘরময় খেলছে।
এখন রাত, বুড়ো রাত
ঘরের জানলা দরজা বন্ধ
চৌকিদারের সেই হাঁক শুনতে পাই না
আমার দুচোখে ঘুম নেই
আমি জেগেও নেই।

রূপ মাধুরী

জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে জন্ম
কালের প্রবাহ চলে, মাঝখানে জুড়ে থাকে জীবন।
শূন্য থেকে শুরু, শূন্যতেই শেষ শূন্য দিয়েই সংখ্যা জুড়তে শেখা।
শূন্যে শূন্য মিলে গেলে নাকি ভয়ংকর সুন্দরতা!
আমি এক রূপসীকে আলপথ ধরে হাঁটতে দেখেছি।
খণ্ড ছুঁয়ে অখণ্ডে ডুবতে দেখেছি।
আলো জল মাটি মেখে কাঁচা মন পাকতে দেখেছি।
তার রিক্ত শূন্য অপরূপ রূপলাবণ্য,
দেখেছি তার তৃপ্তির স্নান মিলন উৎসব।

ছায়া ও কায়া

প্রতিদিন কেনাবেচা চলে
আমার নগ্ন শরীরের ছবি।
দারিদ্রতার জখমে
শরীরের পলেস্তারা
নীরবে খসে পড়ছে
সমাজ সভ্যতায়।
শিল্পীর খেয়ালে আমাকে
একটু একটু করে নগ্ন করে
তার আপন চাহিদা মত।
নারী শরীরের চড়াই উতরাই,
সমস্ত রেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়
ক্যানভাসে রং-তুলির ছোঁয়ায়
বিজ্ঞাপনে আলোর রোশনায়ের মাঝে
আমার শরীর জরিপ করে আসে
কত শত নান্দনিক স্বীকৃতি।
ক্যানভাসে উল্টো দিকে জমে থাকে
আমার দুঃসহ অন্ধকার।

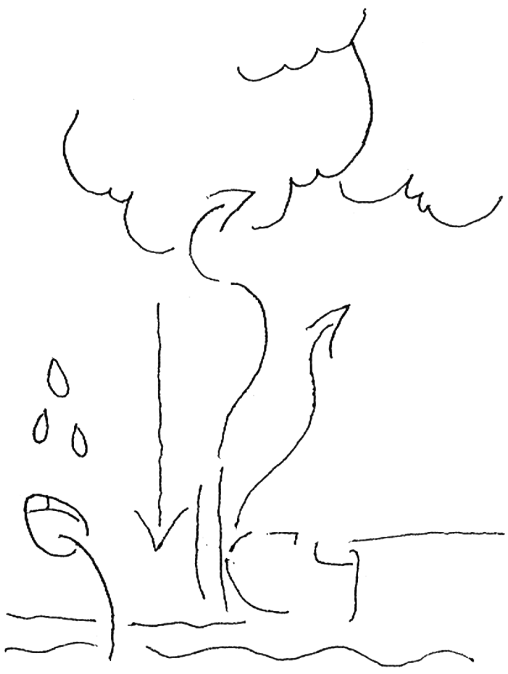

গো বি ন্দ ধ র

(ত্রিপুরা)

গোবিন্দ ধর শুধু কবি নন, একাধারে স্রোত পুস্তক প্রকাশনা, সাময়িকী সম্পাদনা ও লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন সহ বিচিত্রবিধ সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অতি জীবিত এক দ্রোহবীজ। যা তাঁর স্বখোদিত ভাস্কর্যের মতো প্রস্ফুটিত। তাঁর কবিতা পাঠের সাথে সাথে পাঠক স্বখননের সলিলে ডুবে যাবেন নিজেরই অজান্তে এ বিশ্বাস ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। কবি যেন এক সুদক্ষ শৈল্যবিদের মতো নিজের জীবনকে নিজেই কাটাছেঁড়া করতে করতে বিশুদ্ধ উচ্চারে ছড়িয়ে দিচ্ছেন জীবনবেদ। আর পাঠক সেই বেদবীজ থেকে খুঁজে পাচ্ছেন যেন নিজেরই দ্রোহবীজ।

লিখি, কেন লিখি

লিখে কিছু হয়? আদৌ কিছু হয়?
তথাপি লিখি, নিজেকেই।
লিখি ভাঙচুরের পর মৃত প্রবাহ।

নিজের ফোঁসফাঁস দীর্ঘশ্বাস
ছোবলের পর ঘুরে দাঁড়াব
লিখি ভাঙচুরের পর—দাহপ্রদাহ।

যা লিখি

যা লিখি সব মাটি হয়ে যায়।
যা লিখি সব কেউ লিখে গেছেন।
যা লিখি সব ছায়াবাজি।

মাটি ও মানুষের কথা লেখা হল কই?

লিখি

এখন সন্ধিক্ষণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

বৃষ্টি নেই। খাঁ খাঁ শিমুল বসন্তকাল।
দুঃখজল গ্লাসে ঢেলে নিজেকেই করি পান।

তর্জনী তুলে চোখে চোখ রাখো, অর্জুন।

লিখি, একাকিত্ব

ভূখণ্ড বলতে একাকিত্ব বোধ, গভীর সন্ন্যাস।
পাশ কেটে পথ চিনে নিতে হবে।
যে পথে সকলেই হাঁটে সে পথ বকুল বিছানো
কবি হাঁটেন কণ্টকময় ভিন্ন পথে।

পায়ের তলা রক্তাক্ত হতে হতে কবি চিনে নেন
গোলাপের সুগন্ধ আর সৌন্দর্য।

সকল দ্রোহবীজ পুঁতে রেখে, কবি
সামলে রাখেন ক্রোধ। অবহেলায়
রক্তাক্ত হৃদয়ের লাভডুব বেড়ে গেলে
কবিকে শান্ত রাখতে কবিই গ্লাসে ঢেলে দেন
নিজের মদ।

এক ঘোর লাগা মুহূর্তে কবির কবিতায়
একাকিত্ব এসে ধরা দেয়।

যেভাবে পথে পথে পড়ে থাকে শিমুল পারভীন।

লিখি ভূখণ্ড

নিজস্ব ভূখণ্ড আঁকি।
প্রথমে আঁচড় কাটি একটি বিন্দু।
তারপর চাবুকের আঘাতের চিহ্ন রাখি বুকে।
ধীরে ধীরে তুলি চালাই।

নিজস্ব পুরুষের নিকট যেভাবে বিপ্রতীপ বিশ্ব
এসে হাল ভেঙে পড়ে—সেভাবেই আঁকি
সাদা পাতায় নিজস্ব ভূখণ্ড।

পথে পথে, আঁকি

শিমুলবিছানো পথেই এগোতে থাকি।
পথ পরিক্রমণ করলেই
গন্তব্য নিশ্চিত।

পথে পথে পড়ে আছে শিমুল।
মাড়িয়ে যেতে বুকে লাগে, তথাপি
এই শিমুলরাঙা পথের বিকল্প কিছু নেই।

মুখ অথবা প্রতিকৃতি, লিখি

নিজের মুখ আঁকতে আঁকতে যে প্রতিকৃতি
তাকেই রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রতিকৃতি বলেছিলেন।
আমি শ্রী গোবিন্দ ধর বলি আত্মমুখ।

নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে করতে পুনঃ সিলি করি।
মুখোশ ছেঁটে ফেলে আঁকি মুখ। আঁকি
নিজের ব্যবচ্ছেদ। ডারউইন তাকে বলেছেন:
টিঁকে থাকার কুশল ও কৌশল।

পাঠ

তুমি যতই লুকিয়ে রাখো মুখ
মুখমণ্ডল জুড়ে লেখা থাকে
কুশল ও কৌশল।
এই পাঠ শিখে গেছি বিগত শতকেই।
ছলনা ও ছোবল থেকে ভালোবাসা চিনে নিতে
কোনও পরিশ্রম দরকার নেই।

যদিও পথ পরিক্রমণ শিখিয়ে দিলে
অ-তে অজগর তেড়ে আসে।
এ কথা বিলকুল ভুলে যাই বলে
আমিই হাঁদারাম—আর তুমি শিবরাম।

ভাষাশিল্পী, আপনি, আপনাকে

এখন আঁধারের বদলে অন্ধকার
লেখা হয়।
গবাক্ষের পরিবর্তে জানালা।
রাত্রি নয় কবিতায় রাত বেশি মানানশীল।
নিশিকাল থেকে নৈশকাল বললে
বেশ ওজনের তারতম্য হয়।
একজন কবি শব্দ নিয়ে খেলবেন।
কোথায় কত ওজনের শব্দ বসানো দরকার
যখন আপনি অনুভব করতে পারবেন
তখন আপনার কবিতা কথা বলবে, গণমানুষের।

গণমানুষের কথা বলতে শব্দ জ্ঞান অর্জন করতে হবে
এমন নয়।

আপনি ভাষাশিল্পী মনে রাখুন:
শব্দে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে আপনাকেই।

শব্দ যখন টুংটাং বেজে উঠবে
বুঝবেন, আপনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

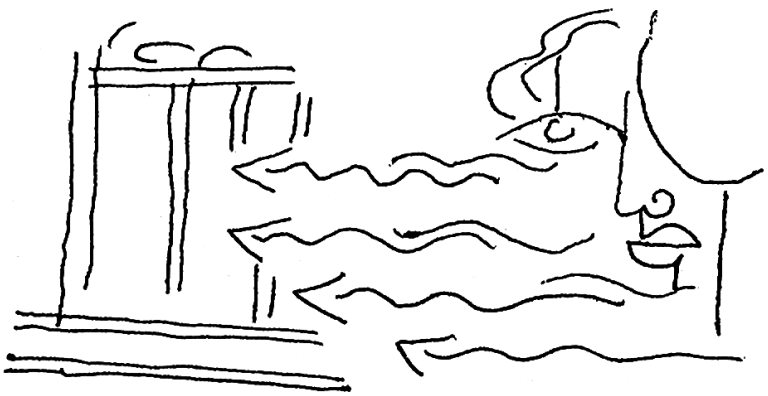

পার্থ আচার্য

দর্শন

ঘৃণার বিপরীতে প্রেম এক
সহজ দর্শন

দুধে চুমুক দেওয়া বেড়ালের মতো

বাটিটিতে দুধ ছিল
প্রেম কি ছিল কোনোদিন

চাবি

অসমবয়সী সেই রাত্রির পথে হাঁটি
উড়ো মেঘ হয়ে কেটে গেছে দিন

মেলা শেষে পরে থাকা
দোকানির হিসেব খাতায়
কাব্যেরা ডানা মেলে যায়

চক হাতে ভোরের বিমান
জানবে না দূর থেকে
হাত নাড়া বালকের নাম
চাবি তার হারিয়েছে কবে
কোনও এক বিস্মৃতির ভোরে

জন্ম ১৯৭৪ সালের ১ অগস্ট। পিতা প্রয়াত শ্যামলেশ আচার্য। মা বিভারানী আচার্য। কলা বিভাগে স্নাতক। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। শুধুমাত্র লেখালিখির জন্যই ২০১৩ সালে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। সম্পাদিত পত্রিকা ‘সমান্তরাল ভাবনা’।

বাংলা

বৃদ্ধ মুচির কাছে নীরবতা
ভাঙে লাজুক মেয়েটি
কতটা জোড়াতাপ্পির পর
সে আবার হেঁটে যাবে

অন্ধ ভিখারির সাথে
গান গাওয়া রুগ্ন কিশোরীর
চোখে প্রান্তিক স্নেহের ছায়া

নকল কামানের মুখ
দীর্ঘশ্বাসে ছুঁয়ে দেয়
বাতিল এক ট্রাম

মৃত সে পরির ডানায়
এভাবেই ঘুম নেমে আসে

নদীমাতৃক দেশ আমাদের
একটু শুলেই ভেসে আসে
ভাটিয়ালি সুর

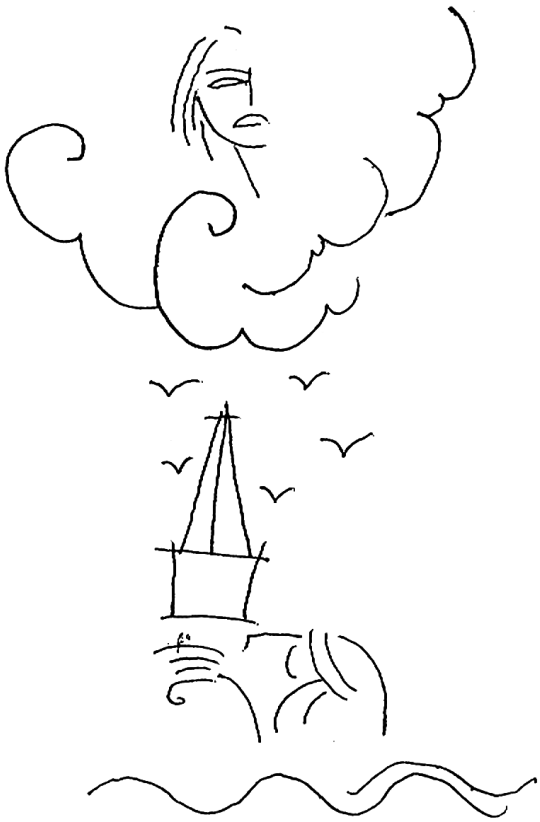

বন্ধুর বাড়ি

আচার-বয়ামের ভিতর দেখা যায় বন্ধুর বাড়ি।
পাতাবাহারের ছায়ায় দেখা সেই সদর দরজা। লেবু গাছের পাশে
নিজে থেকে বেড়ে ওঠা করমচা আর ধুতরার ফুলে
লেগে আছে পরবের আলো। বর্ষায় বাড়ি বাড়ি
মাছ ফেরি করে যে, সেই তো এনেছিল ধান মাঠ থেকে...

বাংলার খাল-বিলে অলৌকিক মায়া-গল্পগুলি
যেভাবে হারায়...

অভিজিৎ মণ্ডল

জন্ম ১৩ নভেম্বর। সবুজ প্রকৃতির স্নেহছায়ায় তাঁর বেড়ে ওঠা প্রত্যন্ত এক মফস্বল শহরে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'ভুল ঘর, আমাদের পোকামাকড় সংসার' (২০১০), 'নৈশ বন্দর' (২০১২), 'অশ্রুবাদক' (২০২০)।

স্বেচ্ছামৃত্যু, অথবা নির্বাসন

পূর্বরাগ

গানের ভিতর নেমে একজন সমানে খুঁজে চলেছে ভৈরব, অন্যজন পূরবী। একজন রাগ, অন্যজন রাগিণী। অদূরে দিগন্ত জুড়ে ঘন মেঘের ঘনঘটা, হয়ত বৃষ্টি আসবে খানিক পরেই, ভিজিয়ে দিয়ে যাবে মেয়েটির শিউলি গন্ধ মাখা করতল আর ছেলেটির ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুস। ফাঁকা মাঠ, ধু-ধু। তারও কিছুক্ষণ পর হয়ত মেয়েটি নিজেই বৃষ্টি হয়ে উঠবে, ছেলেটি গাছ। তারা জানে, তার বেশি কাছাকাছি এলে কোনও গানই আর গান হয়ে উঠবে না। ঠিক যেভাবে কোনও কোনও দিন ছেলেটি কাঙাল হলে, মেয়েটি কুহক হয়ে ওঠে। সেতারে সন্ধ্যে বাজে, একা একা...

এক

নিঃসঙ্গতা যেন পুরুষ সেজে বসে থাকে
কলারের নীচে, সাবেকী ঘের ছিঁড়ে
গড়িয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন বোতামের মতো

কষ্টের শরীরে দাহ করি রোজ
আত্মগত অভিমান, ঘৃণা ও ক্রোধ...

ঘাতক চিতার মতো, দু-চোখে
ক্যাম্প-ফায়ার জ্বেলে—
যেকোনো স্বেচ্ছামৃত্যু উস্কে দেয় এই জঙ্গল

আমি তার নিশানা ধরে ধরে হেঁটে আসি
হত্যার শরীরে আরও এঁটে বসে সন্দেহ

দুই

সম্মোহিত সন্ধ্যে নামে

স্বপ্ন পাল্টি খায় ঘুমের ভিতর
ঘরের পৃথিবী এসে বাইরে দাঁড়ায়

দাঁড়ের ঝাপটা সামলে—ছলাৎ ছলাৎ
স্থবির শরীরে বাজে জলের উচ্ছ্বাস

আত্মমুগ্ধ, ভেসে যায় কেয়াদির বুক!

জলের কিনার ঘেঁষে শুয়ে থাকে
একা; অনন্ত বালক...

তিন

মুখর দিনের শেষে, কলরবপ্রিয়

এইসব নির্জনতা পেরিয়ে
আয়নাও ধরে রাখে পাখির কলতান
মৃদু মৃদু হাওয়া বয়—সন্ধ্যের দিকে—
জোনাকির আলো জ্বলে, নিওন
তেলের কুপি উল্টে

বিষণ্ণ ছায়াটি নড়ে ওঠে, বুকের ভিতর।

চার

নিজেকে কুড়োতে এসে
যেভাবে ছায়ার কাছে
আত্মসমর্পণ করে সব আলো

স্পর্ধা নামিয়ে রেখে
তুমিও, এসো হে

কীর্তনে হল্লা হোক পাঁজরের ঘাট
ভেঙে আমরাও নেমে যাব
অথৈ...অথৈ...

ঘুমন্ত রাত জানে, শিশিরের স্তব্ধতা ভেঙে
মৃত বালিকার মুখে জেগে ওঠে ভোর।

পাঁচ

ফুলের বাগান ভেবে সরে সরে, যে গেছে
খাদের কিনারে—সবুজ দৃশ্য ভরা চোখে তার
ঝরনা উপচে পড়ে, পাহাড়ের নিস্তব্ধতা...

এমন প্রমত্ত দিনে সেও কি নিজেকে
প্রজাপতি ভাবে, ভাবে নিরুদ্দেশ কুয়াশার ভিতর
কোনও উন্মাদ যুবকের ভেসে ওঠা মুখ?

একা, সে কিশোরী—
রোদের নরম ডানায় রঙ ছিঁড়ে ছিঁড়ে
গুপ্ত ছোরায় লিখে রাখে ঋতুদোষ।

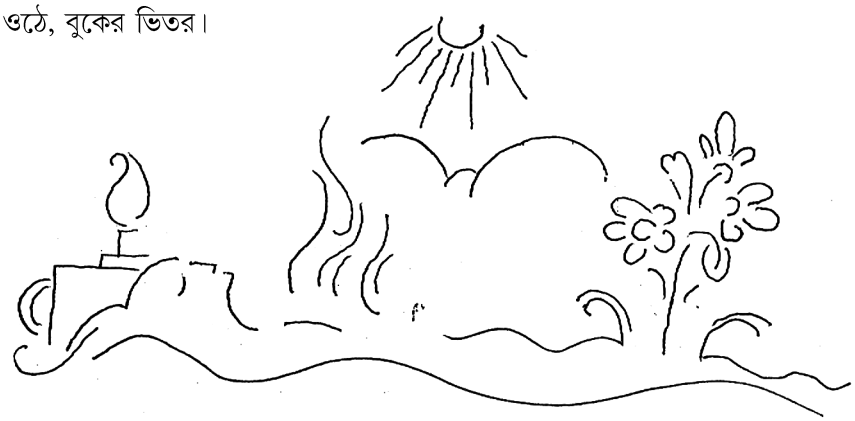

ছয়

তুমি আমার পাশে পাশে হাঁটো
আমি তোমার পাশাপাশি—

কে কাকে অনুসরণ করে, কে কার
সঙ্গে থাকে—সেসব প্রশ্ন সরিয়ে রেখে
অতল জলের নীচে, নিবিড়

বুদবুদে ভেসে ওঠে ছায়ার শরীর...

কে কাকে ছেড়ে গেছে, কে কার মুক্তি
এসব ভাবলে এখন—শিকড়ে টান পড়ে
ঝুলন্ত হ্যাঙারে দোলে বিষণ্ণ পৃথিবী!

সাত

স্বপ্ন বলে জানো তুমি
আমি তো জেনেছি স্নান বলে

তারও গভীরে ঢুকে দেখে আসি রোজ
আমাদের ফেলে আসা পাড়া, কলঘর, চণ্ডীমণ্ডপ
নিহিত পাতাল ছায়ায় চকচকে বালি ঝেড়ে
তুলে রাখি শৈশব—

অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ,
ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলে মাটির কলস।

আট

জন্ম জড়িয়ে ওঠে বোধের আঙুলে
আমি তার স্পর্শ চিনি—
সে চেনে আমার বিষাদ

চোরকাঁটা বিঁধে থাকে গোপন কুঠুরিতে
জলরঙে গুলে নিই গাঢ় নীল আকাশ

দেখি; আগামী প্রজন্ম ঠোঁটে—
শিমুল তুলোর বীজ, উড়ে বেড়ায়
সারা ঘরময়

ধমনীতে বেজে চলে মরা পালকের গান...

নয়

আমাকে আততায়ী ধরে এগোতে এগোতে

যেভাবে আড়াল শিখে নিচ্ছে কান্না
ভুলে যাচ্ছ কেন—গোপন হত্যারও
সুপারিকিলার থাকে, ফেলে আসা রাতের কথা
মনে করাচ্ছে—এইসব অন্তর্বর্তী অনুযোগ—

যদিও, সব তদন্তই প্রমাণ সাপেক্ষ...

তবু কোনও কোনও সুন্দরের চোখে চোখ রেখে
নিজের প্রকৃত খুনিকে চিনে নেওয়া যায়!

দশ

মুণ্ডুহীন দেহ শুধু শুয়ে আছে যোনির ভিতর
আমি তার কান্না শুনি, রক্ত-দ্বেষ-ঘৃণাময়
জীবনের পাশে জেগে থাকেন—একা—
নির্বিকার জননী,
তাঁর ভ্রাম্যমাণ ডানায় ওড়ে বোধের চেতনা।

প্রলুব্ধ জিভের ডগায় বসে থাকেন
তিনি মা অন্নপূর্ণা, আরাধ্যা দেবী আমার
ধান্যদুগ্ধে ধুয়ে দেন ধরিত্রীর বুক
আমি তাঁকে পূজা দিই মাংসের থালায়

এভাবে অন্ধকার মুছে মুছে ক্রমশ
আলোর দিকে যাই—
পাপ কুষ্ঠে খসে পড়ে তৃতীয় আঙুল।

সৈকত রক্ষিত

জন্ম ১৯৫৪ সালে। ১৯৮৩-তে প্রকাশিত 'আকরিক' উপন্যাস থেকে তিনি এক স্বতন্ত্র উপন্যাস-ভাষার প্রবর্তন করেন। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প এবং কবিতাতেও তিনি জনপ্রিয়। আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনই আখ্যায়িত হয়েছে তাঁর লেখায়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'হাড়িক', 'অক্ষৌহিণী', 'ধূলা উড়ানি', 'বৃংহণ', 'সিঁদুরে কাজলে' ও 'সিরকাবাদ'।

বাংলা সাহিত্যে পুরুলিয়ার লোকভাষাকে তিনিই প্রথম সংযোজিত করেন। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিকাশ মন্ত্রক থেকে প্রতিভাবান তরুণ লেখক হিসেবে ফেলোশিপপ্রাপ্ত।

বর্তমানে পুরুলিয়া সংস্কৃতি কেন্দ্রর পক্ষে সৃজন উৎসবের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের সংগঠিত ও উজ্জীবিত করার কাজে রত। বাংলা আকাদেমি পুরস্কার-সহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননায় সম্মানিত।

কমরেট চুনুলাল

জয়পুর-ঝালদা অঞ্চলের বহু মানুষ বিড়ি বেঁধে দিনাতিপাত করে। এমন ঘরও আছে যাদের পূর্বপুরুষ শতবর্ষ আগেও এই বৃত্তিতে থেকে ঝাপসা দিন কাটিয়ে গেছে, বর্তমান প্রজন্মও সেই ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে চলেছে।

কোথাও কোথাও এই পরিবারগুলির গার্হস্থ্য পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ঘরের দুয়ারে

গোমূত্র ও গো-লাদ। শূকরী মায়ের স্তন্যপান করছে ছানারা। খালি গায়ে নোংরা জবজবে নাক নিয়ে ছোটাছুটি করছে বাচ্চা—হাসতে গিয়ে নাকে বেলুনের মতো পটকা ফুলছে। হামাগুড়িরত শিশু খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে মায়ের জানুতে কাদামাখা হাতে চাপড় মারছে। খাটের তলে দিব্যি ল্যাজ নাড়ছে পাতি হাঁস। কারো ঘরদুয়ারে সৈনলা গাছে বাঁধা কাড়ুলি বাছুর হামলাচ্ছে গায়ে গোবর নিয়ে। কতদিন যে চান করানো হয়নি!

তারই মধ্যে চলছে বিড়ি বাঁধার কাজ। মাটির মেঝেতে মাদুর-বস্তা পাতা, পাশে পড়ে রয়েছে কুলা-ডালা। বউটি মাথায় আঁচল ফেলে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল—বৃষ্টির কারণে অশ্বত্থ গাছের তলায় জড়ো হওয়া ছাগলগুলিকে ঘরে আনতে। পুরুষটি ঝুমুরের কলি গাইতে গাইতে সাইকেলের চাকায় ভোঁস-ভোঁস হাওয়া দিচ্ছে। তারপর ফের হাত লাগাবে কাজে।

কোথাও নাইলন দড়ির খাটে পাশাপাশি বসে বৃদ্ধবৃদ্ধা। গায়ে মলিন বস্ত্র, চোখে তৈলাক্ত চশমা। বিড়ি বাঁধার সুতা, কেন্দুপাতা, তামাক, কাঁচি তাদের কোলে। সাইজ করে পাতা কাটছে, তাতে একচিমটে তামাক দিয়ে চুঙ্গির মতো পাকিয়ে নিচ্ছে, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সামনে-পিছনে মুড়ে গোড়াটি সুতো দিয়ে বেঁধে টুক করে ফেলে দিচ্ছে বাঁশের ডালাটিতে। একটা-একটা করে জমছে বিড়ি। পঁচিশটা জমলে একগাঠা। বাজারে একগাঠা বিড়ির দাম পাঁচ টাকা।

হোয়াংদা, সিংঘাগরা কিংবা হাতিনাদা গ্রামের দিকে কোনো বৃদ্ধকে জমিতে হাল দিতে দেখলে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'হ্যাঁ খুড়া, তুমি যে একাই হাল দি-ছ? বউটা কী করছে?'

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ হেসে ফেলবে। নারী কি ক্ষেতে হাল চালাবে? হাল চালানো পুরুষের কাজ, বপন করা নারীর। বলবে, 'বউটা ঘরেই আছে ব। রাঁধাবাড়া করছে আর গটা দিন বিড়ি মেরাছে।'

বিড়ি বাঁধার কাজকে বলা হয় বিড়ি 'মেরানো'। কুমার, বাউরি, মাহাত, মাহালী, দাসরা কৃষিকর্ম নিয়ে থাকলেও বিড়ি বাঁধাও চালিয়ে যায়। শূন্য পুঁজির এই কুটির-শিল্পটিকে নানান কারণে গ্রামের এইসব নিম্নবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক বান্ধব বলা চলে। এই কাজে নিজস্ব পুঁজি যেমন লাগে না, তেমনি এর বাজার-দর বারোমাস তিরিশকাল একমুখী—ওঠে কিন্তু নামে না, ব্যবসা মার খায় না, মদ-গাঁজার মতো বিড়ির বাজারে মন্দাও দেখা দেয় না, মনিবের ঘরে গিয়ে গলায় গামছা নিয়ে করজোড়ে একসিকি সুদে 'লোঙ'ও নিতে হয় না। এবং নিজের উৎপাদিত মাল বিক্রি করতে বাজারে লে-লে করে ঘোরারও প্রয়োজন নেই।

স্থানীয় বিড়ি মালিকদের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা সাইকেল নিয়ে দিনভর টো-টো করছে। সুতা থেকে শুরু করে কোম্পানির ছাপওলা লেবেল সবই তারা কারিগরের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। সাংসারিক কাজে ফুরসৎ পেলে মাঁঞা-মরদ বিড়ি মেরাতে থাকে। দিনের দিন মাল ডেলিভারি দিয়ে 'বানি' বা পারিশ্রমিক নগদা-নগদি নেয়। বাকি-বকেয়ার সিন নেই। বিড়ির বাজার রমরম করে চলতে থাকে। বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলায় এর বাজার বারোমাস চাঙ্গা। তার কারণে, এখানে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেশি, চাষীরা তাদের একফসলী জমিতে ধান ফলিয়ে দিব্যি তাস খেলে, বিড়ি টানে। হাতে কাজ না থাকলে এইসব মানুষ অনন্ত অবসর কাটাতে মদ্যপান, ধূমপানে মেতে থাকে।

এই অঞ্চলের কৃষিভূমি রুখা-শুখা। আশুধান হয় না। বারোয়ারি সেচেরও ব্যবস্থা নেই। বছরে একবার আমন ধানটি ঠিকঠাক হয়, যদি না বর্ষা দাগা দেয়। কিন্তু একটা চাষ কষ্টেসৃষ্টে খামারে তুললেও তা দিয়ে কি বারোটা মাস চলতে পারে? আয়-উপায়ের ভিনু রাস্তা ভাবতেই হয়।

সিংঘাগরা-হোয়াংদা-র কথা বলা হলো বটে, যদিও এইসব গ্রামের মানুষ বিড়ি বাঁধে না বললেই চলে। পুনদাগ-আনন্দনগরের দিকে এমনি আরো কিছু গ্রাম আছে। রাহেড়দাগা, কুসুমটিকরি, খটঙ্গা কি-কি সব নাম বাবা! কৃষির পাশাপাশি তারা ছোটখাটো ব্যবসাপাতি করে, মুর্গা ফার্ম চালায়, এখানের মাল ওখানে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে। অতি নিকটবর্তী জয়পুর বাজারেও অনেকে কাজযোগ করে, কেউ কেউ ৪০৭, সাদাহাতি বা ডালাগাড়িতে 'ডাইভারি' করে। হাটে সবজিপাতি-চুনামাছ নিয়েও বসে।

জমি এই অঞ্চলে অঢেল কিন্তু বেশিটাই দড়কচে,

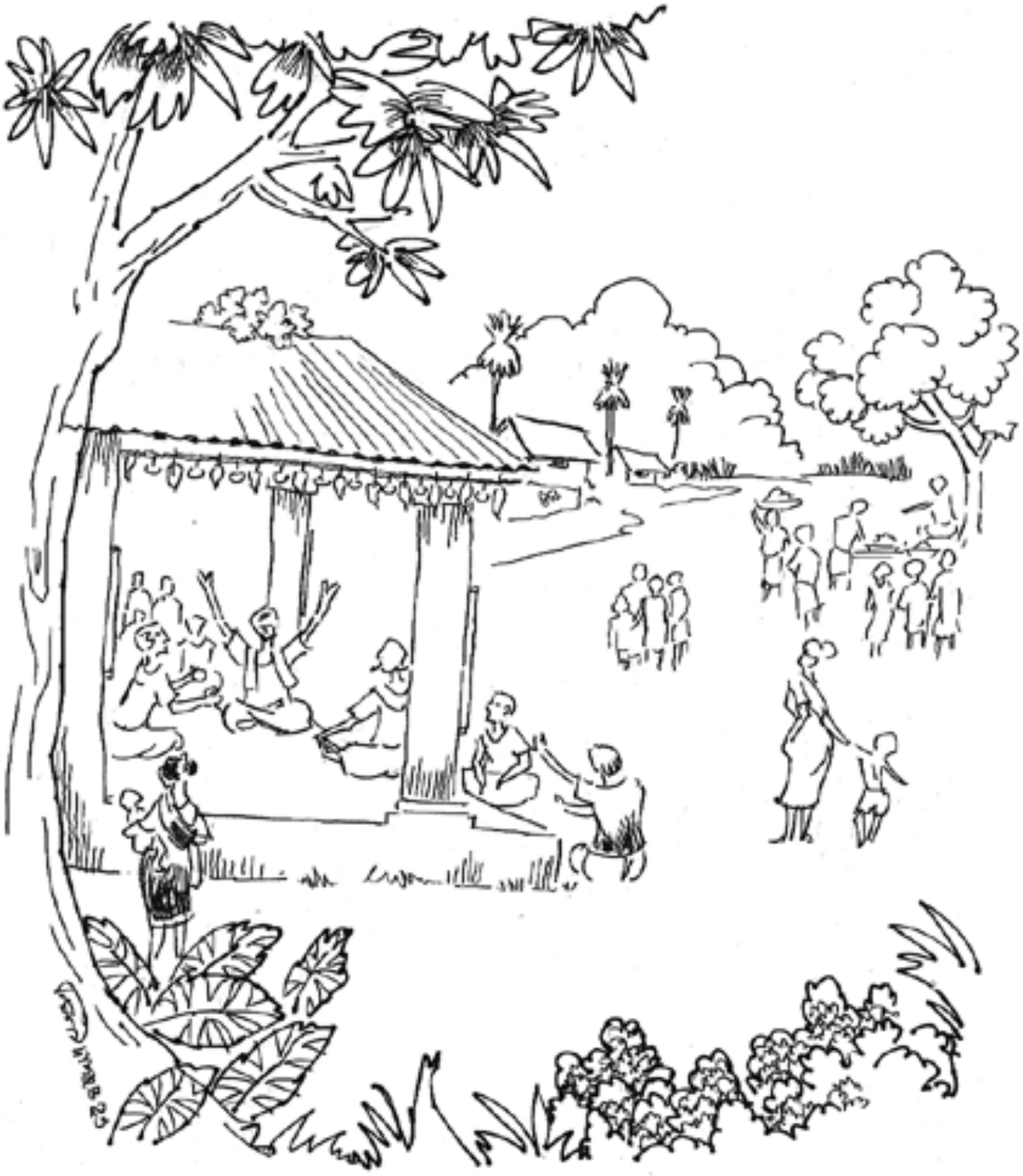

কাঁকুরে। নদী থাকলেও জল অপ্রতুল। কখনো বহুদূর অব্দি চোখে পড়ে বসতিহীন ডাঙা। ক্লান্ত অলস দুখী বাতাস দিনরাত একা-একাই হাঁপাতে হাঁপাতে বইছে। বিশ্রাম নিচ্ছে তালতলে, বড়তলে। কেউ দেখার নেই, দুটো কথা বিনিময় করারও কেউ নেই যে বলবে, ওগো উদাসী হাওয়া কোথায় চলেছ? বাবুরে, কেন তুই এত বিষণ্ণ?

হেক্টর জুড়ে ডকা-শিমুল-পলাশের নিবিড় জঙ্গল। মানুষ

ঢুকতে ভয় পায়—বরাত খারাপ থাকলে 'বনপার্টি'র কোপে পড়তে পারে। কোথাও ঢিপি, কোথাও টিলা। তবে যেখানেই জলের উৎস পাওয়া গেছে, জমি যেখানে উর্বর, সেখানেই দুটি-চারটি গরু-কাড়া-ছাগল নিয়ে গড়ে উঠেছে জনপদ।

প্রকৃতি ততোটা জীবনের অনুকূলে নয় বলে এখানে ভূখণ্ডব্যাপী আশ্চর্য এক কাব্যিক নীরবতা বিরাজ করে। প্রত্যূষের সূর্যোদয় মনোরম, গোধূলিবেলার সূর্যাস্ত অভিরাম, নিশীথে কিশোরীর লুলুক-পরা মুখের মতো টলটলে রুপোলি চাঁদও কি মনোমুগ্ধকর, অরণ্যও তেমনি শিখণ্ডী-সুন্দর! কিন্তু প্রাণের উচ্ছলতা কই? সবকিছুই কেমন ঘূর্ণিতে বসা হাঁসের মতো নীরব ও সংযতবাক। করুণ সুরে বাজছে এস্রাজ।

এই নীরবতা এখানকার জীবনকেও কতকাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা বাঁশের ঢাউস ছাতার মতো নীল আকাশের নিচে মাথা তুলে কখনো দাঁড়ায়নি, সূর্যের দিকে মুখ করে শোকোত্তীর্ণ হওয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। শোষণকে মেনে নিয়েছে, আধিপত্যকেও মেনে নিয়েছে। রাজনীতি এখানে তরোয়ালের চেয়েও ধারালো। মানুষ এখানে গরিব। গরিব বলে গরিবের পার্টিকেই বেশি ভয় তাদের। জঙ্গল-নদী আর টাঁড়ক্ষেত নিয়ে নির্বাসিত সর্ব অর্থে খণ্ডিত এই মানুষগুলির দারিদ্র্যই শোকের ভাষা হয়ে উঠেছে। উন্নয়নবিমুখ রাজনীতি হয়ে উঠেছে জীবনের অনন্ত নৈঃশব্দ্যের প্রহরী।

অথচ সিংঘাগরা-র গ্রামপ্রধানটি উন্নয়নের বুকনি দিয়ে গ্রামবাসীদের মাতিয়ে রাখে। কমরেট চুনুলাল মাহাত। কমরেট! বাপরে!

'শালা মস্ত চোর-চাটিবাজ। গাঁয়ের মানুষগুলাকে ভাঁইড়ে খাছে। মনে নাই—গেল খরার সময় ত্রাণের টাকাগুলা সোব ঘর ঢুকাল? এখন দালান ঠুঁকেছে, ঘরে জড়া-জড়া রাজদূত।' প্রধানকে নিয়ে এমন মন্তব্যও হর-হামেশা শোনা যায়। তারা জেনে গেছে খরা, দুর্যোগ, আকাল, মহামারী দেখা দিলে পার্টির ন্যাতাগুলাই লাভবান হয়।

৮৩ সালের খরায় গ্রামবাসীরা তাদের প্রাপ্য সরকারি সাহায্যের কেউ সামান্য পেয়েছে, কেউ কিছুই পায়নি। চুনুলাল কিন্তু বিন্দাস আছে। রাজনীতির লাইনে কামাই করে আজ সে বহু টাকার মালিক। এখন কমরেড সেজে তুলার পারা লরম-লরম কত কথা যে বলে! মুখে ভুড়ভুড়ি কেটে যায়।

'তরা মনে রাখবিস—লালপার্টি যেটা বলবেক সেটা করবেকেই।' তালতলে তাড়ি খেতে খেতে চুনুলাল বলে। 'যদি বলে, রাস্তা। ত রাস্তা আজ হলেও করবেক, কাল হলেও করবেক, পাঁচ-সাত-দশ-বিশ বছর বাদে হলেও করবেক। লেকিন করবেক।'

'হুঁ, আমাদের উমরটা ত রাস্তার অভাবে জলে-কাদায় আর ক্ষেতের আইল ধরে কাটল। ইবার লাতিপুতিরা পাকা সড়প দেখবেক।' গদাধর মাহাতর বক্তব্যে শ্লেষ ফুটে ওঠে।

'হামার বউ বলল চুনা নকি দুধির বউটাকে আঁকড়ায় ধরেছিল। ঘরে উয়ার

'সেটাই-বা কম কী? ডেরি হলেও কাজটা ত হবেক? ইংলিশে একটা কথা আছে, শুনে লে মথন—ইট ইজ ব্যাটার দ্যান হোয়াটিং টু ডু।'

'ইংলিশ বুঝে ত হামরা গটাই ফাটাব।' মথন বলে, 'বাংলায় বলে দাও হোয়াটিং টু ডু-টা কী।'

'তার মানে বলা হছে—কাজ করাটাই আসল। মানুষের কল্যাণে কাজ করে যা আপনেই উন্নয়ন হবেক।' কাঁধের গামছাটি মুখের ওপরে রগড়ে ঘাম মুছে গদাধরকেও বলে, 'উন্নয়নটা এমন কিছু ব্যাপার লয় রে, গদা। সরকার আজ বললে কালেই দশ-বিশটা উন্নয়ন করে দিতে পারে। রাস্তাঘাট-হাসপাতাল-ললকূপ ইগুলা দুটা-পাঁচটা এথা-অথা করে দিলেই কি হঁয়ে গেল উন্নয়ন? উন্নয়ন মানে হৈল—উন-নয়ন। উপর দিগে চৈখ-নামো দিগে লয়।'

'গাঁয়ে আজ তক্ক বিজলি বাতিও ত ঢুকল নাই প্রধান?' তাড়ির গেলাস হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে খকন সহিস।

‘ধূর! বিজলিবাতি! বিজলির আলোর ল্যা বেশি জোরালো শিক্ষার আলো। উটাই বেশি জরুরি। মানিস কি নাই?’ প্রতিপক্ষকে এককথায় চুপ করিয়ে দেয় চুনুলাল। ‘সত্যিকারের উন্নয়নটা করতে হবেক। কৃষিপ্রধান দেশে চাষবাসের উন্নয়ন, খরার দেশে জলের উন্নয়ন, সারের উন্নয়ন, বিচের উন্নয়ন। এই ত ফুরাল। ইটা কী এমন বড় ব্যাপার?’

‘ঠিক ঠিক।’ মনে রাগ পুষে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে গদাধর। তাড়ির নেশায় হাসতে হাসতে না বলে পারেও না, ‘তবে তুমার উন্নয়নটা ভালোই হৈল, চুনুদ্দা?’

‘তরা আমার আর কী উন্নয়ন দেখলি রে বাপ?’

‘ক্যানে? এই মনে কর ঘরে তুমার ডবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে’—

ডবল ইঞ্জিন! হেসে ফেলে সকলে। বউকে সে গেল বছর ঢুকিয়েছে আইসিডিএসে। সামান্য গ্রামপ্রধান হয়ে এই ক-বছরে কতকিছু বাগিয়ে নিল! শুধু কি রাজদূত? এই তরা যেমন গটা পরিবারটা কত মেহনত করে পুয়ালের বিঁড়া বনাছিস, সেই বিঁড়া হালা করে হাটে নিয়ে যাছিস, বিকে আসছিস। শ-দুশ টাকা আসছে কি নাই? তেমনি কেউ বুট-বড়ধনা-আলতি চাষ করেও পেট চলাছে। আর এই তাড়িওলা মনহৈরা? ছাপরার ল্যা পরিবারকে নিয়ে আইসে বছর-বছর তাড়িই বিকছে। ঝাল-ঝোল-চটনি আর গাঁজা-কৈলকা সব রকম নিয়েই ত সমাজ? সমাজ মানে কী? সমাজ মানে রাধু মোদকের দশকর্ম ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে পূজাপাসার সামানও আছে, আর মরা-হারা ঘরের শ্রাদ্ধ-শান্তির জিনিসও আছে।’

‘মানতে হবেক তুমি শিল্পী মানুষ। বহুত গেঁয়ান তুমার।’ খকন মন্তব্য করে। ‘কী করে হৈল, বলো ন?’

‘গেঁয়ান? হামার এত গেঁয়ান কী করে হৈল?’ চুনুলাল বলে, ‘পার্টি করতে করতেই দমে গেঁয়ান হঁয়ে গেছে। তার হতেই পার্টি হামরারাকে বলে, কমরেট, ঘরে বসে থাকলে চলবেক নাই। তুমরারাকে মানুইষের কাছকে

মরদটা ছিল, তাও। কত বদমাইশ! শালার মু-টা দেখলে অকাই আসে।’

তিন-তিনটা টাটা সুমো সরকারি আপিসে বন্দোবস্তে দিয়া আছে। সিংঘাগরার এখানে-সেখানে পুকুর ডাকে নিয়ে বর্ষায় ডিম ছেড়ে ধীবরদের সঙ্গে ভাগে মাছচাষ করছে। অথচ এই কিছুদিন আগেও লোকটা বিড়ি মাইঙে খেত। জয়পুর বাজারে চা-পোকোড়ি বাকিতে খেয়ে পয়সা মেটাতো না।

ডবল ইঞ্জিনের কথা শুনে প্রধান নিজেও হাসে। আর নিখুঁত শিল্পীর মতো কি সুন্দর কথা ঘুরিয়ে দেয়! বলে, ‘কী করবি রে ভাই! উপরবালা যাখে যেটা দিছে স্যাটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিহা করে কেউ ব্যাটার বাপ হছে, কেউ বিটির বাপ হছে। মাটি কাটতে যাঁইয়ে কেউ ঘড়াভর্তি মোহর পায়, আর কেউ তেঁতৈলা খরিশের কামড়ও খায়। যার ভাগ্য যেমন। হাঁতের পাঁচটা আঙুল সমান হয়?’

সহজ প্রশ্ন পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে উত্তর দেয়, ‘নাই হয়!’

যাতে হবেক। তবেই অঞ্চলের মানুষের সোমৈস্যা জানা যাবেক। আর যেখিনেই সোমৈস্যা, যেখিনেই আকাল, অধর্ম, চুরি আর মাঁঞা মানুষকে নিয়ে লুচকা-লুচকি, বুঝে লিবিস সেখিনেই যত গেঁয়ান।’

মহান এই রাজনৈতিক দর্শন! এই দর্শনের প্রেরণায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে স্যান্ডো গেঞ্জি আর ৯৯৯ নম্বর লুঙ্গি পরা কমরেড। মাথায় পুরীর গামছাটিকে পাগ দিয়ে গোটা এলাকা চষে বেড়ায়। তার ‘ঘর ঘর মাসী, ঘর ঘর পিসি’। বউদের হেঁশেলে ঢুকে রাঁধাবাড়ার খবর নেয়। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কোলে বসিয়ে আদর করে। জামতলে-কুলতলে পার্টির মিটিং করে, কাজগপত্রে সই-সাবুদ করে এবং তার শিক্ষার পরিচয় দিতে মাঝেমধ্যে ‘হোয়াটিং’ ইংরেজিও বলে থাকে।

‘আরেকটা উন্নয়নও আছে।’ পূর্বসূত্র ধরে চুনুলাল জানায়, ‘পুরুইলা হছে বিঁড়িভূম। এই জেলায় হরেক

গাঁয়ে ছ্যেলাবুঢ়া বাপব্যাটা সবাই বিঁড়ি খায়। পানদকানগুলায় বিঁড়ির দমে বিক্রি। তার হতেই পুরুইলাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিঁড়ি কারিকররা যাতে ল্যায্য মজোরি পায়, সেটাও হামরা চিন্তাভাবনা করছি। পুরুইলা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪-পরগনার বিড়ি শ্রমিকদের সমর্থনে একটা 'ব্রিগেড চল' ডাক দিলেই হঁয়ে যাবেক। কে বিরোধিতা করবেক? বড় মরদ!'

ঘটনা হলো, বিরোী পক্ষ বলে তো কিছু নেই। যে-সরকারের সামনে শক্তিশালী বিরোধী দল নেই, সে-সরকার কালক্রমে স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। নেতা-মন্ত্রী-কর্মীরা অর্থ-কেলেঙ্কারির থেকে নারী-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে বেশি। সর্বহারাদেরকে পুঁজি করে ঝাড়েপাতে বিস্তার লাভ করেছে দলীয় ক্ষমতা, যা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।

গ্রামবাসীদের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। সেই ক্ষোভ থেকে জন্ম নিচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাহীন সশস্ত্র দলগুলি। তারা অভাবগ্রস্ত নিঃসহায় গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াতে চাইছে, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। দমন করতে চাইছে পার্টিকর্মীদের যাবতীয় অনাচার, অত্যাচার ও বধ্যভূমিতে নিজস্ব সৌধ নির্মাণের অসৎ উদ্যোগকে। তারা তো দেখছে যাদের শক্তিতে এই পার্টির উত্থান, সেই মানুষগুলিকেই পার্টি শোষণ করে বেশি, তাদের কাতর আবেদনকে গ্রাহ্যই করে না। বিরুদ্ধাচরণ করলে হুমকি দেখায়। প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করে ওরা জনসভায় বাকস্বাধীনতার বাণী শোনায়।

এখন পাল্টা হুমকি ফুটে উঠছে গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে। লাল আখরে। রাতের অন্ধকারে পোস্টার সাঁটছে মাওবাদীরা। আড়ষা-বলরামপুর-অযোধ্যা পাহাড়ে তারা অনেকটাই সক্রিয়। জেলার গ্রামবাসীদের কাছে তারা 'বনপার্টি' নামেও পরিচিত। শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র তাদের চোখে ভেসে ওঠে একে-৪৭ বন্দুকধারী উগ্রপন্থী। সাধারণ মানুষের মনেও ত্রাসের সঞ্চার হয়।

'নাহ, তদের সঙে মিছামিছি গফ্‌ফ করলে চলবেক নাই। পুরুইলা যাতে হবেক। জেলা পরিষদে মিটিন্ আছে।' বলতে না বলতেই কোঁচড়ে পাকিয়ে রাখা ঘামে ভিজা নোট বের করে সে। তাড়ির পয়সা মিটিয়ে গামছা ঘুরাতে ঘুরাতে ঘরমুখো হয়। ধুলোভরা পথের দুপাশে বহুদূর বিস্তৃত আকন্দ ঝাড়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যায় চুনুলাল।

টাঁকমাথা প্রধানের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে গদাধর খকনকে বলে ফেলে, 'ইয়ার হতে গাঁয়ের ক-ন উন্নতিয়েই হছে না। দেখে লিবিস খকনা—কেউ না মারলেও ইয়াকে হামিই মারব!'

'তোকে নাই মারতে হবেক। গাঁয়ের বউগুলায় ইয়াকে ঝাঁটা মারবেক। শালার বহুত কীর্তি।'

'কী রকম?'

'বউমানুষ দেখলেই দুধে হাত দিতে খুজে।'

দুই

দুধিরাম সহিস আজও ভুলতে পারে না ১৯৮৩-র সেই ভয়াবহ খরা! গদাধর মাহাত, রাধু হাড়ি, মথন ধীবর, ধবল কুমার, ক্ষেপু কুমার এমনি বহু গ্রামবাসী আছে, যাদের পরিবারগুলি সে-বছর সরকারের ঘর থেকে কোনো সাহায্য পায়নি। সাহায্য পায়নি দুধিরামও। আকালে পড়ে সামান্য চিড়ামুড়ি আর মাড়জল-শাকপাত সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটে গরিব মানুষগুলির। ঘরে ঘরে গবাদি পশুরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদীতে শুধুই বালি, বাঁধ-পুকুর শুকনো, ক্ষেতে-মাঠে তৃণাদি নেই, নিষ্পত্র জঙ্গলে ধূ-ধূ বইছে উষ্ণ বাতাস, মিহি ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে পথের দুপাশাড়ি বাবলা-পুটুসের ঝাড়। এই ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে সিংঘাগরা ছাড়াও এই অঞ্চলের মানুষ তখন ঘরবাড়ি ফেলে পালাচ্ছে। কেউ সপরিবার শহরের উদ্দেশে রওনা দেয়, কুলি-মজুরের কাজ খুঁজতে। অনেকে এসে পড়ে কাঁসাই নদীর অববাহিকা বরাবর গড়ে ওঠা চিমনি ভাটাগুলোতে। রেজা-খাদিয়ার কাজ পেতে।

দুটি নাবালক শিশুকে নিয়ে বিপদে পড়ে যায় দুধিরাম। কিছুদিনের জন্য সিংঘাগরা ছেড়ে সে শ্বশুরঘরে চলে আসে। জয়পুরের ভাড্ডি গ্রামে। এখানে এসে শ্বশুরঘরের প্রতিবেশী কুমারদের অনেককে বিড়ি বানাতে দেখে তার মাথায় প্রথম বিঁড়ি বাঁধার ভাবনা আসে। কাজটি শিখেও নেয় সে, বউকেও শেখায়। তারপর থেকে এখনও তারা 'বানি'তে কাজ করে চলেছে। বিড়ি বাঁধছে তার আট-দশ বছরের দুই

নাবালিকা কন্যাও। হাজার দু-হাজার বিড়ি বাণ্ডিল বেঁধে জয়পুরে নির্দিষ্ট দোকানে থলিতে করে দিয়ে আসে। আবার ওই থলিতেই তামুক, পাতা ইত্যাদি কাঁচামালটা নিয়ে ঘরে ফেরে। রাঁধা-খাওয়ার সময়টুকু বাদে বিড়ি বাঁধতেই প্রহর কেটে যায় এই চারটি প্রাণীর।

আজ অবশ্য সকাল থেকে একপণ বিড়িও তার ডালায় জমেনি। গরু-খেদা লাঠি হাতে বুড়ো মুসলবান পাইকার এসেছে তার খড়টা কিনতে। দুধিরাম খড়ের গাদার মাথায় উঠে উঠোনে সর্-সর্ আঁটি ছুঁড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারও গুনে যাচ্ছে, আর তার ব্যাটা আঁটি তুলে গরুর গাড়িতে থোক করে সাজিয়ে রাখছে। গনা-গাঁথা যখন শেষ, তখন রাস্তার ধারে খড়ের গাড়ি দেখে, দুধিরামের ঘরে ঢোকে চুনুলাল। লেনেওলাকে বলে, 'মালটা কী দরে লিলে, চাচা?'

চাচা জবাব দেওয়ার আগে দুধিরাম বলে, 'পুয়ালে আর দামেই পাওয়াছে নাই, পর্ধান।'

'কী করে পাওয়াবেক? হরেক গাঁয়ে চাষীর খামারে এখন দমে পুয়াল! লে-লে করছে কিন্তুক লিবার লোক নাই। তার হতে চাষীরা উচিত দর পাছে নাই।' প্রধান জানায়। 'পঞ্চাশ পণ পুয়াল বিকলে আড়াইশ টাকাও ঘর ঢুকছে নাই। চাষীর পড়তা হবেক কিসে, কই বুঝা দেখি?'

তার যুক্তি ভুল নয়। বাজারে দিনকে-দিন খড়ের দামটা পড়ে যাচ্ছে। খড়ের চাহিদা নেই, উপযোগিতা কমে গেছে। গ্রামগঞ্জে খড়ের চালা আর দেখতে পাওয়া যায় না। গোখাদ্যে খড়ের ব্যবহার নেই। দুধের কথা চিন্তা করে গাঁয়ের মানুষ গাইগরুও পুষছে না—দুধ বিক্রির কাজটা এখন বড় করে শহরের বাবুরা করে। তারা কেউ গোপ নয়। মুসলমান, ব্রাহ্মণ, মাড়োয়ারি কিংবা বিহারী। একশ-দেড়শ জার্সি গরু নিয়ে ডেয়ারি ফার্ম খুলে বসেছে। আধুনিক সমাজ এবং পুঁজির কাছে হার মেনে গ্রামের গোয়ালারা তাদের বৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে ইঁট ভাটায়-তাটায় মজুরের কাজ করছে। চাষের কাজে লাঙলের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার বাড়ছে বলেও গোয়ালঘরে বলদের দেখা নেই। গ্রামবাসীরা গোয়ালঘরও আর বানাচ্ছে না। তাহলে চাষের খড়টা কী কাজে লাগবে? কখনো কখনো শহর থেকে বড় লরি গ্রামে এসে ঢোকে। পাইকারি দরে তারা খড় কিনে নিয়ে চলে যায়।

দুধিরাম যখন খড়ের পাইকারকে নিয়ে ব্যস্ত, চুনারাম তখন তার ঘরদিকে ঢুকে যায়। হাঁক দিয়ে বলে, 'কি বেসাতি রাঁধছিস গো, খাতেও বলছিস নাই?'

সে-সময় মেয়ে দুটিও ছিল না। সিনাতে, কাপড় কাচতে বাঁধকে গিয়েছিল। ফাঁকাঘরের এককোণে নুনিবালা কাপড় ছাড়ছিল, আবছা অন্ধকারে। চুনারাম সটান তার কাছে ঠেসে যেতেই, উলঙ্গ শরীর নিয়ে সে একবুক লজ্জায় পড়ে যায়। নিজেকে তৎক্ষণাৎ আড়াল করতে খাড়া করে রাখা দড়ির খাটটির ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়। নিচু গলায় বলে, 'এখন ক্যানে আসছিস গো। দেখছিস নাই ঘরে মরদটা আছে?'

'আছে ত কী হঁয়েছে? তোর লেলহা মরদের বউয়ের দিগে খেয়াল থাকে? তার হতেই ত আসি।' বলতে বলতে সেও খাটের ওপারে গিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে। নুনির হাতের শাড়িকে সে টেনে ফেলে দেয়। তারপর

'কী করছিস গো! য়েঃ, য়েঃ! মরদটা ঢুকবেক! ছাড়! ক্যানে অমন করে ঠেসছিস...'

সে যখন নুনিবালাকে নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে, তখনও দুধিরাম আসে না। ঘরের অন্ধকার থেকে চুনুলাল দূরবর্তী উঠোনের দিকে তাকায়। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে দুধিরাম। ঘর্মাক্ত গায়ে-মাথায় খড়কুটো। হাতে হিসেবের টাকাগুলি। দর নিয়ে সামান্য ভুল বুঝাবুঝি হওয়ায় চাচার সঙ্গে কথা বলে সে রফা করে নিচ্ছে।

আজ আনন্দনগরের হাট। গদাধর সাইকেল বের করে। মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। হাটে সে খড়ের দড়ি আর বিঁড়া বিক্রি করে।

নতুন ধান ঝাড়াঝাড়ি হয়ে গেলে খাবার মতো ধানটা সে রাখী করে। বাকিটা গোলায় বিক্রি করে দেয়। ঘরে ধান রাখার জায়গা তার নেই। ইঁদুরেও খাবে। গোলায় ধানের দর চাপা থাকলেও মণে দশ-বিশটাকা ক্ষতি করেও সে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

নবান্ন যেতে না যেতে, পৌষ মাস থেকে সে তার বউ-বিটিকে নিয়ে বিঁড়া পাকাতে লেগে যায়। এই কাজ

কয়েক মাস ধরে চলে। হাটবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে বউকে নিয়ে দিনমজুরের কাজও করে। তবে বিঁড়া থেকে মোটামুটি একটা উপার্জন হয়।

'বিঁড়া' হলো খড়ের চাকতি। জলে ভিজিয়ে রাখা খড়ের গুছি নিয়ে দু-তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা করে চাকতি বানানো হয়। মোটা মতো এই বিড়াগুলির ভালো চাহিদা আছে গ্রামীণ হাটে। নানান কাজে লাগে। ভাতের হাঁড়ি, ডাল-তরকারির খাপরি উনুন থেকে নামিয়ে মেঝেতে এই বিঁড়ার ওপরে রাখা হয়, তা না হলে উল্টে পড়ে যায়। গ্রামের মেয়ে-পুরুষরা মাথায় ঝুড়ি-হাঁড়ি বহন করার সময় বিঁড়ার ওপরে তা বসিয়ে রাখে। মিষ্টির দোকানগুলোতেও বিঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাদের জন্য একটু মোটা ও বড় বিঁড়া বানাতে হয়। রসের কড়াই, তেলের কড়াই বসাতে। শো-কেসে দইয়ের ভাঁড় বসাতেও ছোট ছোট বিঁড়া লাগে।

বিঁড়ার ভেতরে লম্বা দড়ি ঢুকিয়ে, বেঁধে, একেকটি গুচ্ছ সাইকেলে ঝুলিয়ে নেয় গদাধর। খড়ের দড়ির বোঝাটিও সে সাইকেলে সুবিধেমতো জায়গায় নেয়। তাকে বেরতে দেখে খকন কাছে আসে। বলে, 'আনন্দনগর?'

'হুঁ।'

কতকটা পথ সে গদাধরের সঙ্গে গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে যায়। তারপর বলে, 'গাঁয়ে এখন কত রকমের খোবোর। শুনলি ন নাই?'

খকন তার মুখ গদাধরের কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'হামার বউ বলল চুনা নকি দুধির বউটাকে আঁকড়ায় ধরেছিল। ঘরে উয়ার মরদটা ছিল, তাও। কত বদমাইশ! শালার মু-টা দেখলে অকাই আসে।' 'অকাই' মানে বমি।

তবে ভুল কিছু শোনেনি খকন। তার বউও ত সিনাতে বাঁধকেই যায়?

কেবল দুধিরামের বউয়ের কাছেই নয়, গ্রামের আরো কোনো কোনো ঘরে চুনুলালের এই উদ্দেশ্যে যাওয়া-আসা রয়েছে। আজ বলে নয়, অনেক দিন ধরে। এই দলে আছে রসরাজের বউ রমণী বাউরি, মথনের বউ জবাও আছে। এমনি গরমের দিনে খামারবাড়িতে চাঁদের আলোয় খাট পেতে কম বয়সী বালিকাদেরও সে কোলের ওপরে বসিয়ে 'রাতকহনি' শোনায়। আদর করে। যা পরে কোনো কোনো মেয়ে মাকে বলেও দেয়। ইদানিং স্নানের ঘাটে গ্রামপ্রধানের এমনি সব দুষ্কর্ম নিয়ে বউদের মধ্যে আলোচনা হওয়ায় ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে পড়ে। আলোচনার মুহূর্তে কোনো বউ বতর পেলে তাকে ঝাঁটা মারার পণও করেছে, কেউ কেউ আবার হেসেছে, মজা পেয়েছে। বলেছে, 'হ্যাঁ গো, চুনার বউটা কি উয়াকে ভখেই রাখে?' 'ভখে রাখা'র অর্থ অভুক্ত রাখা।

গদাধর বুঝতে পারে গ্রামের এই পরিবারগুলোর অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে এই লোকটি। তারা এতোটাই অপারক যে, হাতে একটা লাল নোট গুঁজে দিলেও শরীর বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশটাকায় আর কিছু না হলেও আড়াই সের চাল ত ঘরে আসে? যাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক সে বহাল রেখেছে, তাদের সংসারে গোপনে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করে, পঞ্চায়েত থেকেও পুকুর খনন, রাস্তা নির্মাণ বা বর্ষায় ভেঙে যাওয়া সড়কে মাটি-পাথর ফেলার কাজও তাদের দেয়। ঝড়ের দিনে কত হতভাগ্য পরিবারের টিনের চাল উড়ে যায়। চৈৎমাসের হুলপাথরে টালি-খাপরা ছ্যাচরা-ফুটা হয়ে যায়। এদের জন্য নতুন টিনের চালের ব্যবস্থা করে দেয় চুনুলাল। সময়ে সময়ে ত্রিপল ও শস্যবীজও তারা পায়। চাষ করার নামে শস্যবীজ পেলেও চাষ তারা করে না। বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে শাড়ি-শায়া কেনে। আর এইটুকু পেয়েই নিজেদেরকে ধন্য মনে করে। অথচ এই সাহায্যের তো তারা ন্যায্য দাবিদার?

সবকিছু জেনেবুঝেও প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না। পাছে তাদেরকে পার্টির অত্যাচারের মুখে পড়ে গ্রামছাড়া হতে হয়। যদি কৌশলে তাদের খড়ের গাদায় মশাল ছুঁড়ে দেয়? জঙ্গলে চরতে থাকা ছাগল-ভেড়িকে যদি বিষফল কিংবা পলিথিন খাইয়ে দেয়? মাছচাষ করা পুকুরের জলে যদি ফলিডল মিশিয়ে দেয়? অকারণ হুজ্জত লাগিয়ে ভেঙে দিয়ে যায় মাটির ঘরটুকু? তখন যে পথে বসে কাঁদতে হবে।

গ্রামবাসীরা জানে চুনুলাল পার্টির গুরুত্বপূর্ণ 'ক্যাঁটার'। ক্ষমতা তার বহুদূর বিস্তৃত। পুলিশের সঙ্গেও ভালো

সাঁট আছে। জয়পুর থানায় বড়বাবুর ঘরে গজগজায় ঢুকে যাওয়ার মতো হিম্মত তার আছে। এমন লোকের বাদীদার হলে তারা টিকতে পারবে?

'হবেক, হবেক। ইয়ার ব্যবস্থা হবেক।' গদাধর আশ্বস্ত করে খকনকে।

'হবেক?'

'একদম হবেক! মনে নাই উয়ার ঘরের দেয়ালে বনপার্টি কাগজ চিটাঞছিল? ফের কাগজ চিটাবেক।' শুধু এইটুকু বলে সাইকেলে উঠে পড়ে গদাধর। আনন্দনগরের পথ ধরে তালগাছের সারির পাশ দিয়ে চলে যায়। ফিরে আসে খকন।

আসতে আসতে খকনের মনে প্রশ্ন জাগে। গদাধর কী করে এতোটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে যে, বনপার্টি আবার গ্রামপ্রধানকে সতর্ক করতে তার দালানঘরে পোস্টার লাগাবে? তাহলে কি সে নিজেই উগ্রপন্থীদের কাজকর্মের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত? কেউ কেউ বলে কাউয়াহারা জঙ্গলেও নাকি মাওবাদীদের ডেরা গড়ে উঠেছে। গদাধর কি এই অঞ্চলে তাদের ইনফর্মার হয়ে কাজ করছে? সে নিজের মুখে একবার বলেছিল, বনপার্টি নাকি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামপ্রধানের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। কোন সূত্রে খবর পেয়ে সে এটা বলে, যদি না উগ্রপন্থীদের সঙ্গে তার কোনো সংশ্রবই না থাকে? ভাবতে গিয়ে গদাধর মাহাতর বনপার্টির হয়ে কাজ করার সম্ভবনাটিকে সে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারে না। এখন তার এটাও মনে হয়, প্রধানের ঘরে মাওবাদীর যে-পোস্টার পড়েছিল, সেই দুঃসাহসিক কাজটিও খোদ গদাধরই করেছিল।

'বনপার্টি'র নাম উল্লেখ করে তাতে এইটুকুই বলা হয়েছিল, 'প্রধান তুমি পার্টি ছাড়। না ছাড়লে হরিবোল মেলায় তুমার বিচার হবেক!'

সেদিন এই পোস্টার দিয়েও লাভের লাভ কিছু হয়নি। পুলিশ এসেছিল। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করেছিল, কে বা কারা এই পোস্টার আটকেছে। কেউ কিছু বলেনি। তখন দিন কয়েক প্রধানের ঘরদুয়ারে চব্বিশঘন্টা পুলিশ মোতায়েন থাকতো। একসময় তারা জয়পুর থানায় ফিরে চলে যায়। ততদিনে পোস্টারের ভাষা যাঁচ-পড়তাল করে তারা বুঝে গিয়েছিল, এটা মাওবাদীদের কাজ নয়। তাদের হুমকির ভাষা অত্যন্ত জোরালো হয়ে থাকে। তা কার্যকরী করে তুলতেও অধিক সময় নেয় না। তাছাড়া মাওবাদীরা কখনো তাদের টার্গেটকে হরিবোল মেলায় বসিয়ে বিচার করে না। তাদের বিচার হয় বন্দুকের নলে।

এটাও বুঝতে হবে, বনপার্টি তো বাইরে থেকে আসা উগ্রপন্থীদের নিয়ে গড়ে ওঠে না। তাদের কাজে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতাটা থাকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের। দলে বেশিটাই থাকে গ্রামের লোক, যারা এতদিন ধরে পুষে রাখা ক্ষোভ এবং বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে এই দলে যোগ দিয়ে এসে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ধরতে চেয়েছে।

খকনের মনে পড়ে অন্য একটি ঘটনাও। অতি সাম্প্রতিক। গদাধর তার নিজের দারিদ্র্য ও জ্বালা-যন্ত্রণার ছবি দুধিরামের পরিবারে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে একদিন খুব সহজ করে বলেছিল, যে-সমাজকে অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারছি না, তাকে পাল্টাতে হলে হাতে অস্ত্র ধরতেই হয়। বলেছিল, 'তুমার হঁয়ে অন্য কেউ লড়াই করবেক নাই, তুমাকেই করতে হবেক।'

নিঃসন্দেহে, ভেতরে-ভেতরে চমকে উঠেছিল এই নিরীহ ছাপোষা মানুষটি। বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে বলেছিল, 'না, বাবা! বিঁড়ি মেরাছি তার দরুন পঞ্চাশ-একশ বানি পাছি, দুহাত ক্ষেত আছে তিরিশ-বত্রিশ মণ ধান পাছি, আর এই গুচ্ছেক হাঁস-খুঁকড়ি আছে—ইয়াতেই যেমন চলছে চলুক। ইয়াতেই সুখে আছি।'

'কই, বুকে হাত দিয়ে বল ন কাকা সুখে আছো। পারবে বলতে?' গদাধর প্রতিপ্রশ্ন করে বসে।

দুধিরাম রাঁধাশালে তখন কুঁদরি ভাজতে থাকা তার বউয়ের দিকে তাকায়, যার গায়ের জীর্ণ শাড়িটি সেই মাঘ মাস থেকে আজও সে পাল্টে দিতে পারেনি। ছেঁড়া শাড়ি বউটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরে। সে-কথা নতুন করে ভাবতে গিয়ে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সাত-আট বছরের ব্যাটাবিটি দুটোর ভোখ লাগলে একটা পাঁউরুটি পর্যন্ত কিনে তাদের হাতে দিতে পারে না। বর্ষার দিনে চালার ফাঁক দিয়ে ঝরঝর জল পড়তে থাকে—ঘর

কাদা হয়ে যায়। সেই জল আটকাতে মেঝেতে হাঁড়ি-কলসি-বাটিঘটিও পাততে হয়। একটা ঘরে রাত হলে ছাগলগুলোকে নিয়ে খিল দিতে হয়। রাতের দিকে ছাগলও শুয়ে থাকে তাদের সঙ্গে—পেচ্ছাবে ভিজিয়ে দেয় কাঁথা-বিছনা। এর নাম সুখে থাকা?

কোলের ওপরে বাঁশের ডালার বিড়িগুলো নিয়ে গাঠা করতে গিয়ে গুনতিতে ভুল হয়ে যায় দুধিরামের। গদাধরের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারে নি।

তিন

সিংঘাগরা গ্রামে এখন পরব-পরব ভাব। শুরু হয়েছে সাতদিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। ধুলো আর ঝুল-ময়লা পরিষ্কার করে মন্দির ধোয়া-মোছা করা হয়েছে। মন্দির বলতে চুন-সুরকির চারটি থামের মাথায় একটি টিনের গোল ছত্তর। থানের ভেতরে-বাইরে গোবর দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে চুন-পচড়া করা হয়েছে। খড়ের দড়িতে আম্রপল্লব টাঙানো হয়েছে। সাজানো হয়েছে টিউব লাইট দিয়ে। সন্ধে হতে না হতে ধক-ধক শব্দ করে চলছে জয়পুর থেকে ভাড়া করে আনা 'কুণ্ডু লাইট কর্ণার'-এর সাড়ে তিন ঘড়ার জেনারেটার।

অতিরিক্ত গরমে মানুষের এখন হাঁসফাঁস অবস্থা। ধারে-পাশে কোনো গ্রামেও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে না। এই দুর্বিষহ তাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হরিনামই তাদের অন্তিম গতি। কেবল সিংঘাগরা-রাহেড়দাগা নয়, কুসুমটিকরি, হাতিনাদা বা হোয়াংদা নয়, তামাম রাঢ়বঙ্গের গ্রামবাসীরা মনে করে কীর্তনিয়াদের ডেকে ছুমছুমি বাজিয়ে কীর্তন না করালে আসমানে মেঘ ঘনীভূত হবে না, বৃষ্টির অভাবে চাষ মরে যাবে। শস্যহানির ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী খরা-আকাল দেখা দেবে। দোকানিরা করবে কালবাজারি। মানুষ মরবে উপোসে। গবাদির অবস্থা তথৈবচ।

বলা বাহুল্য, তাদের এই বিশ্বাস আজকের নয়। বহু প্রজন্ম ধরে এমন অবৈজ্ঞানিক ভাবনাকে তারা পুষ্টি করে চলেছে। যে অঞ্চল লক্ষণীয়ভাবে নির্বৃক্ষ, সেখানে গাছ লাগিয়ে সবুজের ব্যাপক সমাহার ঘটালে যে আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়, মাটির ক্ষয় রোধ করা যায় সে-ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, নিছক অশিক্ষাজনিত অজ্ঞতার কারণে।

এখন মনে হয় এমনি কিছু বারোয়ারি অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ একটু জাগুক, তাদের উদ্দীপনা আসুক, মনের নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকার তিরোভূত হোক। ভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সংকল্পবদ্ধ হোক তারা।

বহুদিন বাদে সেটাই ঘটছে। নিঃস্তব্ধতা কাটিয়ে ঝম-ঝম শব্দে বাজছে করতাল, আওয়াজ উঠছে খোলে। গ্রামবাসীদের কোলাহলে অষ্টপ্রহর মুখর মেলাচত্বর। দুটি-চারটি দোকান বসেছে। খাট পেতে এখানে-সেখানে ছোলা-মটর আর বাদাম ভাজা চুড়ো করে নিয়ে বসেছে দোকানি। টিউলাইটের আলো পাচ্ছে বলে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা লম্পো নিভিয়ে রেখেছে কেউ কেউ। এসেছে রঙে চোবানো আইসক্রিমের গাড়িও। ঢাকনায় ঢপ-ঢপ আওয়াজ করে মায়ের আঁচল ধরে থাকা শিশুদের ডাকছে।

গ্রামের ঘরগুলোতেও এখন খুশির আমেজ। সন্ধে সন্ধে খাওয়া সেরে হেঁশেল তুলে দিয়ে শাশুড়ি-বউরাও এসে গোল হয়ে বসেছে হরিনাম শুনতে। বউদের মাথায় চপচপে তেল, সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর, গালে পাউডারের থপথপানি, ফাটা পায়ে আলতা, ঘোমটা আটকে রয়েছে বেলকুঁড়ি দিয়ে সাজানো বলখোঁপায়। ওদিকে পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে হাতজোড় করে বসেছিল প্রধান। খানিক আগে উঠে গেল। যাবার সময় বাদাম ভাজা কিনতে কিনতে দোকানিকে সে বলল, 'বুঝলি হাঁদু, গ্যারামে যদি বৈশাগ মাসে কীৎতন না হয়, ত মনে হয় স্যাটা গ্যারামেই লয়।'

'ইটা তুমি বড় দামি কথা বললে চুনাদ্দা।'

'হামি সোব সময় দামী কথাই বলি রে বাছা—তরা দাম দিতেই খুজিস নাই। মানুষের মনে হরিভক্তি থাকছে নাই বলেই আজ গাঁয়ে জল হছে নাই। মেঘ উড়ে চলে আছে সিধা চ্যারাপঞ্জি।'

'চ্যারাপঞ্জি? হামরা ত বেণীমাধবের পঞ্জিই জানি। উটা আ-র কথায়?'

'তোদের ক্যালার এইটাই একটা ডাগর দোষ। হরেক কথায় পাল্টা কৈশ্চান করিস ক্যান? বল, জল হবেক কি হবেক নাই?'

'ইবারে হবেক। এই যে জলের আশায় কত খরচ-খরচা করে, চাঁদাভেজা তুলে সাতদিন ধরে হরিনামের আয়োজন করা হল—জল না হঁয়ে যাবেক নাই। জষ্টির শুরুতেই দেখবে জলে জলাক্কার হঁয়ে যাবেক সিংঘাগরার বাইদ-বহাল-কানালি।'

'দেখা যাক। হলে ত ভালোই। চাঁড়েই রুয়ারুয়িটা করা যাবেক।'

'মেলা ছাইড়ে চলে যাছো নকি, চুনুদ্দা?'

'হামি না গেলে ঘরের মাঁইঞাছ্যেলাগুলান আসতে পারছে নাই।'

'হুঁ, আসুক আসুক। ধুলোট বলে কথা।'

আজ ধুলোট। রাত পোহালেই কাল সকালে গ্রাম পরিভ্রমণ। সিংঘাগরা-র সবাই তাতে অংশ নেবে। গাইতে গাইতে যাবে, 'রাঙা গায়ে লাল ধূলা মাখাব রে/ধূলা মাখাব মাখাব মাখিব রে!' রাঢ়ের কৃষ্ণবর্ণ গ্রামবাসীরা সারা অঙ্গে লাল ধুলো মাখবে। আবির মেখে নাচন-কুদন করবে। শিশুরা রাস্তায় লুটোপুটি করে হরিলুটের বাতাসে কুড়াবে। আনন্দে মেতে উঠবে তারা।

বাতাসা এখনো ছোঁড়া হচ্ছে। ছোঁ মেরে তুলে আনার জন্য জায়গায় জায়গায় ভিড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে ছেঁড়া ও ঢলঢলে হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চারা। ভারি মজা এই হনুমুড়াদের। কীর্তনিয়ার পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া বাতাসাও তুলে এনে মুখে পুরবে, ঘরের মা-মাসী- কাকীদেরও দেবে হরির প্রসাদ। তারা লাভ করে ঠাকুরের অপার করুণা।

ধুলোট বলে আজ অনেকগুলি কীর্তনিয়ার দল এসেছে। একদল যেই বসছে, অমনি রসকলি আঁকা আরেকটি দল হরির থানে চক্কর কাটছে। নামোচ্চারণে বিরতি বা ছেদ ফেলা যাবে না। তাতে অভক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে, অমঙ্গল হয়।

হরিবোল চলছে বলে গ্রামে লোকচলাচল থেমে নেই। পরিবারগুলোতেও কেউ ঘুমিয়ে পড়তে চায় না। পুরো গ্রাম জাগন্ত। তবে অধিকাংশ ঘরে মানুষ নেই। মেলায় চলে এসেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষও সিংঘাগরায় এসেছে। এখনো অনেকে আসছে।

মেলাপ্রাঙ্গণে যখন আর লোক ধরার জায়গা নেই, ঠিক তখনই দূর থেকে আর্তনাদ ভেসে আসে। কিছু মানুষকে ছুটে পালিয়ে আসতে দেখা যায়। তারা চিৎকার করতে করতে আসে, 'পালাও! পালাও! গাঁয়ের ভিৎরে বনপার্টি ঢুকে গেছে!'

মেলার হইচইয়ের মধ্যে তাদের কথা অনেকে শুনতে পায়নি। তবে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে সেই পথে এগিয়ে যায়। কিছুটা যেতে না যেতেই তারা থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে দেখতে পায় প্রধানের দালানঘরটিকে ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে বনপার্টি। তাদের গায়ের সবুজ পোশাক কালচে দেখায়, মুখ ও মাথা ঢাকা রয়েছে কালো কাপড়ে, হাতে উঁচিয়ে রেখেছে বন্দুক। তারা বলে চলেছে, 'খোবড়দার তুমরা কেউ কাছকে ঠেসবে! সরে যাও। সাবধান করা হচ্ছে। আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দাও। কাছকে আইসো না কেউ...'

একই সঙ্গে কয়েকজন তার ঘরের কপাটে লাথি মারতে থাকে। ভেতর থেকে কারো কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। দরজাও খোলে না কেউ। ঘরের লোকজন মেলায় চলে গেছে। মাওবাদীরা দেয়াল টপকাতে থাকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে কেউ একজন ছুটে পালাচ্ছে। চুনুলালকে চিনতে ভুল হয় না মাওবাদীদের। তারাও তাকে অনুসরণ করে যায়। গুলি করার মুহূর্তে প্রধান ঢুকে পড়ে একটি খামার বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সেই ঘরটিকে ঘিরে ফেলে তারা।

ঘরের লোকজন তখন সবে হরিবোল মেলা থেকে ফিরেছে। কাপড়-চোপড় ছাড়বে। ঘরে-বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ খামারে-উঠোনে এত লোকজনের ছোটাছুটি দেখে তারা আঁতকে ওঠে ভয়ে। ডাকাত ভেবে চিৎকার জুড়ে দেয়। তাদের কালো কাপড়ে ঢাকা মুখ বা হাতের অস্ত্রও চোখে পড়েনি। যদিও চিৎকার করতে নিষেধ করা হয়। মাওবাদীরা তাদের বন্দুক দেখিয়ে আশ্বস্ত করে বলে, 'চুপ কর! আমরা ডাকাত লই। চুরি ডাকাতি করতে আসি নাই। কিন্তু তা হলেও তুমাদের ঘর-ভিৎরে ঢুকব। তুমরা বাহিরে যাও। তুমদের ক-ন ক্ষতি আমরা করব নাই।'

তারা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে বাইরে দাঁড়িয়েও টুঁ-শব্দটি করা চলবে না। বন্দুকধারীদের হুঁশিয়ারি অমান্য করলে তারা যে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে সে-কথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

মাওবাদীদের একটা দল ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকে খামারে, বাইরেও একদল বন্দুকধারী।

ঘরে তাকে খুঁজে না পেয়ে তারা খামার বাড়ির চারপাশ দেখতে থাকে। চাষার খড় গাদা করে সাজানো রয়েছে মাঝখানে। তাদের কি মনে হয় দুজন গাদার মাথায় উঠে পড়ে। তাতেও কোনো মানুষের খড়ের গাদার ভেতরে লুকিয়ে থাকা মালুম করতে পারে না। যদিও, এখন তারা নিশ্চিত যে, এই গাদার মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করা ছাড়া আর কোথাও গ্রামপ্রধান থাকতে পারে না। এই ধারণা দৃঢ় হতেই তারা লণ্ঠনের ঢাকনি খুলে কেরোসিন ঢেলে খড়ের গাদাটিতে চারপাশ থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই বিরাট পরিমাণ খড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় গৃহস্থের ক্রন্দন রোল ওঠে। আগুন গোলাকার হয়ে জ্বলতে না জ্বলতে একপাশ থেকে মাথা তুলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে চুনুলাল। মাথা তুলেও সে পালিয়ে যেতে সাহস পায় না। চতুর্দিক থেকে তাক করে থাকা বন্দুকগুলি দেখে সে কাঁপতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে করজোড়ে বলে, 'হামাকে মাইরো না। মাইরো না! আমার সংসারটাই শেষ...'

কাতর আবেদন জানিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করারও সময় পায় না চুনুলাল। যেদিক-সেদিক থেকে তাকে গুলিবিদ্ধ করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে খড়ের চিতা। ছড়িয়ে পড়ে চামড়া পোড়ার দুর্গন্ধ। মাওবাদীরা কয়েকটি হাতে লেখা কাগজ আশেপাশে ছুঁড়ে দেয়, যাতে লেখা 'পঞ্চায়েতের একনম্বর দুর্নীতিবাজ এবং নারী ও শিশু নিগ্রহকারীকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া হলো।'

বনপার্টি গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তল্লাট কাঁপিয়ে শ্লোগান দেয়, 'মাও-সে-তুঙ জিন্দাবাদ!'

ততক্ষণে নামসংকীর্তন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হরিমন্দিরে একটিও লোক নেই।

ভি ক্ট র ভৌ মি ক

জন্ম ১৯৬১ সাল। বাবা গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মা স্বপ্না ভৌমিক। পাসপোর্ট ও সরকারি নথি অনুযায়ী নাম অনুরূপ ভৌমিক। লেখেন ভিক্টর ভৌমিক নামে। তিন-চারটে সংবাদপত্র ও পত্রিকায় চাকরির পর ব্যাবসার নামে ভারতের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচিত্র জার্নির পর থিতু হয়েছেন গল্প-উপন্যাসে।
অসহনীয় অলস, দিবাস্বপ্নে বেশি সময় কাটে। ফলে, লেখেন কম। গোটা পনেরো অসমাপ্ত দীর্ঘ গদ্য নিয়ে অপেক্ষায় আছেন নিজের ঘুম ভাঙার। 'আত্মহত্যার অঞ্চল' দিবাস্বপ্নেই লেখা
আধ ডজন গল্পের সংকলন।

অঙ্কের দিদিমণি

শুরু বা শেষ বলে কিছু হয় না।

জীবনযাপন বা জীবনকথনেরও হয় না। তবু, নিজেদের সুবিধার্থে একটা বিন্দু ধরতে হয়। তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যেকোনো অন্য বিন্দুর সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকে, তবে তা খুঁজতে হয়। এই লেখা সুস্মিতাকে নিয়ে। ধরা যাক, সুস্মিতার প্রথম বিন্দু হরপ্রসাদ, তাই শুরুতেই হরপ্রসাদ। আর, ছোটোবেলায় অল্প পড়াশোনার দৌলতে হরপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, পৃথিবীর অধিকাংশ ভালো লেখা শুরু হয়, 'ওয়ানস আপন এ টাইম' দিয়ে। তাই... একদা হরপ্রসাদ নামে এক অতিশয় কর্মঠ ও সদাশয় ব্যক্তি দিনে চার বার রেললাইন পারাপার করতেন। শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম সব ঋতুতে। কেননা, টানা একশো আশি বিঘে উৎপাতহীন একঘেয়ে মসৃণ চাষের জমি আজকাল আর পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদের সময় যেত।

এবং, হরপ্রসাদের তা ছিল। জমি লাইনের ওপারে, বাড়ি লাইনের এপারে। জমি যেমন লম্বা-চওড়া, বাড়িও তেমন পেল্লায়। একদম সিগন্যালের গা ঘেঁষে। ভারী মেল ট্রেন কিংবা
অনিঃশেষ ওয়াগান গেলে দশ ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাড়িতে গুমগুম শব্দ হত, চুন-সুরকির ধুলো উড়ত। থরথর করত জানালা-দরজা। লাগোয়া আয়তকার পুকুরের জল নড়ত কলতলার ডেকচির মতো। ঘাটের সিঁড়ি থেকে ছুটে পালাত তেচোকা-খোরসলা। ট্রেন আসুক বা না-আসুক, মাঠভরতি শস্য-আকুল গাছপালায় অহরহ ঢেউ খেলত। হরপ্রসাদ এপার-ওপার হতেন চার বার। ভোরে গিয়ে বারোটায় ফেরা, তারপর একটায় গিয়ে ছ-টায়। এতেই জীবনের বেশিটা কেটে গেছে তাঁর। জমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে যথেষ্ট বড়োলোক হয়ে যাওয়ার পর মন বলল, এবার আত্মার জন্য কিছু করো। একটা শুভদিন দেখে নিরামিষ খেয়ে হরপ্রসাদ ডায়েরি লেখা শুরু করলেন। সবচেয়ে বড়ো পিপুল গাছটার নীচে বসে। যার শিকড় ছড়িয়ে গেছে রেললাইনের কাঠের স্লিপার অবধি। মাঝে মাঝে খেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুনিষদের দেখেন আর ফাঁকফোকরে লেখেন। লেখা শুরু করে তিনি বুঝতে পারলেন দুটি সরল সত্য। এক, মানুষ নিয়ে লেখার কিছু নেই, তারচেয়ে অনেক জ্যান্ত জীবন ব্যস্ত ও ন্যস্ত রয়েছে পোকামাকড় ও পশুপাখিতে। দুই, এক জায়গায় বসে লিখলে হবে না, লিখতে হবে ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে। ভ্রমণ মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করে, নিসর্গের পরিবর্তন মানুষকে তাজা রাখে।

হিংসায় অনীহা থাকায় পশু বাদ দিয়ে হরপ্রসাদ মনোনিবেশ করলেন পোকা ও পাখিতে। পাখির গায়ের উকুন, গুবরেপোকা, ধামসাপোকা, গন্ধিপোকা, উচ্চিংড়ে, কুমরে থেকে জোনাকি অবধি শ দেড়েক পোকা বিষয়ে তিনি লিখে ফেললেন অনধিক দেড়শো শব্দ করে। অল্প দেখা আর কিছু শোনায় অর্জিত প্রবল আত্মবিশ্বাসে সৃষ্ট লেখাগুলো বহু ভুলে ভরা থাকলেও আন্তরিকতায় বেশ পাঠযোগ্য হয়ে উঠল।

বোলতা, জোঁক, শুঁয়োপোকা, কেঁচো, কেন্নো, বিছে, পিঁপড়ে, মথ এবং আরশোলাসহ আরও অনেকে স্থান পেল তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলিতে। জ্ঞানের গভীরতা ও বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণের দিকে নজর না থাকলেও পরম ভালোবাসায় লিখে চললেন তিনি। বছরের পর বছর। পোকা ফুরিয়ে এলে ধরলেন পাখি। ডায়েরির পর ডায়েরি ফুরিয়ে গেল। মাঝে মাঝে এল খাতা, হালখাতা, জাবেদা খাতা। অক্ষরের মধ্যে তখন তাঁর বসবাস। অক্ষরবৃত্ত ঘিরে ফেলেছে তাঁর জীবন। অপটু রেখায় প্রাণীদের ড্রয়িংও করলেন। এ জন্য বৈষয়িক ব্যবস্থাপনাকে অবশ্য বিঘ্নিত করলেন না। গোলা ভরে উঠত ফসলে আর অ্যালুমিনিয়ামের ট্রাঙ্ক ভরে উঠত লেখায়। ইতিমধ্যে বাড়ির চওড়া কার্নিশ থেকে উঁকি মারতে শুরু করেছে বট-অশ্বত্থের চারা। এর মাঝে একটা গাড়ি হল, কোথাও যাবার ছিল না, তবু আত্মীয়-পড়শিদের প্ররোচনায় কিনতে হল। দেখতে আদি রোলস রয়েসের মতো, দু-পাশে দুটো চাকা লাগানো ছিল কোমরের সোনার বিছের তুল্য সেক্স-সিম্বল হিসেবে। দূরের আত্মীয়রা যেত কাছের মন্দিরে পিকনিক করতে, আর, পাড়ার লোকের তা কাজে লাগাত রুগিদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সবচেয়ে জরুরি দিনেই গাড়িটা বিগড়ে গেল। স্ত্রী মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়। কিন্তু, লেখার নেশা আর জমির বিস্তীর্ণ ল্যান্ডস্কেপ হরপ্রসাদকে দুঃখ পেতে দিল না। লিখতে লিখতে তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন। মহৎ কিছু যে লিখলেন, তা নয়, তবু, তাঁর বিশ্বাস ছিল জীবনটা কাজের মতো কাজে কেটেছে। লেখা তো লোকের জন্য নয়, তাই তারা কীভাবে নেবে, তা জরুরি নয়। অগাবগা একটা জীবন না কাটিয়ে ছোটো ছোটো প্রাণের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া কম আনন্দের নয়। নিজের ধারণা অনুযায়ী হরপ্রসাদের ডায়েরির প্রথম বাক্যটা ছিল—"একদা আমার জমিতে অনেক প্রকার পোকামাকড় বসবাস করত।" এটা লিখে নিজের কানে খটকা লাগায় তিনি তাঁর সেই 'ওয়ানস আপন এ টাইম'-এর গেরো ছিঁড়ে ফেলেন। হরপ্রসাদের প্রতি সুবিচার করার জন্য দু-একটা উদাহরণ দেওয়া জরুরি। আফটার অল তিনি সুস্মিতার প্রথম বিন্দু, সুস্মিতার ঠাকুর্দা।

আরশোলা: পৃথিবীর প্রাচীনতম এই প্রাণীটির স্থায়িত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করলে মানুষও অমর হতে পারে। কিন্তু, মানুষ আরশোলার মতো সিরিয়াস নয়। নিজের

কাজের চেয়ে অন্যের কাজে বেশি মাথা গলায়। কাজ আর অকাজ, এই দুইয়ের সীমারেখায় মানুষ অকাজে দল পাকায়। মানুষের পছন্দ-অপছন্দ তীব্র। এটা মোটেই গুণ নয়। এতে আয়ু কমে। আরশোলার কাছে কোনো খাদ্যই অখাদ্য নয়। তুঁতে মেশানো আঠার গোলা থেকে হার্ডবোর্ড বইয়ের মলাট, এমনকী, ঘুমন্ত মানুষের নরম স্থানের ও সুযোগমতো অস্থানের সুস্বাদু মাংস তারা খেয়ে থাকে। এই বিচারহীনতা তাদের মধ্যে আসক্তি সঞ্চার করেনি। আসক্তি মনকে ক্ষুদ্র করে, জীবনকে ছোটো করে। এইসব হয়তো বুঝে বা না-বুঝে আরশোলা টিকে আছে আদি থেকে, অকৃত্রিমভাবে। তাদের দৃষ্টি নেই। শুঁড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ খোঁজে। তাদের গা তেলালো, পদ্ম পাতার মতো। বৃষ্টির জল, সকালের শিশির, বাচ্চাদের হিসি পিছলে যায়। তাদের মনে ছাপ ফেলে না। আরশোলাকুলের স্থায়িত্বের অপর বড়ো কারণ হল তাদের সৌন্দর্যচেতনা নেই। মানুষের আছে। সৌন্দর্যবোধ মানুষকে কুরে কুরে খায়, ভেতরে ভেতরে পুড়িয়ে দেয়। এতেও আয়ু কমে। ছোটোবেলায় একবার ঘুমের সময় আমার ডান চোখের পাতার একটু মাংস খেয়েছিল একটা আরশোলা। মা বলেছিলেন অন্তর্দৃষ্টি বাড়ছে। জানি না সেটা হয়েছে কি না।

পিঁপড়ে: একমাত্র ইহাদের দেখেই মনে হয়েছে মানুষ বুদ্ধিমান হলেও এতটা ভদ্রসভ্য নয়, সিনসিয়ার তো নয়ই। মানুষের বুদ্ধি সাধারণত দুর্বুদ্ধির খাতে বয়। পিঁপড়েরাও দল বেঁধে বাস করে, ঘরবাড়ি বানায়, সন্তানদের রক্ষা করে সংঘবদ্ধভাবে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো এতই সংসারী যে, আমরা যেমন গোরু পুষে দুধ খাই, এরা তেমন এক ধরনের ছোটো ছোটো পোকা পুষে তাদের থেকে মিষ্টি খাবার সংগ্রহ করে। গাছের পাতার ওপর পাখির বিষ্ঠার মতো একরকম সাদা ছিটে দেখা যায়। তা মানুষের মনে ভ্রম জাগানোর জন্য। তার নীচে থাকে পিঁপড়েদের ব্যক্তিগত মিষ্টি পোকার ফার্ম। কয়েক প্রকার পিঁপড়ে সুন্দর চাষাবাদ করে। কিন্তু মানুষের মতো নিজস্ব সম্পদ বাড়ায় না। সমষ্টির উন্নতি ভিন্ন চিন্তা নেই। তাদের নেই একক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এমনকী তাদের রানিও আয়েশি নয়, খেটে খেতে হয় তাকেও। খাবার সংগ্রহ করে পিঁপড়েরা যখন বাসার পানে যায়, পথিমধ্যে অন্য পিঁপড়ে শুঁয়ো নেড়ে খিদে জাহির করলে তারা দিয়ে দেয়। আমার জমিতে সচরাচর চার প্রকার পিঁপড়ে দেখা যায়—ডেয়ো, সুড়সুড়ে, কাঠপিঁপড়ে আর লাল পিঁপড়ে। আরও এক ধরনের বিচ্ছিরি গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম পিঁপড়ে আছে, যা কেবল বাড়িতেই দেখেছি। লাল পিঁপড়েরা রাগী আর হিংস্র। সুড়সুড়েরা নিরীহ এবং আধুনিক সময়ের দোষে আক্রান্ত, কারণ, তারা বিচ্ছিন্ন ও অন্যমনস্ক। অন্যরা মহাভারতের রণক্ষেত্রে রচিত ব্যূহ গড়ে চলাফেরা করে। কাঠপিঁপড়ে বিষাক্ত এবং শক্তিশালী। আমার ছেলেবেলার বন্ধু পটলকে জাম গাছের উঁচু ডাল থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পটল পারেনি। নীচে শুকনো খেজুর পাতা থাকায় সে রক্ষা পায়। মানুষের মায়েরা পিঁপড়েমিশ্রিত দুধ খাইয়ে বলে—'সাঁতার শিখবে'। সে আসলে নিজেদের ব্যর্থতার ওপরে পুলটিস। পিঁপড়ে খাওয়া বহু বাচ্চাকে আমি ডুবে যেতে দেখেছি।

এরকম আবোলতাবোল লেখালেখির মধ্যে যুক্তিপরম্পরা ছিল না। জাম গাছতলায় খেজুর পাতা কেন? অথবা, সৌন্দর্যচেতনা না-হয় আরশোলার নেই, তাহলে জলঢোঁড়া সাপের কি আছে, নয়তো তারা স্বল্পজীবী কেন?—এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বা সূত্র তাঁর লেখায় ছিল না।

পোকামাকড়ের বৃত্তান্ত অনেকটা হওয়ার পর সাধের মুনিষদের কিছু জমি দান করে হরপ্রসাদ যাত্রা করলেন পক্ষীকুলের দিকে। শুরুটা নীরপতত্রী, অর্থাৎ, জলচারীদের নিয়ে। পানকৌড়ি, গাংচিল বা গাংতিতি তাঁর প্রিয় পাখি। তারপর শাখারি, মুনিয়া, বসন্তবউরি, ভরত, নরুণচেরা, খঞ্জন, দোয়েল, চিল, বাজ, টুনটুনি, শকুন, শালিখ, বক প্রমুখ দেখা-পাখির সঙ্গে কাজলভ্রমরা, হামিংবার্ড এবং দুর্গাটুনটুনির মতো শোনা-পাখিতে ভরে ওঠে তাঁর লেখকজীবনের সেকেন্ড হাফ। ভুঁড়োচিল, মাছরাঙা, দাঁড়কাক, ম্যাকাও, কাকাতুয়া, ফিঙে, বগা-বগি, আর তিতিরদের মন বুঝতে গিয়ে মা-হারা একমাত্র ছেলেটার দিকে তাকানো হল না। এই পর্বে হরপ্রসাদের কল্পনা পুরুষ্ট হয় অনুশীলনের ফলে। তাই পাখি বিষয়ে ছোটো ছোটো গল্পও লেখেন তাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে। এর

মাঝে আঁকায় অভাবিত উন্নতি হয়, উড়ে যাওয়ার সময় কোনো কোনো পাখি নীচের সবুজের মাঝে সাদা পাতায় আত্মপ্রতিকৃতি দেখে চমকে ওঠে, তাদের ডানায় খিল লেগে যায়। বিশেষত, সিপাহি বুলবুল, হাঁড়িচাঁচা ও বাইল্যার (এ-দেশের বাবুই) ছবিগুলো অপূর্ব। এ থেকেই ফ্রন্ট ও ব্যাক কভার হওয়া উচিত। কিন্তু যে-বই অপ্রকাশিত, তার আবার প্রচ্ছদ!

পাখিদের বিষয়ে সব লেখা শেষ হতে হতে মোটামুটি পড়াশুনা করে বড়ো হয়ে যাওয়া নির্বান্ধব ছেলে দেবপ্রসাদের বিয়ে হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজনরাই ধরে-করে দিয়ে দিল। পাঁচ বছরের মাথায় একটা মেয়েও হয়ে গেল। ফুটফুটে মেয়ে। এত আনন্দ হরপ্রসাদ কখনো পাননি। নাতনি কোল থেকে নামতেই চায় না। খাওয়ানো, নাওয়ানো, খেলাধুলা, কথাবার্তা সব নাতনির সঙ্গে। দু-জনে যে যার ভাষায় কথা বলে। এভাবে সুস্মিতা যখন ছুটতে শিখে গেছে এমন এক দিনে হিমাংশু আসেন শহর থেকে। তাঁর হাতে পড়ে আমির শ্যালকের একটা ডায়েরি। উলটেপালটে পড়ে তিনি বলেন, "ছাইপাঁশ লিখে জীবনটা নষ্ট করলে ভায়া, এসব তো আগেও লেখা হয়ে গেছে।"

প্রথমে মুষড়ে পড়লেও, এ-পৃথিবীর নানা প্রান্তে কতরকম মানুষ একইরকমভাবে বেঁচে আছে, বেঁচে চলেছে—এই ভেবে হরপ্রসাদ কিছুটা সান্ত্বনা পান।

—"নতুন কিছুই তুমি জানাওনি", হিমাংশু দমেন না।

—তা হোক গে। আমি তো জানাতে চাইনি। জানতে চেয়েছি। কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে একলা বসে চাষের ফাঁকে আর সংসারের ফোকরে এইসব দেখলাম, জানলাম, এই-ই-বা কম কী! জানুক-না অন্যে, প্রত্যেককে নিজের আবিষ্কার নিজেকে করতে হয় হিমু।

জানা আসলে পুনর্বার জানা, বহুপ্রচলিত এই উক্তির প্রতিধ্বনি করে হিমাংশু বলেন, "ঝাড়া আসলে পুনর্বার ঝাড়া।" শালাকে ছোটো করতে চান তিনি। নিজের ব্যর্থ জীবনে অন্যকে ছোটো করায় খুশি খুঁজে পেতেন তিনি। কিন্তু ততদিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের সান্নিধ্যে হরপ্রসাদের চারপাশে এক স্বর্গীয় বলয় তৈরি হয়েছে, বক্রোক্তি তাঁকে স্পর্শ করে না। "হিমু রাতের বাবলা গাছে কখনো জোনাকির ঝাঁক দেখেছিস? দেখবি আগের দিনের সঙ্গে মিল নেই। দেখবি কত জানা, তবু কত অচেনা। দেখবি সব জানা নিজের মতো করে বার বার জানতে হয়। এমনকী সামান্য হাঁটাও।" স্বপ্নাচ্ছন্ন শোনায় তাঁকে।

সে-রাতে সুস্মিতাকে কোলে করে ছাদে ঘোরার সময় স্বচ্ছ আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে হরপ্রসাদ ভাবেন এই মুহূর্তে কত পিতামহ কত নাতনি-কোলে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। কত মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে আলাদা ভাষায় একই ভাবনা ভেবে চলেছে। এভাবে খণ্ড খণ্ড মানুষ পূর্ণ ভাবনার দিকে যায়। কেউ হয়তো তার মতো অপ্রকাশিতব্য কিছু-না-কিছু লিখেও ফেলেছে। আঃ, কী সুন্দর একটা গ্রহেই-না জীবনটা কাটল!

এরপর হরপ্রসাদ আর বেশি দিন বাঁচেননি। সত্তরের পর শেষের একটা বছর তার রুটিন ছিল এইরকম—দ্বিতীয় দফায় রেললাইন টপকে নাতনিকে নিয়ে খেতে যাওয়া। স্কুলের খাতা-বই নিয়ে সে-মেয়ে যেত তার আঙুল ধরে। সে-মেয়ে সারাক্ষণ বকবকম করত। ঠাকুর্দাও। আলাদা ভাষার দুই মানুষ বাড়ি ফিরত সন্ধ্যেবেলা। এর মাঝে হরপ্রসাদ খুলে বসতেন পুরোনো ডায়েরি, এক-একদিন এক-একটা। গভীর মমতায় তাকিয়ে থাকতেন সেগুলোর দিকে, শিল্পী যেমন তার সৃষ্টির দিকে চেয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে, আর, অসমাপ্ত কাজের হিসেব করে। এই শেষ না-হওয়া কাজ আর অতৃপ্তি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে। পনেরো-কুড়ি মিটার পরিধির মধ্যে ঘোরাফেরা করত সুস্মিতা, কখনো-বা পাঠ্যবই খুলে বসত। এরকম এক দুপুরে, তিনটে পঞ্চাশের এক্সপ্রেস বেরিয়ে যাওয়ার সময় হরপ্রসাদের ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়। সে-দিন তিনি ছিলেন ঝাঁকড়া একটা নিম গাছের ঠিক নীচে। মাঠের একদম কেন্দ্রে। বিছানো শীতলপাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছিলেন। কাকতালীয়ভাবে যার শেষ লাইনটা ছিল মৃত্যু-বিষয়ক—"পোকার মৃত্যুতে অন্য পোকারা কাঁদে? নাকি, অন্যরা আনন্দের সঙ্গে তাকে খেয়ে নেয়?" সবাই টের পায় পরে। সুস্মিতার তারস্বরের কান্নায়। মুনিষরা এসে দেখে রংবেরঙের পোকার দল মালিকের

হেলে পড়া শরীরে উঠে পড়েছে। কৃতজ্ঞতায় তারা কামড়াচ্ছিল না, চেষ্টা করছিল বাঁচিয়ে তোলার। পা থেকে ঘাড় অবধি লম্বা মিছিল। ভাঙা খেলনা গাড়ির মতো দেখাচ্ছিল বাবুর শরীরটা। সুস্মিতাকেও ছেঁকে ধরেছিল পিঁপড়ে। বিষের প্রভাবে ফর্সা মেয়ে লাল হয়ে যায়। তার মুখে ঢুকে গিয়েছিল কিছু পিঁপড়ে। দু-জনকে তাড়াতাড়ি তুলে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলেও ডায়েরিটা পড়ে রইল কেঁচোর কুণ্ডলী-পাকানো একটা গর্তের ওপর। খোলা পাতায় বসেছিল বড়োসড়ো একটা গুবরে পোকা, মৃদুমন্দ বাতাসে পাতাগুলো তার গায়ে পড়ছিল ঝালরের মতো, আর সে চমকে চমকে উঠছিল। গাছের মাথায় হঠাৎ পাখিদের ভিড় লেগে যায়। তখন বিকেল চারটে ছাপ্পান্ন। মৃত্যুর শিঙা বাজিয়ে ডাউন ট্রেনের আর্তনাদ শোনা গেল।

মৃত্যুর কিছু আগে নিজের লেখা থেকে হরপ্রসাদ একটা চিরকালীন সত্য আবিষ্কার করেন। মানুষ নিয়ে তিনি লিখতে চাননি, অথচ, সারাজীবন ছোটো ছোটো প্রাণের মধ্যে মানুষের বৈচিত্র্যই খুঁজে বেড়িয়েছেন। মানুষ যাকে ভুলতে চায়, শেষ পর্যন্ত সে প্রবলভাবে অন্য আকারে তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

হার্ট-অ্যাটাকের ঠিক আগে এটা তিনি উপলব্ধি করেন। তখন সময় ফুরিয়ে এসেছে। সে-সময় ছেলের কথা মনে পড়ে—না, ছেলেটার ওপর অবিচার করাই হয়ে গেছে। এরপর একবার সুস্মিতার দিকে তাকান এবং কাত হয়ে পড়েন।

সব ডিটেল সুস্মিতার মনে থাকার কথা নয়। তবু সাত বছরের কিছু কিছু থেকেই যায়। পোকার সারিবদ্ধ মিছিলে চাপা পড়া স্নেহপরায়ণ ঠাকুর্দার নিঃসাড় শরীরের কথা আর পিঁপড়ে-আক্রান্ত নিজের অসহায় জ্বালা-ধরানো অবস্থার অনুভূতি তার মনে রয়ে গেল স্থায়ীভাবে। আর, এসবকে ছাপিয়ে রয়ে গেল একটা রসালো নোনতা স্বাদ, বাঁচার তাগিদে পিঁপড়ে চিবিয়ে ফেলে যা সে পেয়েছিল। ওই স্বাদ কখনো তার পিছু ছাড়েনি। বাকি জীবন স্বাভাবিক যৌনতার প্রধান বাধা হিসেবে সঙ্গে রয়ে গেল। চুম্বন, ফাটা ঠোঁটের রক্ত, লালা, ঘাম, সব ধরনের শারীরিক নিঃসরণে সুস্মিতা পেত পিঁপড়ের নোনতা রসের স্বাদ, আর সেইসঙ্গে তার চোখের ওপর ভেসে উঠত একটা দুঃখের ছবি—নানা শেডের সবুজের মাঝে ছুটে যাওয়া ট্রেনের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে তার জীবনের ফার্স পার্সন, তার প্রথম বিন্দু, শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ।

দুই

'গাইড' রিলিজ করল পঁয়ষট্টির ছয়ই ফেব্রুয়ারি। তারপর বিপদে পড়ল দেবানন্দ। 'চিত্রা' হলে তিন বার দেখার পর অমন হিট হিরো, ভারতীয় গ্রেগরি পেককে পাকড়ে ফেলল সদ্য কৈশোর পেরোনো প্রীতিলতা। বিপদ হল ওয়াহিদা রহমানেরও। তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে নিয়ে মন ঈর্ষায় ভরে গেল প্রীতির। তারপর অসংখ্য সিনেমা এলেও দেবানন্দ মুক্তি পেল না, প্রীতিলতার হৃদয়ে আটকে রইল। সরলতরল হাসিখুশি মেয়েটি ছায়াছবির রোমান্সে এত ডুবে থাকত যে, তার সঙ্গে সবসময় বসবাস করত

কোনো-না-কোনো স্টার। অবশ্য, বিছানা অবধি যাবার স্বাধীনতা ছিল একমাত্র দেবানন্দের। ভদ্রলোকের বন্দিদশা চলে উনসত্তরের সাতুই নভেম্বর পর্যন্ত, ওই দিন মুক্তি পায় রাজেশ খান্না আর শর্মিলা ঠাকুরের 'আরাধনা', তারপর প্রীতি ধরে ফেলে রাজেশকে। মাঝে ধর্মেন্দ্রর প্রবেশের সম্ভাবনা এসেছিল। বড্ড বলশালী, এই যুক্তিতে সরিয়ে রাখা হয়। সত্তরে প্রীতির বিয়ে। সে-বার চারটে সিনেমা দু-বার করে দেখেছিল—'জনি মেরা নাম', 'জীবন মৃত্যু', 'মেরা নাম জোকার' আর 'কাটি পতঙ্গ'। প্রথম তিনটে সে ছেঁটে ফেলে আলাদা আলাদা কারণে। 'জনি মেরা নাম'—বুড়ো হয়েও দেবসাহেব খালি বাচ্চাদের সঙ্গে লটঘট করে। 'জীবন মৃত্যু'—বাংলায় উত্তমকুমার অনেক ভালো করেছে। 'মেরা নাম জোকার'—রাজ কাপুরের গলাটা মেয়েলি, গোঁফটা বাজে। তা ছাড়া একটা সিনেমার দু-দুটো হাফটাইম! 'কাটি পতঙ্গ'ই ভালো। বেঁচে থাক রাজেশ খান্না। আশা পারেখের পাছা বিসদৃশ, উথলে ওঠা দুধের মতো ফোলা কেন? রাজেশের টেস্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি, এরকম মৃদু সংশয় অবশ্য ছিল তার মনে। সব মিলিয়ে নিজের জীবনটা কম বয়েস থেকেই ছায়াছবির জগৎ বানিয়ে ফেলেছিল ভালোমানুষ মেয়েটা। নিজস্ব চিত্রনাট্যে

ছবিতে দেখা চরিত্র নিয়ে কাটত তার সময়। দিন কাটত গুনগুনিয়ে, রাত স্টার-সংসর্গে। নতুন বর দেবপ্রসাদের সেখানে স্থান ছিল না। বিয়ের পর হানিমুনে গেছিল দার্জিলিং। সেও রাজেশের জন্য। টয়ট্রেন, ঘুম, ম্যাল, ফাইভ পয়েন্ট, টাইগার হিল ঘোরে রাজেশের বুকে মাথা রেখে। ফার্স হাফ জুড়ে গভীর প্রেমে। হাফটাইমের পর আর ভালো লাগেনি, দুঃখী শর্মিলার জায়গায় নিজেকে দেখতে চায়নি প্রীতি। 'ইন্টারমিশান' লেখা পড়তে তার হানিমুন শেষ হয়ে যায়।

প্রথম-প্রথম দেবপ্রসাদের কাছে বউয়ের খুকিপনা বেশ মজার লাগছিল, প্রশয়ও দিচ্ছিল খানিকটা। প্রশ্রয়ে যৌনতা বাড়ে। কিন্তু বিবিধ পরিবর্তনশীল স্ক্রিপ্টের সঙ্গে সে তাল মেলাতে পারছিল না। বিয়ের নতুনত্ব কমে আসতে প্রীতির তরল তাজা ভাবটা তার অসহ্য লাগতে থাকে। রোজ পরপুরুষের সঙ্গে কাটায় এমন বউ কোন পুরুষ সহ্য করবে? অবাস্তব এই বউ কখনো গৃহিণী হবে এমন আশা দেবপ্রসাদ ছেড়ে দেয়।

আশা ছেড়ে দিয়েছিল প্রীতিলতাও। মধুচন্দ্রিমায় গিয়েই সে বুঝতে পারে বর তার জগতের কেউ হবে না। নায়ক তো নয়ই, ভিলেন বা ছোটোখাটো সাইডরোলেও ফিট করবে না। পাহাড়ী সান্যাল বা বিকাশ রায় তো দূরস্থ, আগা, মেহমুদ, কিংবা মুকরি হওয়াও সম্ভব না। সে না-হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু, ফুরফুরে একটু রোমান্স তো থাকবে। দার্জিলিঙে পূর্ণিমার চাঁদ মাথার ওপর দেখে ঘুমন্ত বরকে সে ডাকে, "দেখো দেখো, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, আলো জলপ্রপাতের মতো গলে পড়ছে।" দেবপ্রসাদ পাকা ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলে বাইরের দিকে তাকায়, তারপর বলে, "চাঁদ এরকমই হয়—পূর্ণিমায় আলো বেশি হয়—পাহাড়ও উঁচু-নীচু হয়—এতে দেখার আছেটা কী?" তারপর পাশ ফিরে সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতভোর একা বসে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি দেখে প্রীতি, দেখে ঠান্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া গাছপাথর। ভাবে বরফের মধ্যে কাঠের আগুন জ্বেলে সে অপেক্ষায় আছে কারো। সবই ডলবি সাউন্ড এফেক্টসহ। তারপর আর কখনো বরকে ডাকেনি। যা হওয়ার নয়, যে হওয়ার নয়, তার পেছনে ছুটে লাভ কী?

এইভাবে কেটে গেল পাঁচটা বছর। এর মাঝে দুটো মিসক্যারেজ হয়ে গেছে। তৃতীয় বার অতিরিক্ত সতর্কতার মধ্যে ছ-মাস কাটার পর চাঁদু ডাক্তার চেক-আপে আসে। ছোটোবেলার বড়ো হয়ে যাওয়া ডাক্তারবন্ধু। কথাপ্রসঙ্গে গর্ব করে দেবপ্রসাদ তাকে বলে, "বুঝলে হে, আমাদের বংশের সবার সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্তে।" কথাটা সত্যি। হরপ্রসাদের জন্ম ২৯ জুলাই, ১৯১১। সে-দিন গোরাদের হারায় খালি-পায়ের মোহনবাগান। তার দু-দিন আগে থেকে ঢাকা, অসম, পূর্ণিয়া থেকে বাঙালিরা কলকাতা ও তার আশপাশে ভিড় জমায়। আধচেনা অনেক আত্মীয়ে ভরে গিয়েছিল দেবপ্রসাদের পৈতৃক যৎসামান্য আস্তানা (তখনও তারা সচ্ছলতার মুখ দেখেনি)। সেই প্রথম ভারতে খেলার টিকিট ব্ল্যাক হল। মোহনবাগান শিল্ড হাতে গ্রুপ ফোটো তোলার পর প্রবল হট্টগোলের মধ্যে ফাঁক গলে জন্মে যায় হরপ্রসাদ। জন্মের পাঁচ মাসের মধ্যে ব্রিটিশরা রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেয়। এভাবে নিজের, মায়ের, বউয়ের এবং বংশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিনক্ষণগুলো বলতে যাচ্ছিল দেবপ্রসাদ। ডাক্তার তাকে থামায়, "শোনো দেবু, এভাবে দেখলে পৃথিবীর সব ঘটনাই বৃহত্তর ঘটনার সংকেত। সবকিছুর সঙ্গে সব কিছুর যোগসূত্র টানা যায়। খোঁজার নেশা থাকলে খুঁজে পাবেই। ইলেকট্রিক বাল্ব আবিষ্কারের স্বর্ণজয়ন্তী, লেনিনের মৃত্যুর একান্ন বছর, মাওয়ের লং মার্চের স্টার্টিং পয়েন্ট, কলেরার টিকার শতবর্ষ—খুঁজলে কিছু-না-কিছু সবাই পাবে। এগুলো আসলে নিজেদের অযোগ্যতাকে গরিমাযুক্ত করার তৃপ্তি।" এরই ফাঁকে পেট নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে প্রীতি বলে, "ও মা, তাই তো, আমাদের বিয়ে হয়েছিল সাতুই নভেম্বর, এক বছর আগে ওই দিনই তো 'আরাধনা' রিলিজ করল, সেই জন্যই তো আমরা টয়ট্রেনে চাপলাম, তাই-না গো।" যার উদ্দেশে বলা, সে বলে, "বোঝো কাণ্ড, আমি কীভাবে বেঁচে আছি বুঝেছ ডাক্তার?" চা খেতে খেতে চাঁদু বলে, "ছেলেমানুষ, বড্ড ছেলেমানুষ।"

ঐতিহাসিক মুহূর্তে সৃষ্টির পারিবারিক শর্ত মেনে সুস্মিতা হল পঁচাত্তরের বড়োদিনে। এমন সুন্দর বাচ্চা ওই অঞ্চলের কেউ কখনো দেখেনি। দেবপ্রসাদ অবাক

হয়ে গেল। আত্মীয়দের সন্দেহ হল। পড়শিরা কানাঘুষো শুরু করল ঈর্ষায়—সাধারণ বাড়িতে এমন সুন্দরী হয় কী করে? দেবপ্রসাদ ভাবার চেষ্টা করে কার সঙ্গে মিল আছে। উত্তমকুমার, দেবানন্দ, ধর্মেন্দ্র না রাজেশ খান্না। অশোককুমার, গুরু দত্ত, মনোজকুমার, দিলীপকুমার, রাজকুমার, রাজেন্দ্রকুমার আর সৌমিত্রকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা হল; তারা প্রীতির কল্পনায় ছিল না। যে যার কথা ভাবে, তার জিন কি স্বপ্নেও সাঁতরে আসে? কার ক্রোমোজোম হানা দিল? দেবপ্রসাদ ভেবে কুলকিনারা করতে পারল না। শুধু এটা বুঝতে পারল, এই বাচ্চা তার বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। না-করলেও এ তারই। কিন্তু প্রীতির কল্পনার আকাঙ্ক্ষা তাকে বড়ো ছোটো করে ফেলেছে। প্রীতিলতা অবশ্য একটুও অবাক হল না। তার ভঙ্গিটা ছিল বলার কী আছে, স্টারদের বাচ্চা তো এরকমই হয়। অন্যরকম হওয়ার তো কথা নয়, কম সাধনা করেছি?

এরপর দেবপ্রসাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। মা ও মেয়ের থেকে দূরে সরতে গিয়ে আবার স্কুলজীবনের মতো নির্বান্ধব হয়ে পড়ে দেবপ্রসাদ। প্রীতিলতাও মনের মতো মেয়ে পেয়ে বরের পর্বটা শেষ করল নির্বিঘ্নে। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে। সুস্মিতা বর্ণপরিচয় ধরার পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইশারানির্ভর হয়ে পড়ে। আর, সুস্মিতা বেড়ে উঠতে থাকে মায়ের বদ্ধ ছায়াছবির জগতের আড়ালে অনেক বেশি-বেশি করে ঠাকুর্দার কল্পনার খোলা জমিতে।

বাবার মৃত্যুর পর দেবপ্রসাদ হিসেব করে দেখল, এতদিন কিছু-না-কিছু করে চলেছে। বাকি জীবনটা আর-কিছু না করলেও চলবে। মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পদের প্রতি মোহ দেখিয়ে লাভ নেই। বাবার সাধের মুনিষরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতায় জমি বেহাত হওয়ার পথে। প্রায় জলের দরে সেগুলো সাল্‌টে পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলল সে। অকর্মণ্য বর এতকিছু পারবে ভাবেনি প্রীতিলতা। ওই একবারই দেখল আলস্যের অহংকার ভেঙে তাকে কিছু করতে। পুকুরসমেত ভিন্টেজ গাড়িটা কিনে নিল আর্মির এক রিটায়ার্ড লেফটেন্যান্ট, সিভিলিয়ানদের শৃঙ্খলার অভাব নিয়ে কথা বলা ছিল যার একমাত্র অবসর-বিনোদন। নীচের ঘরগুলোয় বসল তিন পরিবার ভাড়াটে। সবমিলিয়ে নিঃসঙ্গতা একটু কমল। চলাফেরার জায়গা বলতে রয়ে গেল দোতলার ঘরগুলো, যার দুটো নানান সময়ের মালপত্র ঠেসে বন্ধ রাখা হত। খোলা আকাশবাতাসে ভ্রমণের জন্য রইল ছোটো চিলেকোঠার ঘরের সামনে ছড়ানো ছাদ আর পেছনের এক-চিলতে বাগান। ততদিনে চারপাশের বাগান কেটে তৈরি হয়েছে বসতি। সবুজের ভারসাম্য রাখতে রেললাইনের সমান্তরাল রাস্তা বরাবর লাগানো হল ইউক্যালিপ্টাসের সারি, ফাঁকে ফাঁকে ফুটে উঠল ফলস টালি বসানো চিত্রবিচিত্র খোঁচা-খোঁচা ঘরবাড়ি। সামনের কাঁচা রাস্তায় যখন পিচ পড়ল, যখন তিরিশ হাজার গ্যালন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জলের ট্যাঙ্ক হল ষাট ফুট উঁচুতে, দেবপ্রসাদের অর্ধেক চুল পেকে গেছে। প্রীতিলতা সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। সে তখন মেয়ের জন্য ক্রুশে অপূর্ব লেস বানায়, এঁচোড়ের আচার করে। আর, স্মৃতিকাতর আউটডোর সিকোয়েন্সের গান গুনগুন করে। ঘরে যে আটকে যায় তার মনই বেশি দূরে ছোটে। সুস্মিতা তখন পাঁচ দুই লম্বা, ক্লাশ সাড়ে নাইন। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ নির্বাক বিদেশির মতো।

স্ত্রী-কন্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও দেবপ্রসাদের বিশেষ হেলদোল হল না। সে পা-ছড়িয়ে বসার একটা ইজিচেয়ার কিনে তাতে থিতু হল। মাসের প্রথম ব্যাঙ্কের মোটা সুদ আর তিন ভাড়াটের টাকা তোলা ছাড়া গোটা মাসটা কাটে শুয়ে-বসে। কাজের লোকদের কাজ ভাগ করে দেওয়া আছে, ওসব নিয়মে চলে। এই অবস্থায় সে একটা দাবা কিনে ফেলল। কাজ করা কাঠের ঘুঁটি আর ভাঁজ করা ল্যামিনেটেড চৌষট্টি খোপের বোর্ড নিয়ে প্রৌঢ়ত্বের গোড়ায় শুরু হল দাবার প্রথম পাঠ। দাবা খেলে আর পুরোনো বাড়ির নানা শব্দ শোনে, শব্দের সঙ্গে পায় অদ্ভুত সব গন্ধ। অবিরাম অবকাশ দেবপ্রসাদের কিছু ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। বাড়ির ছায়ার পরিবর্তন, গতির তারতম্যে ট্রেনের বগি গণনা করে চোখ বুজে। কখনো-বা গল্পের বই, পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে। চাঁদু ডাক্তার একদিন বলে, "এটা কোনো জীবন নয়। সব থাকতেও এভাবে আছ কেন? সামান্য মান-অভিমান এত বড়ো

করে তোলে কেউ? টাকার জন্য না হলেও নিজের জন্য কিছু করা দরকার। সংসারও করতে হয় নিজের বাঁচার জন্য। অহেতুক জটিলতায় সব নষ্ট করছ।"
কিন্তু, আলস্যের বর্ম বড়ো কঠিন, সে আত্মরক্ষা জানে। আলস্যের গর্বে গ্যাসফানুস হয়ে ওঠা দেবপ্রসাদের ধারণা—কাজে ব্যস্তরা আসলে অকাজের লোক, ওতে পৃথিবীর উপকার হয় না। কিছু করছি না মানে, কারো অপকার করছি না। অধিকাংশ কুঁড়ে লোক এক ধরনের লোকাল দার্শনিক হয়ে পড়ে। কথাবার্তায় হয়ে ওঠে ওস্তাদ। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য গীতা, নীৎশে—সবকিছুর সরল অপব্যাখ্যা করে চতুরভাবে। মোদ্দা কথা একটাই—কিছু না করে জীবনটা চালাব।
ডাক্তারকে সে যুক্তি দেয়, "এক প্রজন্ম উপার্জন করবে, পরের প্রজন্ম ভোগ করবে, এটা পৃথিবীর নিয়ম। বাবা প্রথমটা করেছেন, আমার কাজ আমায় করতে দাও।"

—ভোগ করার জন্যও শ্রম লাগে, সেটা অন্তত করো।

—পাগল হয়েছ ডাক্তার? বাবাকে দেখেছি উদয়াস্ত খেটে মাঠের মাঝে মরে গেল। কী হবে ওসবে?

—তবু ওটাই জীবন। তুমি কিছুই শিখলে না। না বাবার থেকে, না বই থেকে। মাঠে না মরে খাটে মরলে কী সুবিধা হত?

—শিখেছি। শিখেছি কোনোরকম আবিষ্কার বা উপলব্ধি থেকে দূরে থাকতে হবে। সবই তো পৃথিবীতে হয়ে গেছে। এটুকু জেনেছি। লেখালেখির চক্করে একদম পড়তে নেই। লেখা যত-না বুদ্ধি-বিবেচনা প্রকাশ করে, তারচেয়েও বেশি প্রকাশ করে মূর্খামি। সব লেখালেখির ওপর শেষপর্যন্ত গুবরে পোকা বসে হাসে।

—নাঃ, তুমি একেবারে হোপলেস।

দুই বন্ধুর কথাবার্তা এইভাবে চলে। এভাবে বন্ধুত্ব বাড়ে।

দু-জনে একটু দাবা খেলে। বেসুরো গলায় দেবপ্রসাদ গুনগন করে, 'যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী ...'।
ডাক্তার বলে, "ওয়াজেদ আলি শা-র চেয়ে তোমার অবস্থা করুণ, সবাই একদিন ছেড়ে চলে যাবে তোমায়, তোমারই জটিলতায়।"

সে-বছর ১১ ডিসেম্বর অকালে চলে গেল প্রীতিলতা। বিনা নোটিশে। মনে মনে সে আগেই মরে গিয়েছিল। শরীর গেল এবার। কারণ বোঝা গেল না, বেশ রহস্যজনক। সুস্মিতা শুত মায়ের সঙ্গে। রাতে খুব আদর করার পর মেয়েকে নিজের হাতে ক্রুশের কাজের সুন্দর জামা পরায় প্রীতি, "কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে", কাজলদানি থেকে কড়ে আঙুলে কপালের পাশে টিপ লাগিয়ে দেয়। তারপর খাইয়ে-দাইয়ে হালকা চাদর চাপা দিয়ে মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। সকালে আর সে ওঠেনি। বালিশ সরাতে পাওয়া যায় মোটাসোটা একটা ডায়েরি।

নাভি থেকে গা গুলিয়ে ওঠা দুঃখের মাঝে সেই প্রথম বারের জন্য সুস্মিতা দেখে অপদার্থ বাবার তৎপরতা। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে রোগের পূর্বলক্ষণ ছাড়া কীভাবে মা মারা গেল বোঝা যায়নি। রহস্যের বাতাবরণের মধ্যে ডাক্তার লিখল 'হার্ট ফেলিয়োর'। পরে শোনা যায় প্রীতি নাকি এক বছর ধরে ইসকিমিয়ায় ভুগছিল। সুস্মিতার অবশ্য সন্দেহ থেকে গেল। দেবপ্রসাদ তার এতদিনের চাপা-থাকা স্নেহ উজাড় করে দিলেও তা আর কাটল না। স্ত্রীর প্রতি যে-ভালোবাসা যায়নি, স্ত্রী থাকতে যে-আবেগ দেখা যায়নি, দমবন্ধ করা অধিকারবোধে তা বিপজ্জনক রূপ নিল। সুস্মিতা এই অস্বাভাবিক স্নেহ মেনে নিল না, তার কাছে এসব বাবার অপরাধবোধের অনুতাপময় প্রকাশ। তা ছাড়া, ততদিন অঙ্কের বই থেকে সে জেনে গেছে—দুই বিন্দুর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম দূরত্বের পথকে সরলরেখা বলে, এবং হরপ্রসাদ আর প্রীতিলতা নামের দুই বিন্দুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সরলরেখায়। দেবপ্রসাদ নামের বিন্দুটির সঙ্গে দূরতম ঘুরপথের বক্ররেখাতেও সে যোগাযোগের পথ খুঁজে পায় না। তবু, বাবার দিকের আত্মীয়রা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে যায়, "এবার বাবার দায়িত্ব তোর।"

এসব কথাও সুস্মিতার আবছা হয়ে এল। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রয়ে গেল মায়ের স্মৃতি আর মোটাসোটা ডায়েরিটা। কলেজে ঢোকার পর ডায়েরিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সে। তেমন কিছুই ছিল না। ডায়েরি যদি দিনলিপির সমাহার হয়, এটা ডায়েরি নয়। নানান বিষয়ে এলোমেলো লেখা, সময়ের ক্রম

অনুসারেও নয়। ছোটোবেলার বন্ধুদের কথা, বড়ো হওয়ার জায়গার বর্ণনা, আর, অন্তত দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে সিনেমার কথা। কখনো ছবির সংক্ষিপ্তসার, কী হলে ভালো হত সে-বিষয়ে মতামত। সমালোচকের মতো। কোন সিনেমা হলের সিটে ছারপোকা বেশি, কিংবা, কারা দর্শকদের দাবিতে একই রিল দু-বার চালিয়েছিল, এইসব কথা। স্টাররা তো ছিলই; পাহাড়ী সান্যাল, অভি ভট্টাচার্য, অসিত সেন, টুনটুন, শোভা খোটে, মলিনা দেবী, পদ্মাদেবী, তুলসী চক্রবর্তী নিয়েও টিপ্পনীতে ভরে উঠেছিল পাতাগুলো। সিনেমা দেখা ছাড়ার পর শুরু হয়েছিল লেখা। এভাবেই বোধ হয় ছায়ার মতো ছবির জগতে টিকেছিল প্রীতিলতা। মেয়েকে লেখা অনেক চিঠিও ছিল সেখানে। স্নেহ আর উপদেশে ভরা, সন্তান দূর-হস্টেলে থাকলে মায়েরা যেমন লেখেন। তবে চমকে যাওয়ার মতো ছিল শেষের সতেরো পাতা। হয়তো আরও অনেক লেখার ছিল, সময় পায়নি। তাই কিছু ডট ডট ডট দিয়েই কাজ সেরেছিল। এই অংশটা সাধুগদ্যে লেখা। গভীর কোনো কথা নয়, সমাজচিত্রের বড়োসড়ো প্রতিফলনও ছিল না সেখানে, তবু মায়ের লেখা বলে কথা! প্রীতিলতাকে তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ বলা যাবে না, তাহলে স্বাভাবিক চটুলতা ছেড়ে হঠাৎ সাধুগদ্যে আংশিক আত্মচরিত কেন? কে জানে?

প্রথম দুটো পরিচ্ছদ ছিল এইরকম—

ক।। আমার বিবাহের পরবর্তী মাসে ঘোর বর্ষা আসিল। সেই প্রথম দেখিলাম জলের দাপটে রেলগাড়ি খিড়কির পিছনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। লাইন ছুঁইয়া জলের স্রোত মাটি নরম করিয়া তোলায় মানুষের বড়ো বিড়ম্বনা হয়। পিতৃগৃহে গমনের কথা ছিল আমার। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি তাহা বাতিল করিল। তবে, যে-অঞ্চলে আমার নতুন সংসার সেটি অত্যন্ত মনোরম স্থান। শুনিয়াছি, এই অঞ্চল ব্রিটিশবর্জিত হওয়ায় ইহার রূপ অন্য প্রকার ছিল। অদৃশ্য এক রেখার ওই পার্শে আসিয়া প্রতাপশালী ইংরেজরা থামিয়া যাইত। কিন্তু, আবহাওয়া দেখিতেছি সে-রেখা মানিতে চাহে না। জলমগ্ন চরাচরে আমরা সামান্য দ্বীপ হইয়া জাগিয়া আছি।

খ।। বন্যার পূর্বাভাস সত্ত্বেও বাবা আসিলেন ছোটোভাইয়ের সহিত। আমি তার আদরের মেয়ে। স্বামী দ্বিতলের বারান্দা হইতে নামিবার সৌজন্যটুকুও দেখাইলেন না। উপর থেকেই বলিলেন, এই দুর্যোগে আসিবার প্রয়োজন কী? মেয়েকে কি জলে ফেলিয়াছেন? এক-হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া বাবা বলিলেন, "বাবাজীবন আমরাই তো জলে পড়িয়াছি।" রাতে স্বামী বলিলেন, "তোমার বাবার কথা ইঙ্গিতপূর্ণ, লক্ষণ ভালো নয়।" সে-দিনই আমি টের পাই লক্ষণ ভালো নয়, বিবাহিত জীবন সুখের হইবে না। তবে শ্বশুরমশাই ভালো লোক, তিনি ক্ষুদ্র ভাবনার মানুষ নন। চমৎকার আপ্যায়ন করিয়া আমার সম্মান রাখিলেন।

এইভাবে আলাদা আলাদা প্রসঙ্গে লেখা। দেবানন্দ রাজেশ উত্তমে ডুবে থাকা মানুষ কেন হঠাৎ কৈলাসবাসিনী দেবীর ভাষায় লিখতে শুরু করল শেষ অংশ? সে কি জানত 'এক্ষণ' গৃহবধূর ডায়েরি ছাপে? সে কি বুঝতে পারেনি একদিন তা বন্ধ হয়ে যাবে? তা ছাড়া, সেসব গৃহবধূদের সেটাই ছিল স্বাভাবিক ভাষা। প্রীতিলতা অতদূর পেছনে ছুটল কেন? হয়তো সে বুঝেছিল শেষ এগিয়ে আসছে। শেষের শুরুতে মানুষ অদ্ভুত গাম্ভীর্য অর্জন করে, অন্তত চেষ্টা করে। আর, তার সহজতম মুদ্রাদোষ হয়তো এমন ভাষা। প্রীতিলতাও বুঝিবা গম্ভীর কিছু বলার কথা ভেবেছিল, যদিও সে যোগ্যতা তার ছিল না।

সুস্মিতা মায়ের ডায়েরি হরপ্রসাদের সেই ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখে। তার কেমন যেন মনে হয়, ডায়েরি মৃত্যুর পূর্বসংকেত। দু-দু-বার যা সে পেল।

তিন

তো, এই হল সুস্মিতার ব্যাকগ্রাউন্ড। কানাঘুষো আর গুজবে সংগৃহীত মিথ জুড়ে একটা বালিকাবেলার কাহিনি। তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা বৃথা। মিথ্যে হলেই-বা ক্ষতি কী? যে-মিথ্যে বার বার উচ্চারণে প্রতিষ্ঠিত, তা-ই সত্য। আমরা যখন সুস্মিতাকে পাই, আমাদের গল্প সেখান থেকে। পাই বলা ঠিক হল না।

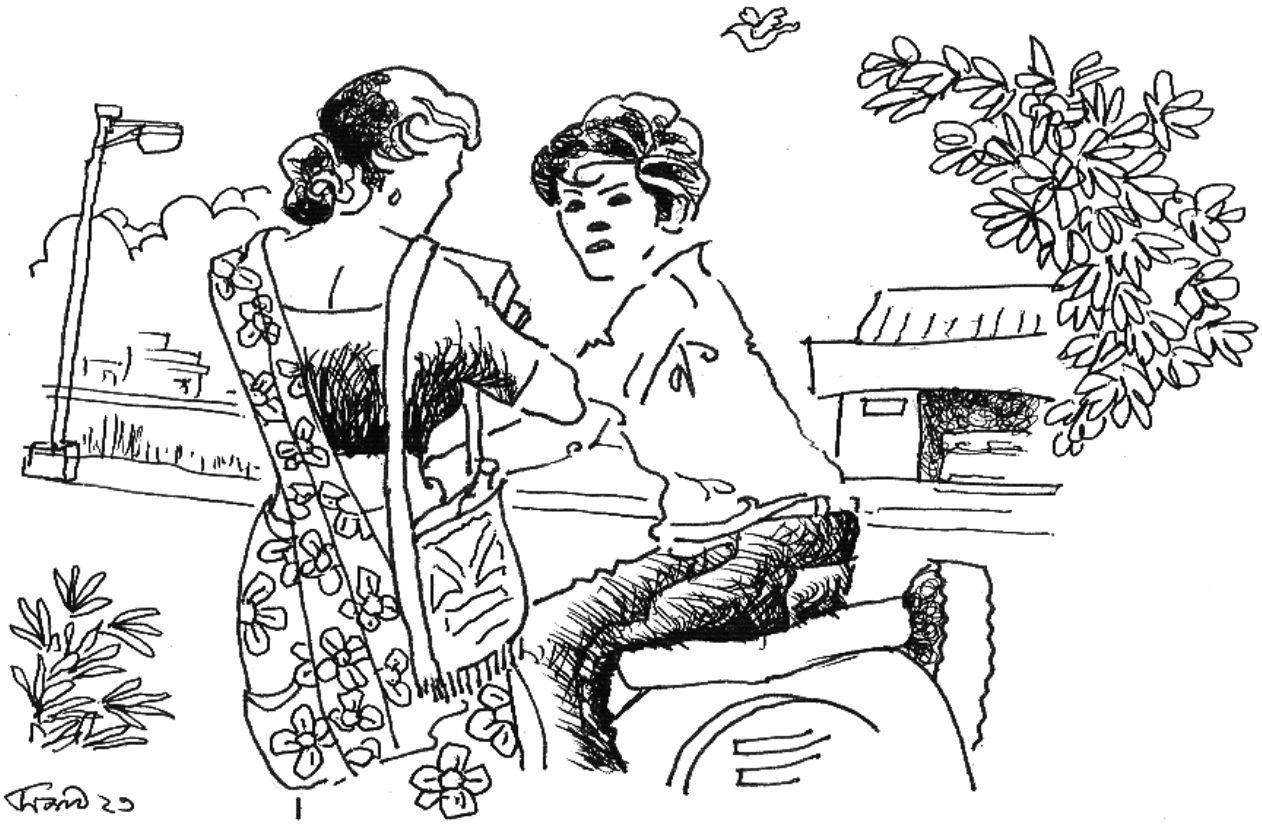

পাবার স্বপ্ন বলা যায়। কেননা, সুস্মিতাকে কেউ কখনো পায়নি।

আমাদের ছোট্ট শহরে সে-সময় সুস্মিতা ছিল এক সাড়া জাগানো রমণী। মেয়ে, মহিলা, তরুণী বা যুবতী তার সঙ্গে খাপ খায় না। সুস্মিতাকে দেখে রমণেচ্ছা হয়নি এমন পুরুষ ওই অঞ্চলে ছিল না। আশপাশের মফস্সলেও অমন সুন্দরী ছিল না। সুস্মিতা কারো দিকে তাকিয়ে দেখেনি। দেমাকে নয়, এমনিই। সে বড়ো অন্যমনস্ক। বাবাকে দেখার পর, মায়ের মৃত্যুর পর, পুরুষদের দেখার ইচ্ছেই চলে যায়। বয়সোচিত হরমোনের প্রভাবেও বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে কৌতূহল জাগল না। সৌন্দর্যের কারণে খেলার সঙ্গী না জোটায় উসকে দেওয়ার মতো কেউ হল না। শরীরের সব কোষ রয়ে গেল অপাপবিদ্ধ। কত কামনাকাতর দৃষ্টি প্রতিমুহূর্তে বিদ্ধ করছে সে-সম্পর্কে সুস্মিতার ধারণা ছিল না। লক্ষ করলে বুঝতে পারত এই ভক্তকুলের বয়সের লোয়ার লিমিট (১৫-১৬) ছিল, আপারটা ছিল না। ষাটের মানুষদেরও বুক হু-হু করে উঠত। সহপাঠী, ইউনিয়ন লিডার, অধ্যাপক, উঠতি মেরিন এঞ্জিনিয়ার, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অ্যান্টিসোস্যাল, কমিউনিস্ট কাউন্সিলার, প্রতিষ্ঠিত প্রোমোটার—অনুচ্চারিত পাণিপ্রার্থীর তালিকা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দীর্ঘ। এক দল ভাবত সময় ফসকে যাচ্ছে, বয়সের শেষসীমার মানুষরা ভাবত সময় ফুরিয়ে আসছে, জীবনটা বৃথাই গেল। প্রস্তাব দেওয়ার সাহস ছিল না কারোর, না নিষিদ্ধ, না সামাজিক। সুস্মিতার ত্বকের আভা আর নাকের ডগায় জমে থাকা ঘামের বুদ্বুদে তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ত। বিলাসবহুল বাংলোর পাশে নিছক সার্ভেন্টস কোয়ার্টার মনে হত নিজেদের। এভাবে চলতে চলতে সুস্মিতা কলেজে পৌঁছে গেল। এই অবস্থায় চুরানব্বইয়ের গ্রীষ্মে বাড়ির সামনে পিচগলা রাস্তার মাঝে সুরঞ্জন তাকে প্রোপোজ করে। তখন লু বইছে, শুনশান রাস্তা সদ্য নিভে যাওয়া জীবন্ত এক আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গ হয়ে আছে। আঁচে সুস্মিতার গোলাপি গাল লাভা-টুসটুসে হয়ে উঠেছে। সুরঞ্জন বলে, "জানি এটা ঠিক সময় নয়, তবু মনে যখন এসেছে বলেই ফেলি।" গলে যাওয়া পিচে সুস্মিতার চটি আটকে গিয়েছিল। সে জোর দিয়ে পা তোলে, চড়চড় শব্দে ছায়ায় ঝিমোতে থাকা কুকুর

ফিরে চায়। রোদ ঠেকাতে সুস্মিতা আঁচল টেনে ঘোমটা দেয়। হাতে ছিল লাইব্রেরি থেকে আজই তোলা দুটো বই হাস্টিনের 'ট্রপিকস ইন অ্যালজেব্রা' আর লোনির 'কো-অর্ডিনেট জিয়োমেট্রি'। স্কুটার সাইড করে বইদুটো ধরে সুরঞ্জন। রাস্তা পেরিয়ে ফেরত নেয় সুস্মিতা। যেন খুব ব্যস্ত এমনভাবে সুরঞ্জন বলে, "ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম... যাক, বলে আর কী হবে... আর যা রোদ... থাকগে ওসব, এই নাও, এতেই সব লেখা আছে।" একটা বড়ো সাদা খাম দেয় সে। "এটা রাখো, পরে জানিও"—সুরঞ্জন স্কুটারে বসে। লোহার গেটের ওপর অর্ধচন্দ্রাকারে বেড়ে ওঠা বোগেনভেলিয়ার ঝাড় তাপে চুপসে গেছে, তার ক্লান্ত ছায়ায় দাঁড়িয়ে সুস্মিতা জানতে চায়, কী আছে এতে? এই প্রথম সে কোনো পুরুষের দিকে এত সরাসরি তাকাল। চেহারায় কষ্টেসৃষ্টে পাশমার্ক পাবে, স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড বলে কিছুটা গ্রেসমার্ক। সুরঞ্জন বলে, "প্রোপোজাল। তবে প্রেমপত্র নয়। বায়োডাটা।

ফুল-লতা-পাতা-জ্যোৎস্না-পাহাড়-সমুদ্রের মতো সুন্দর তুমি নও। তাজমহলের কথা ক্লিশে হয়ে গেছে। আর চাঁদ বড়ো এবড়োখেবড়ো, পাথুরে। এতে আমার হাইট, ওয়েট, এডুকেশন, ইনকাম, অ্যাম্বিশান, অ্যাড্রেস, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, একস্ট্রাকারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ... এইসব কথা আছে। হ্যাঁ হলে জানাবে, না হলেও দুঃখের কিছু নেই। দূর থেকে ঝাড়ি মারব।" স্কুটারে স্টার্ট দেয় পাঁচ-নয়ের শ্যামলা ছেলেটা, "তাড়া নেই, ভাবো। ডিসিশান পরে নিলেও চলবে।" গিয়ার বদলে রওনা দেয় সুরঞ্জন। থতমত সুস্মিতা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, পেছন ফেরে না। সে বুঝতে পারে দোতলার বারান্দায় মরচে পড়া রেলিঙের ফাঁকে দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। নীচের ভাড়াটেদের একটা বুড়িও কি দেখছে না? দেখকুগে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সুস্মিতা ওপরে ওঠে।

দশ ফুট চওড়া পঞ্চান্ন ফুট লম্বা বারান্দায় সিঁড়ির মুখে সুস্মিতার ঘর। মায়ের ঘরটাই সে নিয়েছে। বারান্দার ওই প্রান্তে উলটোদিকে দেবপ্রসাদের ঘর। ওই ঘরে শরদিন্দুর গল্পের কুটিল বুড়োদের মতো খুটখাট করে। বার্মাটিকের আলমারি খুলে গোপন কাগজপত্তর নিয়ে সে কীসব যেন করে ডিম লাইট জ্বেলে। রাতভর ব্যস্ত থাকে। দিনেরবেলাটা দেবপ্রসাদের বারান্দাতেই কাটে। মাঝে মাঝে পেছনের জানালা দিয়ে রেললাইনের ওপারের জমিজমা দেখে, যে-জমি বহু আগে নিজেই ছেড়ে দিয়েছে। কখনো ডান দিকের পুকুর দেখে, যে-পুকুর তার সহ্য হয়নি। এখন লেফটেন্যান্টের ছেলে সেখানে মাছচাষ করে। সবই চোখের সামনে আছে, শুধু তার নেই। দায়িত্ব আর পরিশ্রমের ভয়ে সে-ই সব থেকে দূরে পালিয়েছে। অনেকটা একই কারণে সে মেয়ের কাছে পৌঁছোতে পারেনি, অল্প চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দেয়। মনের গোলকধাঁধা এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, পুনরায় ফেরার চেষ্টা করা যায়নি। তাতে অধিকারবোধ অবশ্য একটুও কমেনি। কেউ না মানলেও না। দিনের বেলা সে শুয়ে-বসে কাটায় বারান্দার ইজিচেয়ারে। এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে পূর্ব দিকের জানালা খুললে সুস্মিতাকে দেখা যায়। ঠিক সুস্মিতাকে নয়, শুয়ে থাকা সুস্মিতার পায়ের দিকটা। যদিও এই কারণে ওই জানালা সুস্মিতা কখনো খোলে না। সে দক্ষিণের দুটো জানালা দিয়ে রাস্তা দেখে, অচেনা লোক দেখে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখে রেললাইন, তার ওপারের সেই জমি, যার সুখ ও দুঃখের ছবি এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সুস্মিতার কোন জানালা কখন খোলা মানুষ জানে। তারা ঘুরঘুর করে দর্শনের আশায়। নানা ছুতোয় তারা থমকে যায় জানালার কাছে। অবস্থা বুঝে একটা চায়ের গুমটিও হয়েছে। সাইনবোর্ড নেই, তবু লোকে বলে 'সুস্মিতা টি স্টল'। কেউ কেউ বলে 'ভিউ পয়েন্ট'।

ঘরে ঢুকে সুস্মিতা খাম খোলে। পরিষ্কার এ-ফোর সাইজের টাইপ করা কাগজ। চাকরির দরখাস্তে যা-যা থাকে—সব। পরিচ্ছন্ন সিভি। নীচে একটা সইও আছে। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মাঝারি মাপের একটা কোম্পানিতে সবে শুরু করেছে। সুস্মিতা হিসেব করে দেখল তার থেকে সাত বছরের বড়ো। এর আগে কখনো প্রেমপত্র পায়নি সে। পেলে, ইনিয়েবিনিয়ে লেখা শব্দসম্ভার নিয়ে সে কী করত? বিরক্তই হত নিশ্চিত। অবধারিতভাবে সেখানে 'ভালোবাসা' বা 'প্রেম' থাকত, রূপ-গুণের স্তুতি থাকত কালিদাসের জমানার ভাষায়। নিজের বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য

করানোর জন্য এক গাদা মিথ্যে। 'লাভ অ্যাট ফার্স সাইট' হয় নাকি? 'কাম অ্যাট ফার্স সাইট' হতে পারে। ওই চিরাচরিত ঝামেলা থেকে অন্তত ছেলেটা মুক্তি দিয়েছে। যা জানা যায় না, জানায়নি, যা জানানো সম্ভব সেটুকুই করেছে। নরমসরম কাব্যির চেয়ে এ-স্টাইলটা ভালো। এরকম প্রেমপত্র কাউকে পেতে শোনেনি। তবু চোদ্দো পয়েন্টের পরিচ্ছন্ন হরফগুলোর মধ্যে সে অনুভব করে, ছেলেটা অল্প হলেও রোম্যান্টিক। টাইপমেশিন যা চাপতে পারেনি।

সিভি-তে নেই এমন অনেক কিছু সে দেখতে পায় যেন। আর, ক্রমে শরীরে কেমন যেন হালকা ক্ষরণের অনুভূতি হয়। শরীর থেকে কিছু যেন বেরিয়ে যেতে চাইছে। খাটের ছত্রি ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সামান্য একটা সিভি-র প্রতিক্রিয়া এমনও হতে পারে! হয়তো, সামান্য উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিল শরীর। অনেক দিন পর সুস্মিতা পুবের জানালা একটু ফাঁক করে, অনুকম্পার দৃষ্টিতে চায় ইজিচেয়ারের দিকে। একটিবার মাত্র। আর, সিভি-টা সে অ্যাকসেপ্ট করে।

পরের ক-টা দিন চমৎকার কাটল সুস্মিতার। সেই ঠাকুর্দার সঙ্গে সময় এত ভালো লাগত। এত ভালো লাগত মা গুনগুন করতে করতে তেল-চুকচুকে চুল বেঁধে দেওয়ার সময়। পরের পনেরো দিন রিকশা, স্কুটারে দেখা হল বেশ কয়েক বার সুরঞ্জন ও সুস্মিতার। সুস্মিতার মন ছেয়ে গেল ভালোলাগায়। ক্লাসের শেষে কলেজ চত্বরের বকুলতলায় সুস্মিতা বসে রইল অকারণ। মাথার ওপর ঝরে পড়া ফুল সরিয়ে দিল না।

এর মাঝে একদিন সুস্মিতাদের বাড়ি যায় সুরঞ্জন। সুস্মিতা বেরিয়েছিল কেনাকাটায়। দেবপ্রসাদ চিরাচরিত দৃশ্যে একভাবে ছিল। সস্তার বাংলা একাঙ্কের মামুলি মঞ্চসজ্জার মধ্যে। সেই তেপায়া টেবিলে দাবাবোর্ড, পুরোনো ইজিচেয়ার আর ক-টা খবরের কাগজ। দু-জনের কুড়ি মিনিটের সাক্ষাৎকারের পনেরো মিনিট চলে যায় ববি ফিশার আর বরিস স্প্যাককি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের মতো। দুই গুরুগম্ভীর প্রতিদ্বন্দ্বী বোর্ডে ঝুঁকে, থুতনিতে হাত, নিবিষ্ট চোখ—এমন ক্লোজ-আপ। বাকি পাঁচ মিনিটের ইতস্তত কথোপকথন ছিল এই ধরনের—

—তাহলে তুমি দাবা জান একটুআধটু?

—অল্প। আর, তাতেই বুঝেছি, আপনি তেমন জানেন না।

—সুমির দিকে দেখছি কিছুটা এগিয়েছ।

—আমি একা এগোলেই কি হবে?

—সেটা পরের কথা। তোমার সাহস বলিহারি। এমন চেহারা নিয়ে এগোলে কী করে!

—চেহারা দিয়ে কিছু হয়? চেহারা ক-দিন থাকে?

—ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ম্যাচ করার মতো?

—তা দিয়েই-বা কী হয়?

—হবে না। কিছু হবে না। আমার আপত্তি আছে। এ-সম্পর্ক হওয়ার নয়, টেকার নয়।

—সে-কথা না-হয় সুস্মিতাই বলুক।

—সে বলুক। কী বলবে আমি জানি। তবে, তোমায় মানাবে না।

—তা ঠিক। একসঙ্গে বেরোলে লোকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকবে। পরে অভ্যেস হয়ে যাবে, মেনে নেবে।

—নেবে?

—আপনার মেয়ে বলে যখন মানতে পেরেছে, আমারটাও পারবে।

আঁতে লাগে দেবপ্রসাদের। বহু পুরোনো ফোঁড়া ফেটে যায় যেন। সে গুম হয়ে যায়, তারপর কিস্তি দেয়। সুরঞ্জন বলে, "ওই ঘর থেকে মন্ত্রী সরবে না, রাজা ধরা আছে।"

প্রথম সাক্ষাৎকারে দেবপ্রসাদের মনে হয় ছেলেটা টেঁটিয়া। সুরঞ্জনের মনে হয় লোকটা আলস্যের চর্চা করতে করতে অ-সুখের সাধনা করছে। তিনটে বোড়ে, একটা ঘোড়া, একটা নৌকো খেয়ে এবং দুটো বোড়ে ও একটা গজ খুইয়ে সুরঞ্জন উঠে পড়ে। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অমীমাংসিত থাকে। দেবপ্রসাদ জানতে চায়, "নেক্সট কবে আসছ?" সুরঞ্জন ভাবে 'বাঞ্চোতটা পাগল', বলে, "শিগরই।"

দেবপ্রসাদের সঙ্গে কথোপকথনের বর্ণনা সুরঞ্জন

দেয়নি। সুস্মিতাও আগ্রহ দেখায়নি। বাড়ি এসেছিল, ফিরে গেছে, ব্যাস। পরের সাত দিনে দু-জনের দেখা হয় চার বার। সুরঞ্জন এগোচ্ছিল রাজধানীর গতিতে। প্রথম বার সুরঞ্জন বলে, "বলার দরকার নেই, জানি তোমার উত্তর হ্যাঁ।" দ্বিতীয় বার হাত ধরে। তৃতীয় বারে ফাঁকা দেখে জড়িয়ে ধরে। চতুর্থ বারে চুমু এবং বিপর্যয়ের শুরু। শরীর কেঁপে উঠল, সব রোমকূপ আবর্জনা সরিয়ে গরান গাছের শ্বাসমূলের মতো জেগে উঠল, কিন্তু, সুরঞ্জনের লালার স্বাদ পেতেই কেমন একটা প্রতিরোধ চাগাড় দিল। তখনই সে পেল পিঁপড়ে চিবিয়ে ফেলার রসালো নোনতা স্বাদ। দাঁতের স্পর্শে পেল সাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালা।

—"কী হল?" নির্লিপ্ত বাধা পেয়ে জানতে চায় সুরঞ্জন।

—কিছু না। অন্য কিছু করো। কথা বলো।

—তা না-হয় বলব, কিন্তু হলটা কী?

—"কিছু না, কেমন যেন পিঁপড়ের মতো কিছু একটা, কী যেন ..." থেমে যায় সুস্মিতা। নিজের কানেই নিজের গলা অচেনা শোনায়।

—"তোমার ফ্যামিলির কনস্টিটিউশানে গোলমাল আছে মনে হয়", দুশ্চিন্তায় পড়ে সুরঞ্জন। সে বলে, "আজ যাই। একটা প্রোজেক্টের কাজ আছে, অনেক রাত অবধি করতে হবে।"

সুস্মিতার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দিন সাতেক পর সকাল বেলায় অফিস যাওয়ার পথে সুরঞ্জন একটা খাম ফেলে সুস্মিতাদের লেটারবক্সে। ওপর থেকে দেখে সুস্মিতা। পাশের পুকুরে তখন টানা-জাল দেওয়া হচ্ছে। দেড়-দু কেজি সাইজের রুই-কাতলার সঙ্গে হাইব্রিডরা লাফাচ্ছে। সুরঞ্জন হাসিমুখে টা-টা করে। সুস্মিতা নীচে নেমে চিঠি নেয়। এটা রেজিগনেশন লেটার। ওই ফরম্যাটেই লেখা। এ-বার হাতের লেখায়। বক্তব্য—স্যরি। এটা হবে না। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি বেটার কাজ নিয়ে। ছ-মাস পর ওরা বিদেশ পাঠাবে। কতদিন থাকতে হবে জানি না। কেরিয়ারের এই পয়েন্টে কিছুতে জড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া রোজ বিকেলে দাবা খেলাও অসম্ভব। সুস্মিতার মনে হয়। ছেলেটা জেনুইন, হয়তো বিবেচকও। সুস্মিতার সঙ্গে সম্পর্ক টেকার নয়, বুঝতে পেরেছে শুরুতেই। বুঝতে পেরেছে অ্যান্টিক বাড়ি, ভূতুড়ে একাকিত্ব আর কুঁচুটে বাবাকে নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুস্মিতা এভাবে এখানেই থেকে যাবে। ধ্বংসের এই মায়া যাওয়ার না।

সুরঞ্জনকে আর দেখা গেল না। দেখার ইচ্ছেও করল না। দুঃখ কিংবা রাগ হল না। সুস্মিতা যে-অবস্থায় ছিল, সেখানে ফিরে গেল। মাস খানেকের একটা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সেরে। বলা যাবে না, তার মধ্যে প্রেমে চোট খাওয়ার ক্ষত রইল। ভালোবাসাই হল না, বেদনা কীসের! রয়ে গেল একটু অনভিজ্ঞতাজনিত অপমানবোধ। আর মনে হল ছেলেটার অ্যাপ্লিকেশন ও রেজিগনেশনের মধ্যে গ্যাপটা বড়ো কম। এরকম হলে কোনো কোম্পানিতে ওপরে ওঠা মুশকিল। সুরঞ্জনের দুটো চিঠি শহরের পুরুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুরঞ্জন চলে যাওয়ার পর সুস্মিতাদের বাড়িতে চিঠিপত্তরের ধুম লেগে গেল। বড়ো লেটারবাক্স উপচে

মেয়েকে কোলে নিয়ে চকোলেট খেতে খেতে সোফায় বসে সিনেমা দেখবে বউ এরকম কত স্বপ্ন দেবপ্রসাদ আজকাল দেখে। ঠিক স্বপ্ন নয়, চোখ খুলেও দেখে। আধোঘুমে দেখে, আধো-জাগরণে দেখে। সব স্বপ্ন এত মনোরম হয় না, দুঃস্বপ্নই বেশি। ঘুম আর জাগরণের ভেদরেখা আর তার নেই।

মাটিতে ডাঁই হয়ে গেল। হড়পা বানের মতো শূন্য থেকে চিঠির ঢল নেমে এল। ক্যুরিয়ার সার্ভিস, পাড়ার ছোটো বাচ্চা, কাজের মহিলা, পায়রার ঠোঁট, সরকারি ডাকপিয়োন, বিমা দপ্তরের এজেন্ট, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট—সম্ভাব্য যেকোনো পথে প্রেমপত্র উড়ে চলল সুস্মিতার উদ্দেশে। প্রেরকদের আবেদন একটাই —এবার আমাদের সুযোগ দেওয়া হোক। যথাসাধ্য চেষ্টা করব খুশি রাখার। স্বনামে-বেনামে, ঠিকানাসহ কিংবা ছাড়া সবরকম বৈচিত্র্যে। 'হ্যাঁ' হলে কী করতে হবে তার সিনেমাটিক নিদানও ছিল কিছু আবেদনপত্রে। জানালায় রুমাল বেঁধে রাখা, ছাদে নীল শাড়ি শুকোতে দেওয়া, বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে দোকানে যাওয়া কিংবা লাল টিপ লাগিয়ে কলেজ যাওয়া—এমন হাজারো বায়নাক্কা। স্তুতিতে ভরা কিছু চিঠিতে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার থেকে রবি ঠাকুর পর্যন্ত শব্দরাশি ঢুকে পড়তে থাকে বিপজ্জনক বানানে। প্রথম দিকের কয়েকটা খোলার পর সুস্মিতা আর ফিরেও তাকাল না। কিন্তু ফেলতেও মায়া হল। ঘরের বাইরে সে বানাল একটা বড়োসড়ো বাক্স, ব্যাঙ্কের চেক ড্রপ-বক্সের মতো। না-খোলা চিঠিগুলো জমতে থাকল সেই বাক্সে। মাস খানেক পর চিঠির সংখ্যা কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। শহর সব উন্মাদনা ভুলে আবার নিজস্ব একঘেয়েমিতে ফিরে এল। মামা-মাসিদের স্নেহ আর দুশ্চিন্তায় ভরা মাসিক আসা চিঠি অবশ্য বন্ধ হল না। সেগুলোর শেষদিকে অবধারিতভাবে থাকত ক-টা ছোটো বাক্য—"অনার্সের পর আর পড়তে হবে না। ছেলে দেখেছি। এ-বছরেই বিয়ে। বাবাকে ছেড়ে চলে আয়।"

সম্পর্ক না থাকলেও বাবাকে ছাড়া সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে মামার বাড়ি গেলেও তাৎক্ষণিক স্নেহ কুড়িয়ে ফিরে আসত। নিজের শহর, নিজের অন্ধপুরীতেই সে রয়ে গেল। দূরে যেতে হবে বলে এম.এসসি. ক্যানসেল হল। অনার্সটা ভালোভাবে শেষ করে সুস্মিতা একদম বসে গেল। ক্বচিৎ কলেজের কেউ আসত। কখনো-বা বিকেলের দিকে সে রাস্তায় বেরোত অকারণ, নতুন নতুন গড়ে ওঠা দোকান আর অচেনা ঘরবাড়ি দেখতে। এর মাঝে নানান দিক থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। আর দেবপ্রসাদ অসীম প্রতিভায় সেগুলো ভ্যাংচি দিয়ে চলল। যেটায় একটু পেকে ওঠার আশা থাকে, সুস্মিতা নিজেই কেঁচিয়ে দেয়। এভাবে বাপ-মেয়ের যৌথ প্রতিযোগিতায় সুস্মিতা বিয়ের সেরা সম্ভাব্য দিনগুলো পেরিয়ে যেতে থাকল। শহরের দুটো প্রজন্ম দূর থেকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ততদিনে সবাই জেনে গেছে এটা লাস্ট কেস। সৌন্দর্যের কী বিপুল অপচয়!

তিরিশ পূর্ণ হওয়ার পর সুস্মিতা এক সকালে পেপার হাউসে যায়। সে কিনল একটা বড়ো ব্ল্যাকবোর্ড, এক বাক্স চক ও ডাস্টার। দোতলার টানা-বারান্দার মাঝামাঝি বড়ো শতরঞ্চি বিছিয়ে, বাবার ইজিচেয়ার থেকে ঠিক তিরিশ ফুট দূরে একটা কোচিং ক্লাস খুলে বসল। শুধু নাইন-টেনের অঙ্কের ক্লাস। দেবপ্রসাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের টাকার দরকার নেই।" সুস্মিতা চুপ করে ব্ল্যাকবোর্ড টাঙাল, পরিপাটি করে মুছল চারপাশ। তারপর বলল, "আমাদের কাজের দরকার আছে", এটাও আকাশের দিকে তাকিয়ে, যা কিনা বহু বছরের মধ্যে বাবার সঙ্গে বলা তার প্রথম সম্পূর্ণ বাক্য।

চার

পুকুরঘাটের কিনারায় বসেছিল দেবপ্রসাদ। মাথার ওপর রঙিন ছাতা। ইটের উনুনে রান্না হচ্ছিল মাংস। কত বাচ্চা লুকোচুরি খেলছে, উড়ে যাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডাল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে, দূরে আকাশের তোরণ বানিয়েছে রামধনু। বাতাসে বরফের গন্ধ। একে শীত, তায় হঠাৎ বৃষ্টি। ডাক্তার আর দেবু ভদকার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দেখছিল হাওয়ায় কাঞ্চনের জোড়া পাতা কেমন প্রজাপতির মতো ডানা নাড়ে। প্রীতি একটা বড়ো পদ্ম পাতায় কষা মেটে নিয়ে আসে, "খালি পেটে মদ খেয়ো না, লিভার যাবে।" প্রীতিকে অবাক করে মাংসের ডেকচি থেকে ছিটকে বাইরের পড়ে চারামাছ। তখন পুকুরময় মাছ, কে যে মাংসে জল ঢেলেছিল না দেখে। কত অবাক কাণ্ডই-না ঘটে! লুডো খেলার ফাঁকে প্রীতি উঠে উনুনে শুকনো কাঠ গুঁজে দেয়, "আর পনেরো মিনিটের মধ্যে খাবার দিয়ে দেব। আগে বাচ্চারা।" আজ বড়োদিন, আজ

প্রীতির জন্মদিন। কী দেওয়া যায় প্রীতিকে? বড়ো চকোলেট আর রঙিন টিভি দিলে হয়। মেয়েকে কোলে নিয়ে চকোলেট খেতে খেতে সোফায় বসে সিনেমা দেখবে বউ—এরকম কত স্বপ্ন দেবপ্রসাদ আজকাল দেখে। ঠিক স্বপ্ন নয়, চোখ খুলেও দেখে। আধোঘুমে দেখে, আধো-জাগরণে দেখে। সব স্বপ্ন এত মনোরম হয় না, দুঃস্বপ্নই বেশি। ঘুম আর জাগরণের ভেদরেখা আর তার নেই। মদ খাওয়া নিয়ে প্রীতি আপত্তি করেনি ঠিকই, কিন্তু, মেটে চচ্চড়ি কখনো দেয়নি। কেননা, কোনো সিনেমা নায়কের মেটে খাওয়া দেখায়নি। রেল লাইনের পাশের ডোবাগুলোয় শালুক আর পদ্ম ফুটে থাকতে দেখেছে সে, কিন্তু পদ্ম পাতায় সে কখনো খায়নি। তবে দিনরাত দেবপ্রসাদ কিছু-না-কিছু দেখে। প্রীতি বেঁচে থাকতে এসবের অর্ধেক দেখলেও বিজ্ঞাপন করার মতো সুখী পরিবারের কর্তা হতে পারত সে। ডাক্তার বলে, "এ-বয়সে এসব স্বাভাবিক। পেটভরা উইন্ড, মন-জোড়া ডিপ্রেশন, চোখময় অনিদ্রা আর অ্যাকাউন্ট-ভরতি টাকা নিয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মৃত্যুকে আটকানোর পদ্ধতি হিসেবে না-পাওয়া জিনিসগুলো, না-করা কাজগুলো স্বপ্নে ফিরে আসে। ঘুমটাই শুধু ফেরে না।"

—"ডাক্তার, তুমি আর ডাক্তার নেই, দার্শনিক হয়ে উঠেছ, লোকাল বাবাগোছের হয়ে প্রবচনও দিতে পারো।" দেবু ফোড়ন কাটে।

—"হবে হয়তো। কিন্তু মানুষ যত মৃত্যুর দিকে এগোয় তত পুরোনো কথা ফিরে আসে। মূল্যহীন কথাগুলো হঠাৎ আনন্দের একমাত্র উৎস হয়ে পড়ে। আমারও হচ্ছে। হয়তো আমিও মৃত্যুর ...", চুপ করে যায় চাঁদু।

সন্ধ্যের পর হুইস্কি খাওয়া দু-জনের অনেক দিনের অভ্যেস। গুনে গুনে তিন পেগ। ঠিক আটটায় শুরু। সাড়ে ন-টায় শেষ। বেশির ভাগ সময় একা একাই খেত দুই বন্ধু। যে যার বাড়িতে। কালেভদ্রে একসঙ্গে। ডাক্তারের চেম্বার শেষ হলে। ইদানীং রোজ একসঙ্গে বসা হচ্ছে। ষাটের পর দু-জনের বন্ধুত্ব বেড়ে গেল। এই সময় রোগীদের থেকে মন চলে গেল ডাক্তারের। অন্য সামাজিক যোগাযোগও কমে এল। তার মধ্যে যে পরিবর্তনটা হল, তা ভৌত, রাসায়নিক এবং সবমিলিয়ে কিছুটা আধ্যাত্মিকও। যদিও তার ধারণা, এখন অবশেষে সুস্থতার দিকে ভ্রমণ শুরু হয়েছে। এদিকে অনেক দিন প্রেশার, কোলেস্টরেল, থাইরয়েড এবং ডিপ্রেশনের ওষুধ বদলাতে বদলাতে দেবপ্রসাদ ততদিনে একজন অর্ধশিক্ষিত ডাক্তারে পরিণত হয়েছে। পুরোনো রোগীরা আকচার যেরকম হয়। ডাক্তারের রোগী হওয়া আর রোগীর ডাক্তার হওয়ার প্রক্রিয়া দু-জনকে মানসিকভাবে এক স্তরে এনে ফেলেছে। এখন, আটটার পর, সুস্মিতার টোল বন্ধ হলে শশা আর টমেটোর কুচি দিয়ে দু-জনে মদ খায়। কোনোদিন কথা হয়, কোনোদিন হয় না। একদিন তিন পেগের পর ডাক্তার বলে, "স্নেহ-ভালোবাসা না-হয় দিতে পারলে না, বাপ হয়ে মেয়ের সম্বন্ধগুলো কাঠি করলে কেন বলো তো? কোনো ভদ্রলোক এরকম করে?"

—কী জান ভাই, মেয়েটা চলে যাবে, অন্য পুরুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবে, ভাবলেই বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগত। অত সুন্দর পরির মতো মেয়েটাকে কোথাকার কোন অচেনা ছেলে খুশি করবে ভাবলে নিজেকে অপদার্থ মনে হত। একা একা কীভাবে যে থাকব!

—তুমি মানসিক বিকারগ্রস্ত। ওভাবে একাকিত্ব কাটে? কেটেছে? উলটে মেয়েটার সর্বনাশ হল, একদম হাতের বাইরে চলে গেল। মেয়ে অন্য পুরুষের, অন্য পুরুষও মেয়ের। তার মাঝে তুমি কে হে।

— বটেই তো। আমি একটু অদ্ভুত, মানছি। কিন্তু সব মানুষই কি অদ্ভুত নয়? আচ্ছা, যদি কাল সকাল থেকেই চেষ্টা করি, এখনও তো বিয়ের বয়স চলে যায়নি, হবে না? ওই যে বলে না, যখন জাগবে তখনই সকাল।

—না হে, হবে না। এত রাতে জেগে উঠলে সকাল ফুট করে পালিয়ে যায়। তুমি একবগ্গা মাথাভারী ঘুড়ির মতো, সর্বদা মাটির দিকে গোত্তা মার। কিছু মানুষ ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্টেশনে পৌঁছে হাঁকপাঁক করে, তুমি সেরকম। ট্রেনের ক্ষেত্রে তারপরও একটা পার্সেন্ট রিটার্ন পাওয়া যায়, লাইফে হয় না হে।

একমত হওয়ার জন্য দু-জনের মতবিরোধ চলতে থাকে। এটা ওদের মদ্যপানের প্রধান সঙ্গী, তা উসকে

দেওয়ার জন্য কিছু-না-কিছু উপকরণ এসে যায়। যেমন, ট্রেনের কথায় এল ট্রেন। জোর হুইসেল বাজিয়ে। গুমগুম করে বাড়ি কাঁপিয়ে পেছন দিয়ে চলে যাওয়া শোনে দু-জনে। দূরের গাড়ি। মদ খেলে দেবপ্রসাদের অনুতাপ না হলেও রসবোধ বাড়ে। সে বলে, "আচ্ছা ডাক্তার, ট্রেনের কথায় ট্রেন এল, বিয়ের কথায় পাত্র আসবে না কেন?"

—হয়তো আসবে, কিংবা, আসবে না। এলেই-বা কী, ট্রেনের মতো সেও তো বাঁশি শুনিয়ে চলে যাবে।

বয়স বাড়লে স্মৃতিচারণের ঝোঁক বাড়ে, এটা বিপজ্জনক রোগ। যে-অসুখে মানুষ মনে করে সে একটা ঘটনাবহুল জীবন কাটাতে পেরেছে। দুই বন্ধুর স্মৃতিকাতরতা নেই, তাই বিশেষ বিষয়ও নেই। না পরনিন্দা, না শেয়ার মার্কেট, না যৌন-অতৃপ্তি, না মার্কেজ-কুন্দেরা-দেরিদা-চমস্কি। নেই জিডিপি, নেই চাইল্ড লেবার, নেই জেনেরিক মেডিসিন, নেই ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। রিসেশান নেই, পরস্ত্রী নেই, ওবামা-ইরান নেই, এমনকী সংবাদপত্রও নেই। শুধু আছে এই শশা-টমেটো-হুইস্কি। ফুরিয়ে গেলে রিপিটেশান। কোটা ফুরোলে যে যার কোটরে ফিরে যায়। বিষয়হীন বন্ধুত্বে কীভাবে যেন দু-জনের নির্ভরতা বেড়ে গেছে। শব্দে আর কত সম্পর্ক হয়! দুই বন্ধুর আজ নেশা খুব। নিয়ম ভেঙে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে। দেবপ্রসাদ ছোটো হয়ে আসা চোখে বরফজল দেয়। পুরোনো সেই প্রশ্নটা তাকে আবার জ্বালাচ্ছে, কথাটা পেড়েই ফেলে সে—"কিছু যদি মনে কর তো একটা কথা ..."

—ন্যাকামো না করে বলো, ভণিতা ভালো লাগে না।

—সুস্মিতা কি সত্যিই আমার মেয়ে? তুমি বিশ্বাস কর?

—সেটা জরুরি? তিরিশ বছর আছ, এটা বেশি জরুরি নয় কি? এত বছর পর এসব কথা কেউ বলে? বরং ভাবো আরও ভালো করে কেন থাকনি, থাকা যায় কি না।

—তা নয়, প্রীতি অন্য কারোর সঙ্গে শুয়েছিল কি না সে-কথা বলিনি। সে নিয়ে কে ভাবে। আমার যেন আজকাল মনে হয়, ভাবলে বোধ হয় অনেক কিছু হয়। সংগমের সময় যদি কেউ অন্যের কথা ভাবে তাহলে জিনের গঠনের পরিবর্তন হতে পারে? কেমন সন্দেহ হয়। মনে হয়, ডাক্তাররা ফালতু কথা বলে।

—সে-সন্দেহ আমারও হয়। এত বছর বিজ্ঞান ছাড়া কিছু ভাবিনি, তবু এখন মনে হয় যুক্তির বাইরে বহু কিছু হয়। মনের যে কী ক্ষমতা আমরা বুঝিনি। এটা একা একা বুঝতে হয়। সে-কারণেই হয়তো এড়িয়ে চলেছি। আমরা দল বেঁধে একা থাকি, একা একা দল হই না। কি জানি কীসে কী হয়!

—তার মানে তুমি বলছ ভাবলেই সন্তান হয়? কল্পনার জিন থেকে পরি হয়?

—"হয়তো। পুরাণে তো হত। ঠিকভাবে ভাবলে কি না হয়, পৃথিবীটাই মনের মতো হয়ে যায়। আন্তরিকভাবে বৃষ্টির কথা ভাবো, দেখবে বৃষ্টি এসে যাবে।" ডাক্তার শশার টুকরোয় নুন লাগায় আনমনে।

—"তার মানে দেবানন্দ কিংবা রাজেশ সত্যিই সুস্মিতার বাবা হতে পারে?" দেবপ্রসাদের ওয়ান পয়েন্ট অ্যাজেন্ডা।

এবং, প্রত্যেকের কোনো-না-কোনো রাতের সঙ্গিনী ছিল সে। স্বপ্নে, দুঃস্বপ্নে। ছাত্রপ্রাপ্তি পরোক্ষে তার গতরসুষমার ডিভিডেন্ট। সেইসব পুরুষরা শেষপর্যন্ত সুস্মিতার কাছে আসতে পারল। এভাবে এসে কী হয়? কার যে কীসে এবং কীভাবে হয়!

হলেই-বা কী! চোখের সামনে ফুটফুটে একটা বাচ্চা তিরিশ পেরিয়ে গেল, তাকে নজরে পড়ল না? মনে ধরল না? তুমি বাপ, সুস্মিতা মেয়ে—এই সহজ কথাটা বুঝতে অসুবিধা কোথায়। বাবা হওয়ার মতো সরল কাজটা কি শুধু ওই এগারো মিনিটের শোয়াশুয়িতেই শেষ? কেমন কিসিমের মানুষ তুমি! দমবন্ধ পরিবেশটা তুমি এন্‌জয় করো মনে হয়।

—বোধ হয় করি।

—সঙ্গমের সময় কখনো অন্য মেয়ের কথা ভেবেছ দেবু? সবাই ভাবে। সেই যুক্তিতে প্রীতির অপরাধ কোথায়?

—ভেবেছি। আমার ভাবনায় আশপাশের মেয়ে ছিল। এর মাসি, ওর পিসি, বন্ধুর বোন, কলেজের মেয়ে, স্কুলটিচার ছিল। সে বাচ্চা এরকম হত না। সব এলেবেলে মেয়ে। মধুবালা, নার্গিস, সুচিত্রা বা ওয়াহিদা কখনো আসেনি। তাই আমার দায় নেই।

—ছাড়ো তো ওসব কথা। বাকি ক-টা দিন আর মেয়েটাকে জ্বালিয়ো না। তোমার মন নরকের দিকে, ওকে আর গাড্ডায় টেনো না।

দেবপ্রসাদের বেশ নেশা হয়েছে। তার মাথায় এসব ঢোকে না। ডাক্তার টলোমলো করে ওঠে। সিঁড়ির রেলিং ধরে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। দেবু চায় সব সংশয়ের অবসান, "বি স্পেসিফিক ডাক্তার, দেবানন্দ না রাজেশ।" ঘোলাটে চোখে অবাক হয়ে ফিরে তাকায় ডাক্তার—কী মানুষ রে বাবা! সে নামতে থাকে, উত্তর দেয় না। আবার একই প্রশ্ন আসে। ডাক্তার তখন দশ নম্বর ধাপে।

হেলতেদুলতে সে উত্তর দেয়, "দু-জনের কেউ নয়।"

—"তাহলে কে?" দেবুর গলা অশ্রুভেজা।

—"দাদাসাহের ফালকে।" চাঁদুর স্বর উইংসের আড়ালে মিলিয়ে যায়।

রাতে ঘুম হয় না দেবপ্রসাদের। এ-বয়সে ঘুম কমে আসে।

সারাদিন যে শুয়ে-বসে কাটায় তার ঘুম আসবেই-বা কেন। দেবপ্রসাদ ঘরে খুটুর খুটুর করে। কীভাবে রাত কাটাবে সে বুঝতে পারে না। পশ্চিমের জানালা খুলে সে স্টেশন দেখে। দেখে ঋতুভেদে তার চরিত্রের বদল। সিগন্যালের আভায় দেখে ধোঁয়া ও ধুলোর পরিবর্তন। আলমারি খুলে পুরোনো অ্যালবাম দেখে। ইন্সিয়োরেন্সের কাগজ ঘাঁটে। ছোটোবেলার জীর্ণ হয়ে যাওয়া ছড়াছবির বই সে ফেলেনি, সেগুলো খোলে। দেখে একটা বইয়ের মাঝে সিন্ডারেলা সেজে সুস্মিতা বসে ললিপপ খাচ্ছে। পাশে বসে নারকোল কুড়োচ্ছেন মা। আর, পেঁজা মেঘের মতো নারকোল-কোরা দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছেন বাবা। দেবপ্রসাদের মন খারাপ লাগে। আলমারির নীচের তাকে চায় সে। বিমা কোম্পানি বছর-বছর ডায়েরি পাঠিয়ে গেছে। কোরা কাপড়ের মতো অব্যবহৃত রয়ে গেছে সব। সুস্মিতাকে দিয়ে দিলে হয়। অঙ্কের সাজেশান লিখবে না-হয় ব্যাচ ধরে ধরে। তারপর মনে হয় ডায়েরিগুলো তাকে ডাকছে—লিখেই দেখো না, আমি তো এখনও অপেক্ষায় আছি। কোনোদিন যা ভাবেনি, চিরকাল যা অপছন্দ করেছে, আজ মাঝরাতে, নিশির ডাকের মতো ভূতগ্রস্ত দেবপ্রসাদ সেই কাজ শুরু করে। বালিশ সরিয়ে বিছানায় ডায়েরি খুলে বসে। সেও শেষপর্যন্ত ডায়েরি লেখা শুরু করল পরিবারের ধারা বজায় রেখে। যথারীতি দিনলিপি নয়, আংশিক আত্মকথন। যেখানে সত্য ও মিথ্যা, বাস্তব ও অবাস্তব একাকার। এবং, সবমিলিয়ে ব্যর্থতার এলোমেলো অজুহাতমালা। উৎসর্গপত্রের মতো একটা পাতা ছেড়ে শুরু। সে-পাতার মাঝে মহাপুরুষের বাণীর মতো সে লেখে—জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনন্দ খুঁজে পাওয়া। সবচেয়ে সহজ কাজও এটা। তবু মানুষ তা পারে না। কারণ সহজ কাজ করা সবচেয়ে কঠিন। যখন একজন সেটা উপলব্ধি করে তখন তার সময় ফুরিয়ে আসে। বাবা নিজের ঘোরে থাকতেন, আমার দিকে তাকাননি। স্ত্রী নিজের ঘোরে থাকত আমার দিকে তাকায়নি। মেয়ে নিজের ঘোরে আছে, আমার দিকে তাকায় না। আমি আমার ঘোরে থেকেছি, কারো দিকে তাকাইনি। সবচেয়ে দুঃখের হল, কেউ নিজের দিকে আসলে চায় না। যেটুকু সময় আছে চেষ্টা করে দেখি।

চেষ্টা করার মতো সময় তার ছিল না। তবু সম্ভাব্য বিষয়বস্তুর তালিকায় সে ভাবে—আমি, আমার বাবা,

আমার মা, স্ত্রী, আমার মেয়ে এবং ছেড়ে আসা জমি—এরকম কটা অধ্যায় লিখবে। আর অবশ্যই বড়োসড়ো করে লিখবে 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস'। যে-বিষয়টা তার একদম অজানা, যে তাকে আততায়ীর মতো বিপন্ন করেছে, তার যৌবনকে বিভ্রান্ত করেছে।

সিনেমা আমাদের প্রভাবিত করেছে, না কি আমরা সিনেমাকে প্ররোচিত করেছি, জানি না। সবরকম গল্প নিয়ে ছবি হয়। তারপর সবাই গল্পের মতো জীবন কাটায়। আমাদের পরিবারকে নিয়ে সিনেমা বানানো সহজ হবে না। তা সবার জন্য হবে না। কেননা, আমরা আর্ট-ফিল্মের জীবন কাটিয়ে গেলাম। সিনেমার শুরুটা এমন ছিল না, অন্তত দাদাসাহেব ফালকে এভাবে ভাবেননি। নিজেকে ভুলে মানুষ ছবির মায়ায় এতটা জড়িয়ে পড়বে বুঝতে পারেননি।

দেবপ্রসাদ লিখেই চলল। প্রতিরাতে কিছু সময়। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে। কখনো জানালার ধারে যায়। কখনো টেবিলে বসে। কখনো বিছানায়। বাবার মতো ঘুরে ঘুরে সে লিখে চলল। কিছুদিন পর সব বিষয় গুলিয়ে গেল। জ্বরের বিকারে, দুঃস্বপ্নে খড়ের গাদায় ডুবতে ডুবতে পাঁকে তলিয়ে যাওয়ার মতো। অধারাবাহিক ও পারম্পর্যহীন টালমাটাল লেখায় ভরে গেল অনেকগুলো ডায়েরি। দেবপ্রসাদ লিখত আর তা লুকিয়ে রাখত বন্ধ আলমারিতে। এই প্রক্রিয়া থামল মাঝারি মাপের সেরিব্রাল অ্যাটাক তাকে পেড়ে ফেলায়। একেবারে থামাল না। জড়ানো জিভে পা টেনে চলা জবুথবু এমন এক বৃদ্ধে পরিণত করল যে, বাকি সময়টা পরবর্তী অ্যাটাকের আশঙ্কা ও অপেক্ষায় কাটাবে। আর, যখন-তখন ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলবে যেকোনো ছুতোয়।

পাঁচ

সুস্মিতা ভাবেনি শুরুতেই কোচিং ক্লাস ভরে উঠবে। সবাই খোঁজে অভিজ্ঞ স্কুলশিক্ষক। মনে হয়েছিল হাতে গোনা কয়েক জন আসতেও পারে। পড়াতে পড়াতে সে পাকাপোক্ত হবে। একটা বছর ভালো রেজাল্ট হলে কাজটা জমবে। যদিও জমা নিয়ে তার উদ্বেগ ছিল না। রোজগারটা জরুরি নয়, ব্যস্ততা প্রয়োজন। এভাবে অন্য একটা আইডেন্টিটিও হোক। কিন্তু সুস্মিতা অবাক হয়ে দেখল কী দ্রুত তার পড়ানোর ইচ্ছে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছেলে-মেয়েদের বাবা-কাকা-দাদা-পিসে-মেসোদের ভিড়। আশ্চর্য প্রদীপের ঘষায় দুটো ব্যাচ ভরতি হয়ে গেল। সপ্তাহে তিন দিন। সন্ধ্যে বেলা দু-ঘণ্টা। আনকোরা অবস্থায় এই অভাবিত ঘটনার কারণ সে বুঝতে পারল অভিভাবকদের দেখে। এসবই তার কম বয়সের ক্যারিশমার ফসল। সবাই চেয়েছিল সুস্মিতাকে ভুলে যেতে। পারেনি। নিজেদের সময়কে মনে রাখতে গিয়ে দেখা গেল সুস্মিতাকে মনে রাখতেই হচ্ছে। প্রকাশ্যে কে আর ব্যর্থতা খুঁড়ে তোলে। ততদিনে সেইসব পুরুষদের জীবন মাঝনদীতে স্থির নৌকার মতো হয়ে গেছে। কিন্তু ওই যে বলে 'নিম্নে সংলগ্ন অস্থির স্রোত বয়'—সুস্মিতা তাদের হৃদয়ে বিঁধে ছিল অধরা আলেয়ার মতো, থেকে গেল কঠিন পাথরের নীচে দগ্ধ লাভা হয়ে। স্মৃতিবিদ্ধ অভিভাবকদের গলে পড়া ভাব দেখে সুস্মিতা বুঝতে পারে এদের কেউ কেউ সুরঞ্জন- পরবর্তী পর্বের পত্রপ্রেরক। অনেকে সাইকেলে অনুসরণ করত। চায়ের দোকানের অস্থির পায়চারির, দক্ষিণের জানালার বাইরের দর্শনার্থীদের দেখতে পায় সে। অনেকে পশ্চিমের ট্রেন যাওয়া দেখেছে সুস্মিতার সঙ্গে সুস্মিতার অগোচরে। এবং, প্রত্যেকের কোনো-না-কোনো রাতের সঙ্গিনী ছিল সে। স্বপ্নে, দুঃস্বপ্নে। ছাত্রপ্রাপ্তি পরোক্ষে তার গতরসুষমার ডিভিডেন্ট। সেইসব পুরুষরা শেষপর্যন্ত সুস্মিতার কাছে আসতে পারল। এভাবে এসে কী হয়? কার যে কীসে এবং কীভাবে হয়! সুস্মিতা অভিভাবকদের বলে, "মাসে একবার প্রগ্রেসের খোঁজ নেবেন।"

পড়ানো শুরুর প্রথম রাতে ঘরের প্রমাণ সাইজের আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখে দিদিমণি। শুধু শায়া পরে। অন্যকে দেখার মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পুরুষদের মতো কিছুটা উত্তেজিত হয়, একটু লজ্জাও পায়। সে তাহলে নার্সিসাস ও মেগালোম্যানিয়াক। আগে তো বোঝা যায়নি। একইসঙ্গে বুঝতে পারে তার ম্যাজিক এখনও অটুট। যেকোনো হৃদয়ে প্রতিবিম্ব তৈরিতে

তার শরীর আরও পারদর্শী হয়েছে। এ-দেশে পুরুষরা চর্বির অল্প পরত পছন্দ করে। তবে, এই অমোঘ টানের কারণ শুধু শরীর নয়, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, যে-অতৃপ্তি ঘুরপথে তাকে দিয়েছে টোলভরা ছাত্র। বড়ো চাদিহা তাদের আর নেই। নিজেদের জীবনের একটা চ্যাপ্টার একটু অন্যভাবে রিভাইস করা, এই যা।

আলো নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বালে সুস্মিতা। ভেতরে কিছু পরে না, শাড়ি জড়ায় হালকাভাবে। তারপর পশ্চিমের জানালাদুটো খুলে দেয়। সাড়ে দশটার পর এই সময়টা সুস্মিতাকে কী যেন ভর করে। আধঘণ্টা ঠায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে জানালায় ভর দিয়ে। দেখবে দূরের ট্রেনের দূরে চলে যাওয়া। কোনো পুরুষের সঙ্গে তার কখনো প্রেম হয়নি। দশটা পঞ্চাশের মেল ট্রেনের সঙ্গে কীভাবে যেন জড়িয়ে পড়েছে। অন্যগুলো ভালো লাগে। তবে এর কথাই আলাদা। হয়তো আলাদা নয়, মন আর শরীর মেনে নিয়েছে তাই ভিন্ন। দূর থেকে বাঁশি শোনে সুস্মিতা। সে বুক চেপে ধরে জানালার শিকে। পাতলা শাড়ির নীচে কিছু নেই। প্রথম ও তৃতীয় শিক বৃন্ত ভেদ করে তার দুই স্তনে ধারালো দাগ করে দেয়। দুটি সমান্তরাল লাল গাঢ় রেখা। অল্প ব্যথা লাগে। সুস্মিতার ভালো লাগে। ওই দূরে, বাঁ-দিকে রেললাইন বেঁকে গেছে। পাকানো কেন্নোর মতো প্ররোচনাময় অর্ধচন্দ্রাকার বাঁক। ক্যানেলের লোহার ছোটো ব্রিজের ওপর আওয়াজ শোনা যায়। সে এসে গেছে। সে খুব কাছে। আধো-অন্ধকার থেকে হঠাৎ সে ছিটকে বেরোবে। প্রথমে ভারী মুখ, তারপর গাছপালার অদৃশ্য সুড়ঙ্গ থেকে একটু একটু করে প্রস্ফুটিত হবে লাস্যময় শরীর। অনেকটা সময় নিয়ে সে যাবে। এ-সময় গোটা বাড়ি জেগে ওঠে। হরপ্রসাদ, প্রীতিলতা, আরও না-দেখা পূর্বপুরুষরা, বিগত দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ। কেউ তা জানে না। সুস্মিতা বোঝে। তখন হরর সিনেমার মতো এলোমেলো হাওয়া দেয়। দোতলায় তার জানালার কাছে মখমলের কার্পেটে চড়ে কেউ আসে। তার মুখ দেখা যায় না। সুস্মিতা বলে, "ট্রেন যাক, তারপর এসো।" আওয়াজ বাড়িয়ে ট্রেন আসে, শব্দ কমিয়ে সে চলে যায়। আবছা আলোয়। সুস্মিতা দেখে গার্ড সবুজ লণ্ঠন দোলাচ্ছে। হয়তো তার জন্য। কখনো সে-গার্ডকে সুস্মিতা দেখেনি। রোজ এক গার্ড থাকে না। তবে লণ্ঠন-ধরা ওই হাত যদি আজ রাতে তার শরীরে হাত দিত সে অখুশি হত না। এ-দিন একটু বেশিই হল সব। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে গোটা শরীর জুড়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি। সম্পূর্ণ অচেনা অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ। কাঁপতে থাকা সুস্মিতার কাঁধ থেকে এলোশাড়ি পড়ে গেল। আগে কখনো এরকম হয়নি। কে যে শরীর উলটেপালটে দিল। যতক্ষণ-না ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে হারিয়ে গেল, তত সময় ধরে চলল এই আশ্চর্য কাণ্ড। সুস্মিতার জীবনের প্রথম অর্গাজম। তাহলে এর জন্য পুরুষই একমাত্র উপাদান নয়! ভেতর-বাইরে সম্পূর্ণ সিক্ত অবস্থায় মেঝেতে বসে রইল সুস্মিতা। অনেকক্ষণ, চোখ বুজে। গলা দিয়ে, বুক দিয়ে, নাভি দিয়ে, ঘাড় দিয়ে গোটা শরীরের সব জল নেমে যাচ্ছে পৃথিবীর ভরকেন্দ্রে। কিছু আর আয়ত্তে নেই, অথচ ভালো লাগছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রতিটা স্নায়ু। কখনো আত্মরতিতে এরকম হয়নি। এর কাছাকাছিও না। অনেক দূরে সেকেন্ড পজিশনে রাখা যায় সুরঞ্জনের সেই অ্যাপ্লিকেশনের দিনের কথা। কিন্তু, সে তো প্রতারণার পূর্বাভাস। এ-ক্ষেত্রে তৃপ্তি অনেক গভীর, প্রেমিক ততোধিক বিমূর্ত।

ঘুমোনোর সময় সুস্মিতার মনে হল সে বোধ হয়

রাতে পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে ট্রেন দেখা, প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকা। দুপুর বেলায় ফাঁকা রাস্তা দেখা। রোদ মেঘ পোস্টম্যান দেখা। ভিখারি, রেডিয়ো, পাখিদের শোনা। রোদের তাত, বৃষ্টির ছাট, শীতের আমেজ নেওয়া।

স্বাভাবিক নয়। তার শরীর নির্জীব চিঠি, ট্রেনের হুইসল, গার্ডের লণ্ঠনে সাড়া দেয়, কই সামনে থাকা পুরুষে তো কিছু হয় না। ছোটোবেলায়, সেই যৌনকৌতূহলের বয়সে যখন তুতোভাইরা কিংবা তাদের বন্ধুরা গায়ে হাত দিয়েছে কিছু হয়নি। কেউ অন্ধকারে বাড়াবাড়িও করেছে, কিছু তো হয়নি। সে ভাবে বাবার সঙ্গে লড়তে লড়তে সেও বাবার মতো খানিকটা বিদঘুটে হয়ে পড়েছে। যে যার বিরোধিতা করে সে নিজেও কি প্রতিদ্বন্দ্বীর জটিলতার অংশ হয়ে পড়ে?

শুরুর সময় সুস্মিতা বুঝতে পারে স্টুডেন্টদের বাবা-কাকা-দাদাদের গভীর পিরিত ক্ষণস্থায়ী। রেজাল্ট ভালো না হলে সব এক মরসুমে উবে যাবে। এবং, শুরু হবে চরিত্রহনন। ও-মেয়ে আবার টিচার হবে? রূপ দিয়ে কি অঙ্ক হয়? মাথা লাগে। সুস্মিতার মাথার অনেকটা পৈতৃকসূত্রে দুর্বোধ্য গলিঘুঁজিতে যাতায়াত করলেও অঙ্কের মাথা বরাবর ভালো। সে ঠিক করে ইলেভেন-টুয়েলভ নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত মাধ্যমিকে হাত পাকুক। তার জন্য নিজের মতো একটা সহজ ছক বানাল। ভালো আর মাঝারি ছাত্রদের আলাদা আলাদা স্কিম। দুটো বছরকে সে ভরে ফেলল একটা হ্যান্ডি ক্যাপসুলে—অবজেকটিভ থাকবে ১৮ নম্বর। বেছে ৭০-৭৫টা করালে মার নেই, ভালোরা ১৭, অর্ডিনারিরা ১৫ নিশ্চিত। দু-ক্লাসের জ্যামিতির পঁয়ত্রিশটা উপপাদ্যের পনেরোটা করলে ১২ নম্বর ছাঁকা। দুটো কমন পাবেই। সম্পাদ্য মাত্র সাতটা, তার একটা আঁকতে হবে। হয়ে গেল আরও ছয়। ভালোরা ছাড়া একস্ট্রাগুলো পারবে না, তাই চার নম্বরের দুটো বাদ। অ্যালজেব্রায় পাঁচ রকমের উৎপাদক প্র্যাকটিস করাতে হবে, তিরিশটা অঙ্ক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তিনটের মধ্যে যেকোনো দুটো। তিন তিন ছয় সিয়োর। তুলনামূলক, পরিবর্ত, অপনয়ন আর বজ্রগুণন শুনতে যত বিটকেল, করা ততই সহজ। অসমীকরণ সবার মাথায় ঢোকে না, ওটা গ্রাফের সঙ্গে অথবা থাকবে। গ্রাফ ভুল করা যায় না। তাহলে আরও ৬। অনুপাত-সমানুপাত ভালোদের কাছে জলভাত, মাঝারিরা পুরো নম্বর পাবে না। করণী সবাই পারে। অ্যালজেব্রায় প্রশ্নের অঙ্কের ৪ নম্বর নিয়ে সংশয় থাকবে। সেটা ছাড়লে ২১ নিরাপদ। পাটিগণিতে বড়ো অঙ্ক থাকবে। ৬+৬। শতকরা, সরল সুদ আর অংশীদারি কারবার করলে পেরে যাবে। ত্রিকোণমিতির হাইট অ্যান্ড ডিসটেন্সের অঙ্ক শক্ত। ওটা ভালোদের। পরিমিতিও ওদের। একটু বুঝলে ৮ মার্কস। ছক অনুযায়ী মাঝারিদের ৬৫-৭০ এবং ভালো ছাত্রদের ৮৫-৯০ সম্ভব। সুস্মিতার বিশ্বাস সাফল্য একমাত্র অনুশীলনে আসে। তাও তার ছক মেনে। নিজের ধারণাকে রূপ দেওয়ার জন্য সুস্মিতা সাত দফা নিয়মাবলি করল: ১. ছাত্রদের বাড়ি না যাওয়া, বিশেষ নিমন্ত্রণেও না। ২. অভিভাবকদের সঙ্গে রাস্তায় কথা না-বলা। ৩. বেডরুমে সবাই ব্যানড, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীও না। ৪. মাসিক পরীক্ষায় ফেল করলে পড়ানো হবে না। ৫. উৎসবে আদিখ্যেতা চলবে না। যেমন, দোলের বিকেলে আবির চলতে পারে, কিন্তু পায়ে, তার ওপরে নয়। ৬. টিচার্স ডে-তে সবাইকে আসতে হবে, খাওয়াবে সুস্মিতা। গিফট আনা যাবে না। ফুল বা সস্তার পেন অ্যালাওড। ৭. প্রতিটা ছাত্র মাসে একদিন ক্লাস নেবে। দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে। সে-দিন সুস্মিতাও স্টুডেন্ট।

এইসব নির্ভুলভাবে করার জন্য সুস্মিতা একটা স্টাইলিশ ও গম্ভীর চশমা কিনল ও.কে. অপটিক্যালস থেকে। সেক্স অ্যাপিল কমে এল সম্ভ্রমের পরশ। প্রথম বছরে সুস্মিতা মায়েদের আস্থা পেয়ে গেলও—না, মেয়েটা ভালো, বেটাছেলেগুলোই মেনিমুখো। দ্বিতীয় বছর সুস্মিতার কাছে লম্বা লাইন। অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হয় ভরতির জন্য। তৃতীয় বছর একটা এডুকেশন ওয়ার্কশপে শিক্ষার পদ্ধতিগত সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখে দিদিমণি। চতুর্থ বছর রিজার্ভেশনের দীর্ঘ লাইনের পেছনে ম্যাডামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টেশনমাস্টার বলে, "আমার ঘরে বসুন, আমি কেটে দিচ্ছি।" সুস্মিতা বলে, "তা কী করে হয়, এত লোক সামনে, না-হয় একটু দাঁড়ালাম।" অভিভূত স্টেশনমাস্টার গলা তুলে 'এই না হলে টিচার' বলায় সবাই ঘুরে তাকায়। তখন সুস্মিতার আইডেন্টিটি এস্টাবিলস্ট। পঞ্চম বছরে সুস্মিতার পিরিয়ড ইরেগুলার হয়ে পড়ে অকালে। নদীনালার মতো এটাও কি অব্যবহারের ফলে অকালে বন্ধ হয়, এরকম সন্দেহের মধ্যে আঠারো দিনের মাথায় হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে, কোমর-তলপেট ভেঙে পড়ে ব্যথায়, খুলে

যায় ঋতু। পাঁচ বছরের মধ্যে সেই প্রথম ক্লাস বাতিল করে সুস্মিতা। সে-সন্ধ্যায় এক ছাত্রের মা আসে দেখা করতে। সাঁচিস্তূপের মতো চেহারা, কী করে যে নড়াচড়া করে! সুস্মিতার ভাবনার মাঝে মহিলা শুরু করে, "কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা বলি।"

—বলুন। মনে করলেই-বা কী।

—এবার তুমি একটা বিয়ে করো।

—অনেকেই তো করে না।

—সে না করুক, তা-বলে তুমি করবে না কেন? দেরি অনেকের একটু হয় বটে ... তবে, সময় যায়নি ... ওই যে কথায় আছে, যে-নারীর পুরুষ নাই...

—"অনেক মেয়ের থাকে না।" কড়া চোখে তাকায় সুস্মিতা।

—"ও-কথা থাক। এই ফোটোটা দেখো।" হ্যান্ডব্যাগ থেকে পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বের করে পল্লবের মা।

সুস্মিতা দেখে পুরু গোঁফের এক যুবকের ছবি। স্টুডিয়োয় তোলা, পেছনে ঝুলছে গুলমার্গের বরফ।
—"এ তো বাচ্চাছেলে। এই আমার পাত্র না কি?"

—হ্যাঁ গো। ও মোটেই বাচ্চা নয়। আমার থেকে কত বড়ো, আমার বড়দা। এ তো এইটটি টু-র ছবি, যখন গ্র্যাজুয়েট হল, এখন টাক পড়ে গেছে। খুব ভালো লোক। তোমার চেয়েও বেশি টিউশনি করে, কলেজে পড়ায় তো। দোজবরে তোমার আপত্তি নেই তো।

সুস্মিতা হাসে। এইটটি টু-তে হরপ্রসাদ মারা যান, তখন সুস্মিতার সাত। সে ভাবতে চেষ্টা করে মানুষটাকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে। এক টেকো প্রৌঢ় এক ঘরে পড়াচ্ছে, তার পাশের ঘরে আরও এক-ঘর ছাত্র পড়াচ্ছে সুস্মিতা এমন দৃশ্য মাথায় এল। এবং, বরের ছাত্ররা গোপন প্রেমের সাধু প্রস্তাব দিচ্ছে আর বাতিকগ্রস্ত বর তাতে পাগল হয়ে যাচ্ছে, এরকম পরিণতিও দেখতে পেল। কথা হচ্ছিল খোলা বারান্দায়। ফলস ঝাড়বাতির নীচে। সে বলে, "ছেলেকে বলবেন পড়ায় মন দিতে, এবার চেপে খাতা দেখা হবে।"

—আর আমার কথাটা?

—কোন কথা?

—ওই যে দাদার ব্যাপারটা গো।

—ও হ্যাঁ, দাদাকে আমার প্রণাম জানাবেন। আমার হবে না।

সুস্মিতা উচ্চ-মাধ্যমিক শুরু করে পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে। মাধ্যমিকের ঠিক পাঁচ বছর পর। শুরুতেই জানিয়ে দেয়, এখানে জয়েন্টের জন্য তৈরি করা হয় না। যারা পিয়োর সায়েন্স পড়তে চায়, বিশেষত, যারা অনার্স ও মাস্টার্স বা পরে রিসার্চ করতে চায়, প্রেফারেন্স দেওয়া হবে তাদের। আর, ভরতি হতে হবে ইলেভেনেই, টুয়েলভে নয়। এ-শর্তেও দুটো ব্যাচ ভরে গেল। ব্যাচে আট জন। নতুন শিক্ষার প্রথম মাসেই বিপর্যয়—বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক। এই অসুখটা সাধারণত বাথরুমে অপেক্ষা করে। ছেলেরা তখন পড়ছিল। কোণের ঘরের লাগোয়া বাথরুমে লোহার বালতির বিকট শব্দে সবাই চমকে ওঠে। দরজা ভেঙে বের করা হয় দেবপ্রসাদকে। ভাগ্যিস ইলেভেনের ছেলেরা একটু ম্যাচিয়োর হয়। দিদিমণির সঙ্গে তারা ছোটে নার্সিংহোমে। আর.এম.ও. বলে, "ক্রিটিকাল কেস, বড়ো হাসপাতালে যান, এখানে ডেলিভারি কেস হয়।" তখন অক্সিজেন আর স্যালাইন লাগিয়ে নামি হাসপাতালে। ডাক্তার বলে, বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে বলা যাবে না। তার ডান হাতে ছিল সোনালি ঘড়ি। কেন একাত্তর বা তিয়াত্তর নয়? কেউ জানে না। একেই বোধ হয় আগেকার লোক বলত তেরাত্তির না পেরোলে বিশ্বাস নেই। চাঁদু ডাক্তার বিমর্ষ হয়ে গেল। সে তখন বাতের ব্যথায় কাবু। হাঁটু বেঁকে গেছে। সরাসরি এসেছিল গাড়ি নিয়ে। তার ধারণা, শেষ বন্ধুটা বোধ হয় গেল। কিন্তু দেবপ্রসাদ গেল না, ফিরে এল অংশত অসাড় ডান দিক আর জড়িয়ে যাওয়া জিভ নিয়ে। মামারা এসেছিল দেখতে, "মা তুই একদম একা হয়ে পড়লি, এবার চল।" শুনে সুস্মিতা সেবা শুরু করল। কেউ ভাবেনি সুস্মিতা এতকিছু করতে পারবে। ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ানো, রুটিনমাফিক চেক-আপ, দিনে দু-বার প্রেসার মাপা, ট্রেন্ড নার্স রেখে বাথরুমের কাজ বিছানায় করানো এবং শরীরের পরিবর্তন অনুসারে ডায়েট ও মেডিসিন নিয়ে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান চাঁদুর

পরামর্শ—দু-মাস চলবে এই শিডিউল। মাঝরাতেও উঠে উঠে দেখে পেশেন্ট ঠিক আছে কি না। দেবপ্রসাদ চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার ঠোঁট ফুলে ওঠে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে চলে। সুস্মিতা মুখ ঝামটা দেয়, "বেশি ইমোশনাল হোয়ো না, সব বিগড়ে যাবে।" কিছু বিগড়োল না। ফেরার পনেরো দিনের মাথায় খুলে গেল কোচিং সেন্টার। দু-মাসের মাথায় শুরু হল পুরোদস্তুর ফিজিয়োথেরাপি। ছ-মাসের গোড়ায় একটু একটু করে সাড় ফিরে আসল পায়ে। চাঁদু ডাক্তার প্রায়ই আসত, 'এই পুরোনো সিঁড়ি আর দুম্বো বাড়ি আমায় শেষ করে ফেলবে' বলতে বলতে উঠত, তারপর ইজিচেয়ারে গ্যাস শেষ হওয়া টিউবলাইটের মতো বসে থাকত। পকেট থেকে পাঁইট বের করলে জল, গ্লাস আর স্যালাড পাঠিয়ে দিত সুস্মিতা। হুইস্কি খেতে খেতে সে স্বগতোক্তি করত—দেবুর কপাল ভালো। ভাগ্যিস থ্রম্বোসিস হয়েছিল, হেমারেজ হলেই কেল্লা ফতে। মেয়ের পুণ্যিতে বেঁচে গেল শালা। টাল খাওয়া জিভে দেবু কষ্টেসৃষ্টে কথা বলতে চাইত। ইজিচেয়ারের ফোল্ডিং হাতগুলোয় পা ছড়িয়ে ডাক্তার বলত, "এ-বয়সে বলার কিছু থাকে না, শোনারও না। বৃথা বাক্যব্যয়। তবু বেঁচে যে আছি এটা বেশ আনন্দের।" মরার বয়স দু-জনের মোটেই হয়নি, কিন্তু একজন কিছু না করে, অন্যজন যুক্তিগ্রাহ্য জগৎ ছেড়ে আধ্যাত্মিক যাত্রার পথের সংশয়ে বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে। সার্ভিসিংয়ের অভাবে কলকবজাগুলোয় ছ্যাতলা পড়ে গেছে। ইজিচেয়ারটা তখন ছিল রোগীর ঘরে। ওয়াকার কেনা হতে সেটা ফিরে গেল পুরোনো জায়গায়। সাড় ফিরতে ওয়াকার ধরে ধরে দেবপ্রসাদও ফিরে গেল ইজিচেয়ারে। নাটকের সেই চেনা সেট—ইজিচেয়ার, আব্দারমাফিক তেপায়া টেবিলে দাবার বোর্ড আর খবরের কাগজ। দিনের আয়া বন্ধ করে রাতের জনকে খালি বহাল রাখা হল। সব যেন নিয়মে চলে। প্রেসার কমিয়ে রাখতে হবে। যেকোনো উত্তেজনা বিপজ্জনক, সেকেন্ড অ্যাটাকে মানুষ ফেরে না। খোলামেলা শান্তির পরিবেশ দরকার।—এই ক্যাসেটটা যে-দিনই আসে ডাক্তার বাজায়। সুস্মিতা বলে, "অশান্তি তো নেই। মন যদি পাকানো হয়, উৎপাত যদি ভেতরে থাকে, উপায় কী!" চাঁদু বলে, "এতই বোঝো তো বদলে যাও না কেন?" পেশেন্ট দু-জনের কথায় ঘাড় নাড়ে।

বাবার নড়বড়ে চলাফেরা শুরু হতেই সুস্মিতা পুরোনো ফর্মে ফিরে গেল। সে আবার কথা বন্ধ করে দিল। অদৃশ্য হল সব ক্ষমা। হাসিখুশি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জায়গায় ফিরে এল এক কঠোর ব্যক্তিত্বময়ী রূঢ় মহিলা। দেখভালের দায়িত্ব রইল কাজের লোকদের ওপর। দেবপ্রসাদের অবশ্য কিছু বদল বরাবরের মতো হয়ে গেল। মস্তিষ্কের কোনো স্থায়ী পরিবর্তনে সে নরম শিশুর মতো হয়ে পড়ে। ভারসাম্য ছিল না একদম। যে আসত তাকে বলত, "তাড়াতাড়ি একটা পাত্র দেখো না ভাই।" আর, কাঁদত ঠোঁট ফুলিয়ে। কারণ লাগত না তার জন্য। দুধে খই কম কেন, খইয়ে ধানের খোসা কেন, ছেলেরা এখনও পড়তে এল না যে, কেন বৃষ্টি অসময়ে। শব্দ নেই, ট্রেন কোথায়—যেকোনো ছুতোয় তার কান্না পেত। অস্পষ্ট ঝাপসা চোখে চেয়ে থাকত দাবার দিকে। ঘুঁটি নড়ত না, তবু। সুস্মিতা সরকারি হাসপাতালের নিস্পৃহ ডাক্তারের মতো সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের পুরোনো রুটিনটা ধরে ফেলল।

পুরোনো রুটিন বলতে ঘরে একা থাকা। ছাত্ররা চলে গেলে দিনরাতের নানা সময়ে দক্ষিণের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা, ভক্তদের দর্শন দেওয়া। রাতে পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে ট্রেন দেখা, প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকা। দুপুর বেলায় ফাঁকা রাস্তা দেখা। রোদ মেঘ পোস্টম্যান দেখা। ভিখারি, রেডিয়ো, পাখিদের শোনা। রোদের তাত, বৃষ্টির ছাট, শীতের আমেজ নেওয়া। আর টুকটাক বই পড়া। কখনো গল্পের, কখনো অঙ্কের। ভোর বেলাটা ইদানীং বদলে ফেলেছে সুস্মিতা। অন্ধকার ফুরোনোর আগে সে উঠে পড়ে। ছাদে চলে যায় প্লাস্টিকের মাদুর নিয়ে। শিশিরভেজা সুরকির ছাদে খালি পায়ে হাঁটে। শীতের সকালটা ওয়াটার কালারে আঁকা, কুয়াশার সমুদ্রে একা হারিয়ে যাওয়া জাহাজের মতো, একটু বিষণ্ণ। কাজ না হলেও বর্ষা পছন্দ করে সে। সাদা-কালো ছাই-ছাই আকাশের মাঝে নীলের ছিটে। ধুলোধোঁয়া কম। গাছপালা ঝুপ্পুস তাজা। ভিজে সব প্রাণী খুশি। ভিজে খুশি সুস্মিতা। বর্ষা শেষের পথে। দূরে ইটভাঁটার চিমনিগুলোর মুখে আটকে আছে আবছা ধোঁয়া, চিলেকোঠার সিঁড়িতে

বসে দেখে সুস্মিতা। তাপমাত্রা ভেদাভেদ, হাওয়ার বিভিন্ন স্তর সে দেখে কেকের মতো কেটে কেটে। আগে এ-সময় কয়লার ভারী ইঞ্জিন যেত, উড়ে আসত গুঁড়ো কয়লা। কিছু রোমান্স আর আফ্রিকান লোকগায়কদের ভারী আওয়াজ নিয়ে তারা বিদায় নিয়েছে। তা এক বছর হল। এখন ঘরের জানালা ভোরে বন্ধ রাখতে হয় না। সুস্মিতা আলোর ক্রমশ ফুটে ওঠা দেখে। তারপর উঠে সিঁড়ির আলো নেভায়। পোশাক বদলায় চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে। আগে উঁচু বাড়ি ছিল না আশপাশে। জানালা দরজা খুলেই শাড়ি ছাড়ত। ব্লাউজের ওপর চুড়িদার। কিছুদিন হল একশো মিটার দূরে পুকুরের ওই কোণে পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠেছে। নাম দিয়েছে 'লেক প্যালেস'। তারপর তার নির্জনতা কমে গেছে। মাস খানেক হল সে বেশ অস্বস্তিতে আছে। যোগব্যায়াম করার সময় সে দেখে চারতলার ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে একটা ছেলে ঠায় চেয়ে থাকে। চোখাচুখি হলে জানালা ভেজিয়ে দেয়। তারপরও সুস্মিতা টের পায় ফাঁক দিয়ে ছেলেটা চেয়ে আছে। রোজ এক ঘটনা। অতদূর থেকে কী দেখে? বায়নাকুলার আছে? অথবা নেই। সুস্মিতা কয়েকটা আইটেম বাদ দেয়। যেমন সর্বাঙ্গাসন। কে ও? খোঁজ নিতে হবে, মাদুর গুটিয়ে নামার সময় ভাবে।

প্রায় বছর সাতেক টিউশনি করার পর সময়ের ফারাকটা টের পায় সুস্মিতা। ইন্টারনেট, ফেসবুক, ই-মেল এবং মোবাইলের কানাকানিতে ছেলেমেয়েরা অনেক চৌখস, বাইরের জগৎ জানে। ব্লু-ফিল্মের অভিজ্ঞতায় নগ্ন নারীশরীরের ছোঁকছোকানি কম। তবু, বয়সের কিছু আবেদন বোধ হয় মেলানোর নয়। লাইভ মহিলা দেখার উৎসাহ আর তাকে ঘিরে স্বপ্ন বোনার প্রবণতা একরকম রয়ে গেছে। কাঙ্ক্ষিত মহিলাকে এখনও তারা আড়চোখে দেখে, এখনও উশখুশ করে। নাইন-টেন শেপলেস, তবে রিপুর আলেয়ার ডাক তারা শুনেছে। ইলেভেন-টুয়েলভ কম্পিউটার স্যাভি হলেও তাদের ব্যক্তিগত মিথুনমন্দিরে সুস্মিতা আছে। দিদিমণি খাতায় ঝুঁকলে তারা উঁচু হয়, ক্লিভেজের শেষটুকু চায়। দিদিমণি বোর্ডে গেলে তারা বসে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে দেখে কোমরের ওপরের খোলা অংশ ছাড়িয়ে স্তনের নীচের আভাস। কেউ কেউ পাছামনস্ক হলেও আধুনিক প্রযুক্তি স্তন্যপায়ীদের স্তনবিমুখ করতে পারেনি। সব দুগ্ধপোষ্য। মেয়েদের কেউ কেউ পূর্ণ যৌনতার স্বাদ পেয়েছে মনে হয়। সুস্মিতার কেমন নিজের ওপর করুণা হয়। সেও তো পারত এমন স্বাভাবিক হতে। মাংসল যৌনতা না পেয়েই কেটে গেল অনেকটা। কম বয়সের ইমেজ তার কাছে কাউকে যেতে দেয়নি। বেশি বয়সের ইমেজ তাকে কারোর কাছে যেতে দেয় না। তবু, মাঝে মাঝে সে বোঝে শরীর ইমেজের ধার ধারে না। সে তৈরি। বাঁশি বাজলেই হল। শুধু কানে শুনলে হবে না। মন চায় চোখে দেখতে, শরীর চায় স্পর্শ।

ইদানীং বিচিত্র সব দিকে মন ছুটছে। সুস্মিতা নিজেই বুঝতে পারে তার মধ্যে অজান্তে এমন রূপান্তর ঘটছে, যা সে আগে ভাবেনি। অন্যের গোপন কথা গোপনে জেনে নিতে ইচ্ছে হয়। ওপর থেকে ভাড়াটেদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ঝগড়া শুনলে কান বাড়ায়। খাবার চালাচালি দেখে, কী থাকে মেনুতে? দুপুরে মাঝের ঘরের বিবাহযোগ্যা মেয়ে কার সঙ্গে কথা বলে? কে বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে তার ঠোঁট নেড়ে দেয়? এ-ঘরের জামাইয়ের নজর ও-ঘরের বউয়ের দিকে। রাস্তার অচেনা লোকের অপ্রস্তুত আচরণের অপ্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে। বাবার আয়াকে মোটরসাইকেলে করে যে পৌঁছে দেয় সে তো অনেক ছোটো। নিজেকে দেখে সুস্মিতার বিস্ময় বেড়েই চলেছে। সে দেখে পোস্টম্যান ছাড়াও কত ক্যুরিয়ারের ছেলে চিঠি নিয়ে আসে। বেশ স্মার্ট হয়েছে ছেলেগুলো, সার্ভিসও ফাস্ট। গত কিছুদিন ধরে মৌসুমিদের বেশ চিঠি আসছে। কাজের মেয়ে জানিয়েছে। মৌসুমির 'লাভ আছে, ছেলেটা ভালো নয় তাই চটপট চেষ্টা চলছে'। কাগজে বিয়ের খবর বেরিয়েছে। সুস্মিতা শোধরায় 'খবর নয়, বিজ্ঞাপন'।

পরের ক-টা দিন সুস্মিতা খুব পাত্র-পাত্রী সংবাদ পড়ল। পুরোনো কাগজও। কত ধরনের মানুষের কত চাহিদা। বারো বছর আগে হলে নিরানব্বই শতাংশ চাহিদা সে মেটাতে পারত। এখন বড়োজোর দশ শতাংশ, বয়সে মার খাচ্ছে। তবু পড়তে পড়তে তার নেশা ধরে গেল। প্রথমে পড়ল রং দেওয়া বক্সগুলো। তারপর যেগুলোয় ছবি আছে। ছবিতে নিজেকে বসিয়ে

দেখল বয়সটা না বললে ফরেনে প্রবাসীদের জন্য পারফেক্ট ম্যাচ। বয়স থাকলে কি সে করত, না কি এখনও সে করবে? সুস্মিতা জানে এ-খেলার মানে নেই, রাজি সে হত না। কক্ষনো না।

লোহার গেট খোলার শব্দে বিছানা থেকে মুখ বাড়ায় সুস্মিতা। দেখে পোস্টম্যান। আজ চিঠি এসেছে, অনেক দিন পর তার একতাড়া চিঠি। লেটারবক্সের গর্ত দিয়ে এক বারে ঢুকল না। ছোটো ছোটো গোছা করে ঢুকিয়ে লোকটা চলে যেতে সুস্মিতা নীচে নামে। ধীরে-সুস্থে চারপাশ দেখে। গেটের ভেতর ঘরোয়া বাগান হওয়ার পক্ষে অনেকটা জমি। লাইন দিয়ে ডুরান্ডার হেজ আর দুটো ঝাউ লাগিয়েছে মৌসুমির মা। অন্য ভাড়াটেরা সামনেটা ঢেকে ফেলেছে টগর, গন্ধরাজ, জবায়। এলোমেলোভাবে। হাওয়াই চটি পরে বাগানে পায়চারি করে সুস্মিতা, পুকুরপাড় অবধি যায়। আড়চোখে ঘরগুলোয় উঁকি মারে। আড়চোখে দেখে লেটারবক্স। অনেক দিন একসঙ্গে এত চিঠি আসেনি। কারা পাঠাল? উত্তেজনা হয় ভেবে। কিছুক্ষণ পরে চাবি ঘুরিয়ে চিঠিগুলো বের করে সে। সিঁড়িতে ওঠার সময় ঘাড় ঘোরাতে সে দেখে রাস্তার ওপারে গোলাপি স্কুটির ওপর থেকে ড্যাবড্যাব করে একটা ছেলে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতে চমকে গাড়িতে স্টার্ট দেয় সে। কে এটা, এসব তো আঠারো-কুড়ি বছর আগে হত, আবার শুরু হচ্ছে নাকি, ভাবতে ভাবতে ওঠার সময় সুস্মিতার মনে হয়, হয়তো ভোর বেলার ফ্ল্যাটের সেই ছেলেটা। ব্যাটা বড্ড ছোটো। অতদূর থেকে ঠাওর হয় না, তবু মনে হচ্ছে ও-ই। খোঁজ নিতে হবে।

ঘরে গিয়ে মুষড়ে পড়ল সুস্মিতা। একটা চিঠিও তার নয়। সব কালীপদবাবুর। তার মানে মৌসুমির ম্যাট্রিমোনিয়াল বিজ্ঞাপনের উত্তর। ধ্যুস। মন খারাপ হয়ে যায়। ড্রেসিংটেবিলে তাড়াটা রেখে বিছানায় কাত হয়ে শোয়। কাগজ খুলে আরও পাত্র-পাত্রী সংবাদ পড়ে। দেশে কত মানুষ বিয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, বাপ রে! বার বার চোখ গেল চিঠিগুলোর দিকে। বিকেলেই দিয়ে আসতে হবে। কী লেখা থাকে চিঠিতে? অন্যের চিঠি দেখা অন্যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কাছে যেতে মনে হল তার বাক্সে এসেছে তারই পড়ার জন্য, এতে অনৈতিক কিছু নেই। দেখলেই হয়। একসময় না-পেরে খুলে ফেলল। একে একে সতেরোটা। সবার ভার্সান মোটামুটি এক— দাবিদাওয়া নেই। সচ্ছল পরিবার। বাবা রিটায়ার্ড। ননদদের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বক্ষেত্রে ভাইরা প্রতিষ্ঠিত। কেউ অন্য রাজ্যবাসী, কেউ কাছের। প্রকৃত সুন্দরী ও ইংরেজিতে দক্ষ মেয়ে জেনে তারা ইমপ্রেসড। সংস্কার ও রুচিতে এই পরিবারের সঙ্গে মিলবে বেশ। এগারো জন সঙ্গে ছবি পাঠিয়েছে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে মেয়ের সঙ্গে বাইরে আলাদা দেখা করতে চায় উদারপন্থীরা। সুস্মিতা দেখল, ননদের বিয়ে হয়ে যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। মৌসুমি ফোটোজিনিক, তবে সুন্দরী নয়, তাই সামনাসামনি হলে কেঁচে যাবে। পড়তে পড়তে কৌতূহল উবে গেল। মনে হল, ইস মৌসুমির ক্ষতি করে ফেললাম। তারপর সে ভেবে ঠিক করে চিঠিগুলো আবার সে পোস্ট করবে। নতুন খামে ভরে ভিন্ন ভিন্ন শহর থেকে, একটা সময়ের গ্যাপে। দু-তিন দিনে আবার চিঠিগুলো ফিরে আসবে। খামের ওপর লেখাগুলো আঁকাবাঁকা করে দিতে হবে। কালি-কলম বদলে দিলে সন্দেহ হবে না। তা ছাড়া কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার সময় কোথায় সন্দেহের। মোটামুটি সম্মানজনক একটা সমাধান জোটায় সুস্মিতার হালকা লাগল। সন্ধ্যে বেলা জানালায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে সেই ছেলেটা সিগারেট-মুখে চা-গুমটির পেছন থেকে উঁকি মারছে। আদলটা চেনা-চেনা লাগে খুব। কে? হোকগে যে খুশি। চিন্তার ব্যাপার একটাই, যেভাবে ছিঁনেজোঁকের মতো লেগে আছে ছোকরা, চিঠি ফেলার সময় না পিছু নেয়। নিলেই-বা কী। সুস্মিতা পড়াতে যায়, ছেলেরা এসে গেছে। তখন ঘর থেকে ওয়াকারে ভর দিয়ে ইজিচেয়ারের দিকে হাঁটে দেবপ্রসাদ। কোচিং ক্লাস শুরু হলেই হয়তো বোঝাতে চায় এখনও আমি আছি, মেয়ে একা নয়।

দু-জনে দু-জনকে পেরোয় নীরবে। দেবপ্রসাদ মুগ্ধ চোখে মেয়ের পড়ানো শুনবে, মেয়েকে দেখবে শশা-মুসুম্বির লো-ক্যালোরি টিফিন খেতে খেতে। সে-সময় লালা, সর্দি, অশ্রু গড়িয়ে পড়ে

মুখ-নাক-চোখ দিয়ে। যেকোনো পাঠক্রিয়ায়। সরল সুদ, অপনয়ন, অংশীদারি কারবার কিংবা জ্যামিতির উপপাদ্যে। সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল হয় বজ্রগুণনের অঙ্কে। তখন সে ফোঁপায়।

পরের তিন দিন সুস্মিতা চিঠিগুলো পোস্ট করল পরিকল্পনামতো। নিজের ঠিকানায়, কালীপদবাবুর নামে। দু-তিনটে স্টেশন ছেড়ে আলাদা আলাদা শহর থেকে। বাড়ির কাছেই এতগুলো শহর, অথচ সে আগে কখনো যায়নি। অচেনা বিদেশে ত্রস্ত অতিথির মতো ঘুরল। কোনান ডয়েল আর ক্রিস্টির সম্ভ্রান্ত অপরাধী গৃহকর্ত্রীর মতো চোখের কোণ দিয়ে চারপাশ দেখল, সবাইকে মনে হল অনুসরণকারী। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ফাঁকা দেখে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলল। এক বাক্সে নয়, আঞ্চলিক ছোটো কেন্দ্রগুলোয়। এক বাক্সে কেন নয়, তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর নেই। নিজের কাণ্ডে অবাক হল সে। তবু ঘোরের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে কাজ করে গেল। পুরো সময়টা তার মনে হল অনেকে দেখেছে, এইবার ধরা পড়বে। ধরা সে পড়ল না। পর পর তিন দিন এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে কখনো যায়নি সুস্মিতা। অপরাধবোধ থাকলেও এই সংক্ষিপ্ত অভিসার তার মধ্যে উত্তেজনা জাগাল। চেনা মানুষের মুখোমুখি হওয়ার আতঙ্ক জাগিয়েছিল নিষিদ্ধ উন্মাদনা। যদিও কাউকে জবাব দেওয়ার নেই, কেউ তা চাইবে না, সুস্মিতা ভালোভাবেই জানত। তবু নিষিদ্ধ উত্তেজনার আকর্ষণ মনোরম।

চিঠি পোস্ট করার পরের ক-টা দিন সুস্মিতা পোস্টম্যানের অপেক্ষায় রইল। এক-এক করে চিঠি আসে আর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পোস্টম্যান ঢুকলে সে প্রার্থনা করে—এ-বার যেন ঠিক বাক্সে পড়ে। তবু একটা চিঠি তার কাছে ফিরল। তালা খুলে বুক ফুলিয়ে ফেরত দিল সে, "মেশোমশাই আপনাদের চিঠি আমার বাক্সে এসেছে, নিন।"

ছোটোখাটো কৌতূহল যত বাড়ছিল ভেতরে, বাহ্যত সুস্মিতা তত খোলামেলা হয়ে পড়তে থাকে। বুড়ো পাহাড়ের অটুট গাম্ভীর্যের ওপর কোমল ঘাসপালা গজাচ্ছিল। তার ফুরফুরে ভাবটা ছেলেদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সে-দিন পড়াতে গিয়ে দিদিমণি দেখে বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা—বিন্দু টানলে রেখা হয়। নীচু ক্লাসের জ্যামিতিক সংজ্ঞা হলেও এ আসলে পুরোনো চুটকি, হিন্দি সিনেমার ভ্যাম্প ও নায়িকাকে নিয়ে। রেখা প্রথম দিকে বিন্দুর মতোই ভারী ছিল। পরে রূপ খোলে। দ্বিতীয় চুটকিটা ছিল, রেখা ভাঙলে বিন্দু হয়। এটা শরীর ভাঙার সংকেত। কলেজে খুব চলত এমন ইঙ্গিতপূর্ণ বিকৃতি। সুস্মিতা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কিছু জিনিস কখনো বদলায় না। তার খারাপ লাগে না। কমনীয় মুখে ডাস্টার দিয়ে সে বোর্ড মোছে। তারপর অঙ্কের প্রশ্ন লেখে টেন ইয়ার্স থেকে। লিখতে লিখতে তার মনে পড়ে আরও কাজ বাকি। আঠারো বছর ধরে ঘরের কোণে অস্পৃশ্য পড়ে আছে একবাক্স চিঠি। তার ড্রপবক্স, এবার সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

ছয়

মেঝেতে ড্রপবক্স উপুড় করে সুস্মিতা বুঝতে পারে বোকামি হয়েছে। জাল ছোড়ায় বহু বৃত্তে জলের ছড়িয়ে যাওয়ার মতো ঘরে ছড়িয়ে গেল আরশোলা আর পোকামাকড়। নানা মাপের। তাদের সক্রিয় আর না-ফোটা ডিমে ভরে গেল মেঝে। চিঠিগুলো বড়ো দুর্ঘটনার পর অনেক শরীরের একটা দলা-পাকানো একটি খামে পক্ক পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সুস্মিতা লক্ষ করে নিষ্প্রাণ বস্তুও কীভাবে সক্রিয় থাকে প্রাণের ছোঁয়ায়, অথবা অদৃশ্যে প্রাণ হয়তো বেড়ে ওঠে জড়ের প্রশ্রয়ে। বদ্ধ জিনিস বন্ধ থাকে না, সেও পৃথিবীর ক্ষয় ও পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। ফলে অধিকাংশ চিঠি নষ্ট হয়ে গেছে। আঠা লাগানো খাম কুরে কুরে খেয়েছে পোকারা। বাতাসের আর্দ্রতা এবং ভাঙা ডিমের রস, মৃতদের গলে যাওয়া শরীর আর তাদের মল-মূত্র-ঘাম-বীর্যে চিঠিগুলো করুণভাবে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে পড়েছে। হাত না দিলেই হত। এগুলো নিয়ে কী করা যায়। সুস্মিতার মাথায় এল চারটে স্বাদু কল্পনা।

১. ক্ষতবিক্ষত চিঠিগুলোয় অসংখ্য ঘুলঘুলি আর অনন্য জাফরি। জুড়ে কোলাজ বানালে বড়ো শহরের বাউন্ডুলে শিল্পীর কাজ মনে হবে। ফরাসি দেশে খুব হয়।

২. ঢিবির মাঝের অক্ষত চিঠির যা পরিমাণ,

বড়োসড়ো একটা পাল বানানো যায় অনায়াসে। এরারুটের আঠায় জুড়ে জুড়ে। রোমাঞ্চকর এক দস্যুজাহাজে সেটা টাঙানো হবে। চাঁদের আলোয়, সূর্যের আলোয় রং বদলাবে তার। কখনো আগুন কখনো বরফ। সিনেমার মতো। মাস্তুলে বড়ো করে থাকবে সুস্মিতার কড়া একটা ছবি। দুটো হাড়ের গুণচিহ্নের ওপরে লেখা থাকবে 'ডেঞ্জার' অথবা 'কাপিতান সুস্মিতা'। পোষা সি-গাল আর উড়ুক্কু মাছেরা লেখা পড়ার চেষ্টা করবে। সামুদ্রিক প্রাণীদের মোবাইল ওয়ার্কশপে, নিজস্ব নোটিশ বোর্ডে।

৩. চিঠিগুলো দিয়ে নানা ধরনের ঘুড়ি বানানো যায়। ছাত্রদের নিয়ে ছাদে বসে। ওয়ার্ক-এডুকেশন ক্লাস। করবে জাপানিদের মতো বিশাল ঘুড়ি। যেটা উড়তে উড়তে প্রেরকদের কাছে যাবে। ফুরফুরে বাতাসে বায়নাকুলার দিয়ে তারা অন্যদের লেখাগুলো পড়বে, কানাকানি করবে খবর। পুরোনো সম্পদ দেখে তারা কি আর একবার একঘেয়েমি ঝেড়ে ফেলতে চাইবে?

৪. 'হেরিটেজ লেটারস' নামে একটা ছিন্নপত্রাবলিসংগ্রহ (আক্ষরিক অর্থেই) প্রকাশ করলে লোকালে হিট হয়ে যাবে। যারা লিখেছিল তারা এবং ঝিম-ধরা সংসারে আলোড়ন তোলার জন্য তাদের বউরা নিশ্চয়ই কিনবে। প্রথম সংস্করণ প্রথম মাসে শেষ। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোবে না।

চারটে আনন্দের আজগুবি ভাবনাই বাতিল হল অতি রোমান্টিক ও অবাস্তব বলে। বরং মৌসুমির বিয়ের চিঠির মতো রি-পোস্ট করাটা সম্ভবপর বলে গ্রহণযোগ্য লাগল।

চামড়ার অসুখে তাদের পলেস্তারা-খসা বাড়িটার চতুর্দিক চুলকোয়, ভেতরবাইরে। রঙের মানুষ, পেস্ট কন্ট্রোল ছাড়া অন্তত দুটো খালি ট্রাক লাগবে সামাল দিতে। সুস্মিতা সিদ্ধান্ত নেয় সাফসুতরো করে এবার সব বদলে ফেলবে। আজ বোধ হয় সবারই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। নাকে রুমাল বেঁধে চিঠি ঝাড়ার সময় সুস্মিতা শুনতে পায় নীচ থেকে উঠে আসা মৌসুমির মায়ের চিরকালীন উচ্চকিত স্বগতোক্তি। সেও ক-টা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমত, কোনো পাত্রপক্ষকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গাণ্ডেপিণ্ডে চপ-কাটলেট-মিষ্টি খেয়ে যায়, খবর দেয় না। শেষেরটা এক কাঠি বাড়া, বলে চা-কফি চলে না, হরলিক্স খায়। দ্বিতীয়ত, বাসন্তীকে আর কাজে রাখা যাবে না। তাকে বলা হয়েছিল ঠাকুরের বাসন-কোসন ধুতে, সে নারায়ণশিলা পর্যন্ত সাবানজলে ভিজিয়ে দিয়েছে। তৃতীয়টা ঠিক সিদ্ধান্ত নয়, অভিশাপ। ফি-বছর বিশ্বকর্মায় বাইরের বারান্দার আর পেছনের বাথরুমের আলো চুরি যায়। মিহি কাচে নাকি ভালো মাঞ্জা হয়। সুতরাং এ-বার সব ঘুড়িতে বাজ পড়ুক, সব লাটাই ভরে যাক উকুনে। দুটো কাজই অসম্ভব— বাজের পক্ষে টিপ করে ঘুড়িতে পড়া আর উকুনের পক্ষে খুসকি-ভরতি সুন্দর চুল ছেড়ে লাটাই খোঁজা। অবিশ্বাস্য হলেও মহিলা ক্রিয়েটিভ।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে সুস্মিতা বুঝল নব্বই শতাংশ ফেলে দিতে হবে। ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, অথবা প্রেরকের ঠিকানা নেই। এরা ঝুঁকিহীন খেলায় অংশ নিয়েছিল। বাকি দশ শতাংশের অর্ধেক প্রেরকের নাম পর্যন্ত নেই। যা আছে তাকে না-থাকাই বলে। গালিভার, অরণ্যদেব, মজনু, ওথেলো, অমিত রে, উত্তমকুমার টাইপের ডামি সব। এমনকী বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাসও পাওয়া গেল। লিখে আর পাঠিয়েই তাদের যৌনতৃপ্তি হয়েছে। ঢিবির মাঝ থেকে বেশ কিছু অক্ষত চিঠি পাওয়া গেল, যার পরিমাণ কম নয়। সেগুলো দেখতে দেখতে সুস্মিতার শরীর ভরে ওঠে খুশিতে, সে ফুলে যায়, ওজনও বেড়ে যায়। ও মা, কত চেনা লোক! কত ছাত্রের বাবা-কাকা-দাদা-পিসে-মেসো এতদিন অবহেলায় কোন কোণে পড়েছিল। এত ডাকসাইটে অফিসার, দুঁদে উকিল, রিটায়ার্ড মস্তান, পুলিশকর্তা, ময়রা, ডাক্তার, গ্যাসের ডিলারের জীবন সে ছেয়ে ছিল! সব চিঠি ফেরত পাঠাবে সে। বিয়ের চিঠির মতো কোণে প্রজাপতি আটকানো থাকে, এমন ফুলতোলা খামে ভরে। সবাইকে পাওয়া যাবে না, অনেকে হয়তো বেঁচে নেই কিংবা ঠিকানা বদলে ফেলেছে। তাহলে তো বেওয়ারিশ চিঠির মতো 'আনডেলিভার্ড' বা 'নট ফাউন্ড' ছাপ মেরে কোথায়

পড়ে থাকবে। চিঠিগুলোর অপেক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হবে। তাতে বোঝা যাবে না কত টিকে আছে এখনও। সুস্মিতা ঠিক করে 'হইতে' লিখে নিজের ঠিকানা দেবে। পোস্ট করার চিঠিগুলো সরিয়ে রেখে বাতিলগুলো বস্তায় ভরে। আজই সে ডাকটিকিট কিনবে, আজই খামে ভরবে। চিঠিগুলো আজও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠার আর্তি নিয়ে অপেক্ষায় শুয়ে আছে। কর্মপরায়ণ লোকগুলোর হৃদয়ে এতদিনে নিশ্চিত মরচে পড়ে গেছে। না কি সময়ের বিপরীতে হাঁটার ইচ্ছে উসকে উঠবে? লজ্জিত হওয়ার অবকাশ নেই, তারা তো জানেই না এতদিন তাদের চিঠি অপঠিত ছিল। বাতিল চিঠির বস্তা দেখে মনে হয় এসব ভিড়বাসে ফাঁকতালে শরীরে হাত দেওয়ার মতো, তার বেশি নয়। কিন্তু কেন সে পাঠাবে চিঠি? যদি কারো কাছে আহ্বান মনে হয়? হোক। সুস্মিতা কিছু চাইছে না, সে শুধু তাদের একটা সময়ের উন্মাদনা, স্বপ্ন, ছেলেমানুষি আর নির্বুদ্ধিতা ফিরিয়ে দিচ্ছে। সে তাদের বয়স ফিরিয়ে দিচ্ছে পত্রমর্মরের ধ্বনিতে। সুরঞ্জনের চিঠিগুলো নিয়ে কী করা যায়? সিভি-তে ঠিকানা ছিল, সে এখন কোথায় কে জানে। থাক তাড়ার মধ্যে, পরে ভাবা যাবে।

গোটা দোতলা ঘুরে সুস্মিতা বুঝতে পারে বাড়ি সাফ করা সোজা নয়। নির্মমভাবে আগে জিনিস বিদেয় করতে হবে। মানুষ যে কত অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে জীবন কাটায়! মাঝের তালাবন্ধ দুটো ঘরে ঢুকে সুস্মিতার মনে হয় প্রাচীন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পরিত্যক্ত গোডাউনে ঢুকে পড়েছে। এ যেন মিউজিয়ামের স্টোররুম। কাজের মানুষগুলো সাপ্তাহিক ঝাড়পোছের নামে আসলে চেষ্টা করেছে জড়বস্তুকেও বিব্রত না করার। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় সুস্মিতা শুধু দুটো তালিকা বানাতে পারল। স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত জিনিসে মায়া দেখিয়ে লাভ নেই। স্মৃতি নিজেই যথেষ্ট ভারী জিনিস, তার অনুষঙ্গ বয়ে চলা আরও কঠিন। সুস্মিতার প্রথম তালিকায় স্থান পেল যেগুলো বিক্রির। যথা—বার্মাটিকের চারটে খাট। সাতটা নানা মাপের দেয়ালঘড়ি।

কাঁসা-পেতলের বাসন (অন্তত ৩০০ কেজি)
যজ্ঞিবাড়ির অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি-গামলা-ঘড়া (১৫০ কেজি)। লোহার কড়াই, নৌকো, ড্রাম প্রচুর। তিনটে জামাকাপড় রাখার ডাবল ডোর আলমারি। ভারী লোহার সিন্দুক (৪ বাই ৩ বাই ৩ ফুট) একটা। ছ-জনের ওভাল শেপের ডিনার টেবিল। গদি ফেঁসে স্প্রিং বেরিয়ে যাওয়া সোফা-সেট দু-জোড়া। বারোটা লোহার চেয়ার, স্টাডি টেবিল, অফিস টেবিল। এবং ফুটবলের মাপের দুটো ছাল ছাড়ানো তামার তারের তাল। দ্বিতীয় তালিকাটা দানের, যার মধ্যে পড়ল—পুরোনো গদি-তোশক, কয়েকটা আলনা, গাড়ির ক্ষয়ে যাওয়া টায়ার-টিউব, কাঠের খড়ম, চাকা লাগানো ছিপ, ধানঝাড়াই মেশিন, খ্যাপলা জাল, পারা উঠে যাওয়া রট আয়রন ফ্রেমের আয়না, ডাম্বেল-বার্বেল, শ্যালোর টিউব ও বাঁশের মই। সবগুলোই সংখ্যায় একাধিক।

এ ছাড়া ছুরি ও বাগানের কাঁচি-বটি-কাস্তে-হেঁসোর জংধরা একটা বড়োসড়ো সম্ভার। মাস্তুর মা ফাটা সোফায় বসতে গিয়ে পাছায় জোর গুঁতো খায়। তার যোনি থেকে ব্রহ্মতালু কেঁপে ওঠে। ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে স্প্রিংয়ের সারির মাঝ থেকে বের করা হয় অক্ষত দুটো হুইস্কির বোতল। তার ওপর সাল-তারিখ দিয়ে মালিকের সই। দেবপ্রসাদের হাতের লেখা সুস্মিতা চেনে। দিনক্ষণ দেখে মেয়ে বোঝে কলেজজীবনের শেষসময়ে কেনা। দেবপ্রসাদের ইচ্ছে ছিল ব্যক্তিগত ব্রুয়ারি করার। কুঁড়েমিতে হয়নি। তবে কলেজ থেকে সে ঠিক করে কিছু বোতল প্রতিমাসে কিনে রেখে দেবে। বয়স মদের স্বাদ বাড়ায়। ২৫-৩০ বছর পর এক-এক করে খুলবে ভেবেছিল। তার প্রথম ও একমাত্র লট এটা। সময় যখন এল মনে নেই। এখন মনে পড়েও লাভ নেই। সুস্মিতা বোতলদুটো মুছে বাবার পাশে রাখে। দেবপ্রসাদের ইমোশনাল ফেজ সে-সময় তুঙ্গে। সে বোতলে হাত বোলায় সস্নেহে আর কাঁদে। বাবার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে সুস্মিতার মনে হয় বাবা খুইয়ে সে একটা সন্তান পেয়েছে। যাক, শূন্য অবস্থার চেয়ে এও ভালো।

বাড়ি সাফাইয়ের প্রোজেক্টটা পিছিয়ে দিতে হল। লেবার পাওয়া সহজ নয়, বিশেষত বিশ্বকর্মার সময়। আপাতত তার মনও আকাশে উড়ে গেছে। ছোটোবেলার মতো ঘুড়ির প্যাঁচ দেখবে, বিপজ্জনক

কার্নিশে কোণঠাসা ঘুড়িবাজ ছেলেদের বিশ্বস্ত জোগাড়ে হয়ে থাকবে। রাতে সে ঘুড়ি ওড়াল তারাভরা আকাশে এক-ছায়াপথ সুতো নিয়ে। বাবা লাটাই-কোলে বসে রইল। যদিও সে ঘুড়ি ওড়াতে পারে না, দেবপ্রসাদ সুতো গোটানো বা ছাড়ায় একদম আনাড়ি, তবু ভোর অবধি ঘুড়ি উড়ল দু-জনের।

নিয়মমাফিক অন্ধকার থাকতে ঘুম ভাঙল সুস্মিতার। যত ভোরে সে ওঠে, বিশ্বকর্মা ওঠে তার অনেক পরে। কলকারখানায় তার নাইটডিউটি থাকে। আজ বহু বছর পর ঘুড়ির ওড়াউড়ি, মেঘের লুকোচুরি আর ছেলেদের দিশেহারা ছুট দেখার জন্য মন উন্মুখ হয়ে আছে। বাঁশের লগি নিয়ে ইচ্ছে করছে ছোটোদের সঙ্গে ছুটতে। ছোটোবেলায় যা-যা পায়নি, করেনি—সব করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আকাশ আজ অংশত মেঘলা। সেপ্টেম্বরের এই সময় প্রতিবছর যে কেন বৃষ্টি হয়! সুস্মিতা রুটিন অনুযায়ী প্রাণায়াম ও যোগব্যায়াম করল। যথারীতি দূরের জানালা খুলে গেল। ছেলেটা তাকে দেখে চলল। চোখাচুখি হতে লজ্জা পেল, জানালা ভেজিয়ে দিল। আবার ফাঁক দিয়ে দেখা শুরু করল। এই-ই কাজ ছোকরার। সুস্মিতার ঝিঁঝি পোকার মতো অসহ্য লাগে। সে আকাশ দেখে। একটা-দুটো ঘাসফুলের মতো ঘুড়ি ফুটে ওঠে শূন্যের বাগানে। এবার মোমবাতি মার্কাই বেশি। সূর্য খুলল একটু দেরিতে। সূর্যেরও তাহলে মোমবাতি লাগে। ছাদে বসেই সে চা খেল। আর, বাটিচচ্চড়ি দিয়ে লুচি। কেটে আসা কয়েকটা ঘুড়ি ইট চাপা দিয়ে রংবেরঙের ধারালো সুতো গিঁট মেরে গোটাল। তারপর হরির লুঠের বাতাসার মতো ওপর থেকে ভাসিয়ে দিল। তাতেই সকাল কেটে রোদ চড়ে গেল।

দুপুরে ছাদে উঠে সুস্মিতা দেখে আকাশ আশ্চর্যরকম খালি। সূর্যের আঁচ নেই, আকাশের নীল ছেঁড়াফাটা, পরিবর্তে আছে ছাঁইমেঘ ছড়ানো-ছেটানো। ফাঁকে জেটপ্লেনের দীর্ঘ ধোঁয়ার রেখা, ছাড়া-ছাড়া। ধারালো সুতোর ভয়ে এ-সময় পাখিদের ওড়াউড়ি কমে যায়। একটা ছোটো পাখির দল ক্যালাইডোস্কোপে অনন্ত ডিজাইন বানাতে বানাতে ফিরছে। মেঘের অনেক নীচ দিয়ে, স্যাটেলাইট টাওয়ারের অনেক ওপর দিয়ে চলছে অবিরাম পরিবর্তনশীল ব্যূহরচনা। তারপর বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল শুরু হল। সুস্মিতা মুখ আকাশের দিকে তুলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। পড়ুক জল। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি মুখে পড়ে ছিটকে ছড়িয়ে যায়। স্ফটিকে বিশ্লিষ্ট আলোকরশ্মির মতো। সুস্মিতার ভালো লাগে। ভিজতে ভিজতে সে ঠিক করে একটা সিফনের শাড়ি কিনবে। তাঁতের শাড়ি পরেই সে এতটা বড়ো হয়ে গেল, ফিনফিনে সিফন কখনো পরেনি। কত ছোটো কাজ যে বাকি থেকে যায়! সে আরও ঠিক করে বাবার জন্য একটা মোটা সোনালি পাড়ের ধুতি কিনবে দক্ষিণীদের ধাঁচে। যেটা লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা যায়। খাবার সময় মাছের কাঁটাগুলোও বেছে দেবে এবার থেকে, বাবার আঙুলগুলো এখনও নরমাল হয়নি।

বৃষ্টি এল, বৃষ্টি গেল। সুস্মিতা ভিজল, শুকিয়ে গেল। ঘুড়ি নামল, আবার উঠল। অনেকটা সময় চলল এসব। বিকেল গড়াতে সুস্মিতা নীচে নেমে দেখে অভাবিত দৃশ্য। বাবার সামনে বসে সুরঞ্জন। যদিও আজ দু-জনে দাবা খেলছে না, তবু সেই মনে হয় ফিশার-স্প্যাসকি ক্লোজ-আপ। অবাক কাণ্ড, সুরঞ্জনের সময়ের চিঠির বাক্স খোলামাত্র সুরঞ্জনও ফিরে এল! পৃথিবীর কোন সুইচের কানেকশান যে কীসের সঙ্গে মানুষ জানে না। সুরঞ্জন মিষ্টি হাসে, "এই এলাম। কথা বলছিলাম মেশোমশাইয়ের সঙ্গে, উনি একইরকম আছেন সেই দাবা নিয়ে। কিছুদিন হল ফিরেছি। আর বাইরে যাব না।" সুস্মিতা উত্তর দেয় না। এত অন্তরঙ্গ কথা কেন। যেন অভিযাত্রী শৃঙ্গ জয় করে ঘরে ফিরেছে। আদিখ্যেতার সম্পর্ক তো নয়। সে যদি বাইরে যায় তার কী?

—"নিজের জায়গা ছেড়ে, বুঝলে, থাকা যায় না। নিজের দেশের কথাই আলাদা। অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, পাগলের মতো ছোটাছুটির মানে হয় না। তোমরাই ভালো আছ।" ফর্মুলামাফিক ডায়ালগ দেয় সুরঞ্জন। ছকবাঁধা নস্টালজিয়া-আক্রান্ত গলায়। বিদেশফেরত দু-একটা লোক দেখেছে সুস্মিতা, সবার এক ধরনের স্ক্রিপ্ট—দেশের মাটি ... সোঁদা গন্ধ ... অলস শান্তি ... কাকিমার হাতের সুক্তো ... প্রবাসে তাঁতের শাড়ি ... বিসর্জনে সিঁদুরখেলা ... ইত্যাদি ইত্যাদি। শিকড়হীন যারা, তারাই বেশি বলে।

—"একটু বয়স বাড়লেও তুমি আগের মতোই আছ। সলিড, মাথা ঘোরানোর মতো।" আংশিক প্যারালিসিসের গার্জেনকে সে পোঁছে না। দেবপ্রসাদ বুঝি স্মৃতি হাতড়ে সুরঞ্জনকে খুঁজে পায় না, সেই কোন যুগে ক-মিনিটের দেখা। কে এটা? হবে কেউ। বেশি ভাবলে তার মাথা ঝিমঝিম করে।

সুস্মিতার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। "বয়স কারো থেমে থাকে না", "বড়োদের সামনে কী বলতে নেই ভুলে গেছ", "চা খেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার কাজ আছে"—তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে পেছন ফিরে ঘরে ঢোকে। এতটা ঠান্ডা সুরঞ্জন আশা করেনি, সে যেন তার বাপের সম্পত্তি জমা রেখে গিয়েছিল। সে নাছোড়বান্দা, পিছু-পিছু ঘরে ঢোকে। সুস্মিতা ভ্রূ কোঁচকায়, অস্বস্তিকর পোকা ব্লাউজে ঢুকলে যেমন হয়। সুরঞ্জন এমন ভাব করে যেন কালই তো পাশে বসে সিনেমা দেখেছে। এ-জিনিস তো আমার, ব্যবহার করিনি এই যা। সুস্মিতার বিরক্তিকে সে পাত্তা দেয় না। অথবা বোঝে না। প্রফেশনাল অভিনেতার মতো সহজাত দক্ষতায় মঞ্চ ব্যবহার করে। জানালার ধারে যায়, সিগারেট ধরিয়ে পর্দা টেনে "লোকের এখনও তোমাকে নিয়ে খুব আগ্রহ। উঁকিঝুঁকি বন্ধ হয়নি দেখছি" বলে ধোঁয়া ছাড়ে। সুস্মিতা দেখতে থাকে কতদূর বাড়তে পারে এই ইজিগোয়িং অনুপ্রবেশকারী। এর চেয়ে সমর্পণকারী ন্যাকা প্রেমিকও ভালো, সে এখন বোঝে। দু-একবার শরীর ছুঁতে পারার দৌলতে যেন স্থায়ী লাইসেন্স পেয়ে যায় পুরুষরা। কেউ যদি চোখভরে খোলা বুক একবার দেখে ফেলে, দশ বছর পরও পাওয়ার দাবি থেকে যায়। আমার কাছে লজ্জার কী, সবই তো জানি, লুকোনোর আছেটা কী—ভাবটা এই ধরনের। দেখলেই সব জানা যায়? জানলেই সব চাওয়া যায়? না কি চাইলেই সব পাওয়া যায়? একবার শুলেই শোয়ার অধিকার জন্মায় না, বলে লাভ নেই, এদের বেসিক কনস্টিটিউশানটাই আলাদা—পুরুষ শরীরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। বহু দেশ ঘুরেও সে অশিক্ষিত থাকে গোড়ায়। সুস্মিতা চুপ করে বসে থাকে ড্রেসিং টুলে, সকালে গুছিয়ে রাখা চিঠির তাড়ার দিকে চোখ যায়, ওপরে দেখা যাচ্ছে সুরঞ্জনের অ্যাপ্লিকেশন ও রেজিগনেশন লেটার, দিয়ে দিলে হয়। সুরঞ্জনের হুঁশ নেই, হয়তো কোনোকালেই ছিল না, সামনের মানুষ সে দেখে না, বলে চলে, "পার্মানেন্টলিই চলে এলাম। এসে দেখি বাবার বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। আত্মীয়স্বজন মিলে খিচুড়ি বানিয়ে রেখেছে। মায়া ছেড়ে ফ্ল্যাট কিনতে হল। তোমার বাড়ির কাছে। ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, তিন আর চারতলা মিলে, বড়ো শহরের পলিউশানে আর থাকব না ..." বলতে বলতে সুরঞ্জন সিগারেট ফুরিয়ে আসা হাত তোলে ফ্ল্যাটের দিকে। কৌতূহল হয় সুস্মিতার, পুরু পর্দার বাধা সত্ত্বেও গত এক মাসের সামান্য প্রহেলিকা স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে—তর্জনীর দিশায় বোঝে সদা-অনুসরণকারী ছেলেটা তাহলে সুরঞ্জনের! আদল কেন চেনা-চেনা লাগছিল বুঝতে পারে। আর বোঝে এদের বংশ তার দাস হতে জন্মেছে। বাপ ও ছেলের শরীরের ডাক এক ধরনের, এক ধরনের মেয়ে তাদের পছন্দ। দু-জনের অ্যাপ্রোচ খালি আলাদা। প্রবলেমটা তাহলে জেনেটিক। সুরঞ্জন কত কী বলে চলে—কেরিয়ার গ্রাফ, ময়দার তালের মতো বউ, ছেলেকে প্রিন্সটন পাঠানোর স্বপ্ন—আরও কত কী। সুস্মিতা শোনে না। একসময় সুরঞ্জন থামে। শান্ত ঘরে বাইরের শব্দ ঢোকে। সুস্মিতা শোনে। ছুটির সন্ধ্যের আওয়াজ আলাদা। ভিড় পথের রথের মতো কোলাহলপূর্ণ, অভিযানের গল্পে মুখর। এবার সুস্মিতা প্রশ্ন করে, "ছেলের কোন ক্লাস?"

—টুয়েলভ। ওর জন্যই তো আসা। অনেক দিন ঘুরঘুর করছে। তুমি নাকি ইলেভেন থেকে না হলে নাও না। নীলাঞ্জন তৈরি আছে, ব্যাচে ফিট করে যাবে।

—"না, আমার নিয়মে ফিট করবে না।" সুস্মিতা থামিয়ে দেয়।

—সবার সঙ্গে আমায় মিলিয়ো না। আমার ব্যাপারটা আলাদা।

—"কীসে আলাদা? কমবয়সে গায়ে হাত দিয়েছিলে বলে?" সুস্মিতা কথাগুলো বলে খুব শান্ত আর স্পষ্টভাবে। সে এত নিস্পৃহ যে, সুরঞ্জনের রেডিমেড স্ক্রিপ্ট পাল্লা দিতে পারে না। তার অসহায় লাগে। ঠোঁটের ডগায় থাকা আত্মবিশ্বাস উলটোপথে গলা বেয়ে সব অর্গান ভেদ করে গুহ্যে পৌঁছে গেছে মনে হয়। সুস্মিতা উপভোগ করে তা। সে ভালোই জানে নীলাঞ্জন পড়ার জন্য ঘুরঘুর করছে না। তার জিন,

তার ডেস্টিনি তাকে পাঠিয়েছে। পড়াশুনা হবে না, আত্মরতির রসদ জুটিয়ে ফিরে যাবে খালি। সুরঞ্জন এতটা বোকা সে ভাবেনি।

সুরঞ্জন ছেলের পড়া নিয়ে ভাবিত নয়, সে জিততে চায়, বহু ব্যবহৃত অস্ত্র সে বের করে—"বুঝলে, জীবনটা বৃথাই নষ্ট হল দৌড়ে। শুধু কেরিয়ার আর উজ্জ্বল জিনিসের পেছনে ছুটে ক্লান্ত হয়ে গেছি।"

—এ ছাড়া কী করার ছিল তোমার? বেশির ভাগ লোক ছুটেই বেড়ায়, এটাও বাঁচা। ঝামেলা হল, অনেক লোক সব পাওয়ার পর অন্য উপলব্ধি করে। আসলে করে না, মুখস্থ বলে। সব ফুরিয়ে যাবার পর আলতুফালতু কথা গভীরভাবে বলার চেষ্টা করে।

কানের কাছে গাঢ় স্বর শোনে সে, গরম হাওয়া লাগে গালে। সুস্মিতা মুখ তুলে দেখে সুরঞ্জনের চোখ ভারী, মুখ লাল। লোকটাকে অপছন্দ হলেও শরীর বলে, দেখোই-না একবার কী হয়, কখনো তো হয়নি। প্রেমে না হোক, ঘৃণায় হোক। বরখাস্তের চিঠি এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সে দরজার দিকে তাকায়। ভেজানো আছে। থাক। এ-ঘরে তাকে না বলে কেউ আসবে না। ছেলেদেরও আজ ছুটি। সুরঞ্জন ভাবে সে ট্যুরিস্ট ভিসা পেয়ে গেছে। সে সংক্ষিপ্ত কনডাকটেড ট্যুর শুরু করে। কাঁধে হাত দিয়ে সুস্মিতাকে খাটে নিয়ে আসে। দ্বিধাবিভক্ত সুস্মিতা বাধা দেয় না। মন চায় না, শরীর তৈরি। সুস্মিতা চোখ বুজে বিছানায় হেলে পড়ে

> বেদের ছেলে হলেই হয় না, বিপদের মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে হয়। মেয়ে হলেই হয় না, চর্চা লাগে। গুরুমুখী চর্চা। তা ছাড়া, সে কতদূর মেয়ে, তা নিয়েই সন্দেহ হয়। এই নতুন খেলা বুমেরাং হয়ে যাবে না তো। সুরঞ্জনকে মনে পড়ে তার। সে ঠিক করে, করবে। শেষ অবধি করবে।

—"তুমি খুব বদলে গেছ। খুব কঠিন হয়ে গেছ। মানছি তখন তোমার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে, কেরিয়ার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল তখন.... উপায় কী ছিল বলো।" গলা ঘন করে ঘনিষ্ঠ স্বরে কথা বলে সুরঞ্জন। চেনা ফর্মুলা, যার শিরোনাম অনুতাপে সমর্পণ ও সুযোগসন্ধান।

—যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার হত না। তোমার স্মার্টনেসে ক-দিনে বিরক্ত হয়ে পড়তাম। ওসব বাইরের চালাকি।

সুরঞ্জন আর পারে না, অপমানবোধ বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে তখন। সে এগিয়ে হাত ধরে সুস্মিতার। সুস্মিতা অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যেন জানত এটাই হবে। শুয়ে জেতা, করে দখল করার সরল অঙ্ক। কেউ যে কেন অন্যরকম হয় না। সুস্মিতার ঘৃণা হয়, তবু সে অ্যালাও করে—কতদূর আর করবে। "এখনও তোমায় দেখলে শরীর কেমন করে, রক্ত ছোটাছুটি করে"

লম্বালম্বি। চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় সুরঞ্জনের মুখ দেখলে সব কোষ বন্ধ হয়ে যাবে। তীব্র ভালো লাগা আর প্রবল খারাপ লাগার অদ্ভুত সহাবস্থান। অভিজ্ঞ হাতে শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করে সুরঞ্জন। কিছু আগের নিস্পৃহ অবজ্ঞার হিসেব করে সে। চুম্বনের দিকে এগোতে বাধা পেল। সুস্মিতা শরীরের জেগে ওঠা অনুভব করে, সাড়া দেয়, সক্রিয় হয়। কিন্তু চুমুর বিপর্যয়ের কথা সে জানে। ভালোভাবেই জানে ঠোঁটের স্পর্শ সব নষ্ট করে ফেলবে। লালার সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে আসবে সেই পিঁপড়ে আর মৃতদেহ, অ্যাসিডের জ্বালা আর ডায়েরির খোলা পাতা। ছুটন্ত ট্রেন ও ঠাকুরদার মৃতদেহ সে মুখ ফিরিয়ে রাখে পাশে। কয়েক মিনিট পর তার কেমন যেন অস্বস্তি হয়। কিছু একটা চোরাস্রোতের মতো ঘটে চলেছে আড়ালে। স্তনে মুখ গুঁজে রাখা সুরঞ্জনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখে সে বাঁ-পা দিয়ে পুবের জানালার

একটা কপাট খুলে দিচ্ছে। যে-জানালা কখনো খোলা হয় না। দেবপ্রসাদের জন্য যেন খুলে দিচ্ছে নরকের দরজা। এই অবস্থায়ও ষড়যন্ত্র, এর মাঝেও জেতা-হারা শোধ তোলা! এত অবাক কখনো হয়নি সুস্মিতা। হতবাক হয়ে যায় সে। শরীর সম্পূর্ণ নিভে যায় নিমেষে। ভাগ্যিস বিয়ে হয়নি। ইজিচেয়ারে স্থবির বাবাকে দেখাতে চায় মেয়ের আদুল পায়ে উড়ে আসা এক পুরুষের পা ঘষার দৃশ্য, দিতে চায় পূর্ণ যৌনতার সংকেত। উদাসীন সুস্মিতা লক্ষ করে সুরঞ্জনের শিকারপ্রণালী। সুরঞ্জন মুখ তোলে, "কী হল?" নিরাসক্ত ও নির্মম গলায় সুস্মিতা বলে, "যাও।" কয়েক মুহূর্ত নারীশরীরের ওপর ভুজঙ্গাসনে নির্বিষ ফণা তুলে হিসহিস করে ব্যর্থ পুরুষ। কী ঘটল বুঝতে না পারলেও সে বোঝে এটা চরম আদেশ। এখানেই ফুলস্টপ। সে সরে। সুস্মিতা শাড়ি নামিয়ে নিজেকে গোছগাছ করে। তারপর জানালাটা বন্ধ করে দেয়। সুরঞ্জন এবার মাথা নীচু করে। সে সাফাই দিতে চেষ্টা করে। সুস্মিতা তাকায় না, দরজার দিকে হাত দেখায়।

বাইরে বেরিয়েই সুরঞ্জনের অপরাধবোধ উবে গেল। সে যা করতে চেয়েছিল, কিছুটা করেছে। ধরা পড়বে ভাবেনি। যাক, যা হয়েছে তা হয়েছে। বুড়োটা খুব বড়ো বড়ো কথা বলেছিল। শালা যখের ধনের মতো এখনও আইবুড়ো মেয়ে আগলে রেখেছে। জুতো পরতে পরতে সে দেবপ্রসাদের দিকে চায়। চোখ বুজে কাত হয়ে শুয়ে আছে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে সুতোর মতো গড়িয়ে নামছে চটচটে লালা। চোখের জল কিছুদূর এসে শুকিয়ে গেছে। মরে গেল না তো। নাকের খুব কাছে হাত নিয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না বুঝতে চায়। সেকেন্ড অ্যাটাক হয়ে যায়নি তো। বুকের ওঠা-নামা বুঝতে পারল না। আধখোলা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, আঠারো বছর আগে হুবহু এই পজিশনেই ছিল ঘুঁটিগুলো। এই ভদ্রলোকের কাছে যেন সময় থমকে গেছে। কালো ঘোড়া তুলে সে চাল দেয়। একসঙ্গে ধরে রাজা ও মন্ত্রী। অন্য সাপোর্টও ঠিকঠাক। এ-গেম তার। দেখার জন্য দেবপ্রসাদ কি চোখ খুলবে? সুরঞ্জনের ভয় হয়। সিঁড়ি দিয়ে আলতো পায়ে নামতে নামতে সে বলে, "চেকমেট।"

বিছানায় কতক্ষণ বসেছিল মনে নেই। বাইরে প্রকাশ না পেলেও বেশ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সুস্মিতা। শরীরের কলকবজা নিয়ন্ত্রণে ছিল না। খেলাটা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু ছেলেটা এত নীচ, ভাবা যায়নি। পুরুষদের থেকে দূরে থেকে ভালোই ছিল তো। না-কামানো দাড়ির ঘষায় গলা-বুকে হালকা জ্বালা করছিল। তার অনুতাপ হয়। অস্বস্তি হয়, বাবার সামনে সে যাবে কী করে? তুমুল যৌনতা হলেও খারাপ লাগত না। কনসিভ করলেও না। কিন্তু এই ঘটনাটা তাকে খুব ছোটো করে দিয়েছে। অজান্তে সেও ষড়যন্ত্রের অংশীদার। বাবাকে বড্ড খাটো করা হয়ে গিয়েছে। সুরঞ্জনের চিঠিদুটো সে বের করে তাড়া থেকে, এক্সপায়ার্ড লিখে সরিয়ে রাখে। ওগুলো আর পাঠাতে হবে না।

বাথরুমে শাওয়ার খুলে অনেকক্ষণ চান করল সুস্মিতা, তারপর ফুলতোলা নরম ফুরফুরে ছাপার শাড়ি পরল। খোলা রাস্তায় হাঁটলে ভালো লাগতে পারে। শুয়ে থাকা দেবপ্রসাদকে সুস্মিতা পেরোল মাথা নীচু করে, প্রায় চোখ বুজে। সিঁড়ির মাঝের ধাপ থেকে এক লহমায় দেখে নিল বাবা ঘুমের দেশে। ইশারায় কাজের মেয়েটাকে ডেকে বলল, জাগলে খাবার দিও। মশা মারার ধূপ দিয়ে দাও এখনই। নিজের গলা নিজের কানে কেমন কৈফিয়তের মতো অপ্রস্তুত শোনাল।

দফায় দফায় বৃষ্টি হয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ছুটির সন্ধ্যেয় জমে ওঠা আড্ডা দানা বাঁধছে পথে পথে। ইলেকট্রিক তার, শহিদস্তম্ভ, কবুতরের লগি, নারকোল গাছ আর সব খোঁচা-খোঁচা উঁচু স্ট্রাকচার থেকে ঝুলছে ভেজা ছেঁড়া ঘুড়ি। সেসবের নীচ দিয়ে অনেকক্ষণ এলোমেলো ঘুরল সুস্মিতা। বড়ো রাস্তা ছেড়ে অলিগলিতে। সে বুঝতে পারল পেছনে কোথাও আছে নীলাঞ্জন, পিছু তাকে নিতেই হবে। মেয়েরা এসব টের পায়। কত দূরে আছে ভাবার চেষ্টা করল। মনে হল পেছন ফিরলেই ধরা পড়ে যাবে, পালানোর পথ পাবে না। দরকার নেই। দেখুক। ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করার ইচ্ছে হয়। আগে সে কখনো খেলেনি, খেলায়নি বটে, তবে পারবে নিশ্চিত। মেয়েদের জন্মগত কিছু গুপ্তবিদ্যা কি তার মধ্যে নেই? আছে,

নিশ্চয়ই আছে। এ-ছোকরাকে বিপর্যস্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। যা এর বাবাকে করে তুলবে বিপন্ন। কাঙ্ক্ষিত শাস্তির পথ দেখতে পায় সে, নিজের শান্তির উপায়ও। সে হাঁটে ধীরে ধীরে, ভাবতে ভাবতে হাঁটে। একবার মনে হয়, কখনো না-খেলা এ-খেলার রহস্যময় বাঁকগুলোয় যদি হারিয়ে যায়? না, কিছুই হবে না। মেয়েরা যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারে, প্রবাদেই প্রতিষ্ঠিত। হাঁটতে হাঁটতে সুস্মিতা মোরাম বিছানো গাছে ছাওয়া রাস্তায় পড়ে, এ-পথে আগে আসেনি, নতুন কোথাও বেড়াতে এসেছে মনে হয়। আর মনে পড়ে যায় ছোটোবেলায় সাপ ধরতে আসা এক বাচ্চা বেদের কথা। বাড়ি ভরে গিয়েছিল আগাছায়, আকন্দ-ফণীমনসার জঙ্গল আর ঘাসফুলের ঝোপে। পাগড়ি-পরা একটা কমবয়সি ছেলে এসেছিল সাপুড়ের বাঁশি আর শুকিয়ে যাওয়া কিছু শিকড়বাকড় নিয়ে। কাঁধের ঝোলা থেকে কয়েকটা ফণা তোলা সাপ বের করে দেখিয়ে বলেছিল, যতক্ষণ এই জড়িবুটি আর বিষহরির মন্ত্র সঙ্গে আছে সাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। প্রমাণস্বরূপ সাপের মাথায় সে শিকড় ধরে, ফণা গুটিয়ে সেটা নেতিয়ে যায়। তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হয় ধরার। সাপ সে ধরেনি, সাপই তাকে ধরেছিল। চার ফুটের একটা চন্দ্রবোড়া পায়ে কামড়ে ঝোপে মিলিয়ে যায়। অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতাল যাওয়ার পথে গ্যাঁজলা তুলতে তুলতে ছেলেটা জানায় সেটাই তার প্রথম একক আউটডোর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। " সে কী, আগে কখনো ধরিসনি?" "ধরেছি, বাড়িতে, ওগুলোয় বিষ থাকে না।" "কোন সাহসে এলি? এখন ভালোমন্দ কিছু ঘটলে?" "বেদের ছেলেকে এসব শিখতে হয় নাকি?" ছেলেটাকে বাঁচানো যায়নি। সুস্মিতার মনে হয়, বেদের ছেলে হলেই হয় না, বিপদের মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে হয়। মেয়ে হলেই হয় না, চর্চা লাগে। গুরুমুখী চর্চা। তা ছাড়া, সে কতদূর মেয়ে, তা নিয়েই সন্দেহ হয়। এই নতুন খেলা বুমেরাং হয়ে যাবে না তো। সুরঞ্জনকে মনে পড়ে তার। সে ঠিক করে, করবে। শেষ অবধি করবে।

বড়ো দোকানে ঢুকে দুপুরের পরিকল্পনামতো কালো শেডের সিফনের শাড়ি আর পুরু সোনালি পাড়ের ধুতি কিনে আবার হাঁটা শুরু করে সুস্মিতা। সরু-মোটা, চ্যাপটা-লম্বা না দেখা গলিরাস্তা দিয়ে। হাতের কাছে কত অনাবিষ্কৃত জায়গা। লাস্যময় রতিক্লান্ত মেজাজে সে হাঁটে। ভালোভাবেই বোঝে নীলাঞ্জন পিছু ছাড়েনি। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, রেসের ঘোড়ার মতো গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। সে ফুলে গেছে, সব দিকে বেড়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ চলে খেলার প্রথম ভাগ। একবার পিছু না ফিরেও সুস্মিতার নিশ্চিত বোধ হয়, যখন মনে হয় ফার্স্ট পেপারে পাশ করেছে বাড়ির দিকে এগোয়। গেটের নীচে পৌঁছে থামে সে। বুড়ো বোগেনভেলিয়াটা শেষজীবনের ফুলগুলো নিয়ে ঝুলে আছে, ঝুঁকে পড়েছে। থোকা থোকা গন্ধহীন ফুল সুস্মিতার মাথায় ঠেকছিল। আঠারো বছর আগে এখানেই সিভি দিয়েছিল সুরঞ্জন, এক গরমে পোড়া বৃহস্পতিবারে। এবার আচমকা ঘুরে দাঁড়ায় সুস্মিতা। রাস্তার ওপারে রেসিং সাইকেলের ওপর চমকায় সুরঞ্জনের ছেলে। সুস্মিতা তাকে সোজা দেখে। বয়সে হাজার মাইল কম, কামনায় বাবার হাজার মাইল এগিয়ে। ঠিক করে, নিয়ম ভেঙে একে কোচিংয়ে নেবেই। সুস্মিতার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে। বিনা অনুশীলনে অনায়াসে বসন্তসেনা হয়ে ওঠে কীভাবে। নীলাঞ্জন নামে স্ট্যাচুকে সে আর দেখে না। সিঁড়ির দিকে ঘোরে, নিতম্বের ওপর থেকে অবহেলায় আঁচল সরিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নিজেকে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালি মনে হয় সুস্মিতার। এতদিন সে বাজায়নি, এই যা। বাঁশি তো শরীরেই আছে। যথাস্থানে বাতাস দরকার। তা হয়তো আজকের পর নিজেই পারবে। এক সন্ধ্যায় সে অনেক শিখেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে সুস্মিতার এতক্ষণের অর্জিত আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ল। তার পা মেঝেতে আটকে গেল। গোটা বাড়ি ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে যেতে চাইছে। ইজিচেয়ারে নিশ্চল দেবপ্রসাদকে সে লক্ষ করে না। তার চোখ প্রথমে যায় দাবা বোর্ডের পাশে পড়ে থাকা একটা চওড়া খোলা ডায়েরির দিকে। টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় যার পাতাগুলো উড়ে যেতে চাইছিল। ডায়েরি লিখতে বাবাকে সে কখনো দেখেনি। এমনকী, অসুখের সময় বাবার ঘরে গিয়েও কোনো ডায়েরি নজরে আসেনি।

ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ভাড়ার রসিদ আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছু কোম্পানির শেয়ারের কাগজপত্তর ছাড়া লেখালেখির ধারেকাছে দেখা যায়নি বাবাকে। তাহলে? ডায়েরি কোথা থেকে এল বা কীভাবে এল এগুলো কোনো প্রশ্ন নয়। ঘটনা হল ডায়েরি এসে গেছে। সুস্মিতা জানে এ-অবস্থায় ডায়েরি একা আসে না। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকে ডায়েরি। মুহূর্তগুলো তার চেনা। শিরদাঁড়া দিয়ে সব রক্ত নেমে যায় মেঝে ফুঁড়ে পৃথিবীর পেটে। বাবার দিকে তাকাতে তার ভয় করে। ঘটনার অনিবার্যতাকে মেনে নেওয়ার অবকাশ খোঁজে সে। অথবা, যদি এই ফাঁকে নড়েচড়ে ওঠে দেবপ্রসাদ। তিনটে ডায়েরি, তিনটে মৃত্যু নীরস জীবন এত নাটকীয় হবে কেন? শুকিয়ে যাওয়া লালার ওপর উড়তে থাকা মাছির দিকে না তাকিয়ে সুস্মিতা সোজা হাঁটে বুড়ো কচ্ছপের মতো। পড়ানোর জায়গায় পৌঁছে সে শতরঞ্জির ওপর বসে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকে কিছু সময়। কাঁদে না। শূন্য মনে বসে থাকে। বাবাকে ঠেলাঠেলি করে লাভ নেই। বেঁচে থাকলে যখন হোক উঠবে। না-হলে কিছু করার নেই। ডায়েরি পড়ার কৌতূহল হয় না। পরে ঢের সময় পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ পরে সে ওঠে। একে একে বারান্দার সব আলো জ্বালে। তাড়া করে না। রাস্তার দিকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখে। কাঁদুনে আকাশে সব তারা চাপা পড়ে আছে। সুস্মিতার তাড়া নেই। ধীরে ধীরে একটা খড়ি নিয়ে সে বোর্ডে যায়। তারপর লিখতে শুরু করে বিন্দু টানলে রেখা হয়। একটা রেখা অনন্ত বিন্দুর যোগফল। কিন্তু, কিছু কিছু অস্থির বিন্দু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায়। অন্য বিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয় না। প্রাণহীন একক নক্ষত্রের মতো তারা থেকে যায় নিঃসঙ্গ ও অব্যবহৃত। বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে তারা অন্য নক্ষত্রবিন্দুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে যোগসূত্রের আশায়। লিখতে লিখতে সুস্মিতা বুঝতে পারে অজান্তে সে-ও অটোবায়োগ্রাফির ভূমিকা লিখতে শুরু করেছে। বাঁ-দিকে ফিরে বাবার দিকে তাকায়। কত দূরে মহাশূন্যে ভাসমান নক্ষত্রের মতো লাগে। যে যত দূরে যায় তাকে তত কাছের মনে হয়। মনে হয় বাবার ডায়েরিটা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রাঙ্কে রাখতে হবে অন্য দুই বিন্দুর সঙ্গে। আর মনে হয়, এবার তাকেও একটা ডায়েরি কিনতে হবে। ডাস্টার দিয়ে বোর্ডের লেখা সে মুছে দেয়।

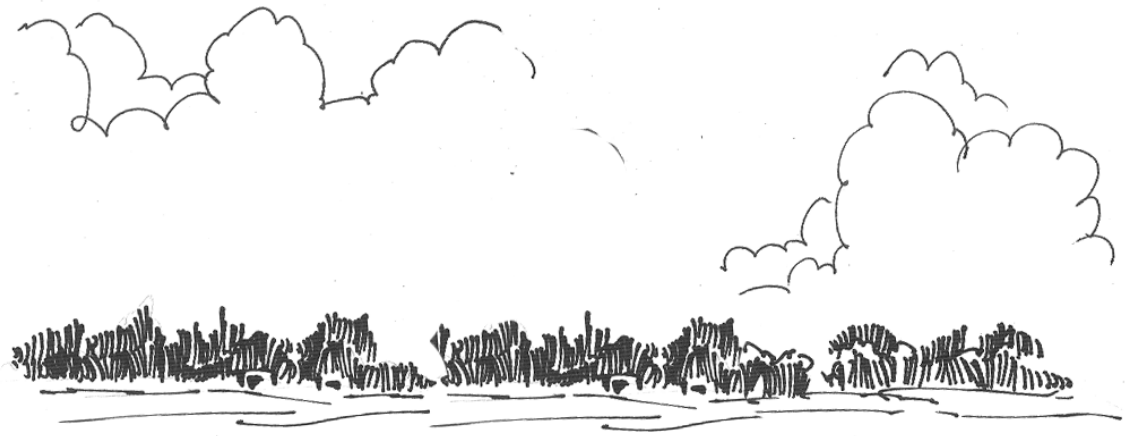

দলিতা ও পবিত্র নদী

ঊর্মি

উত্তরের সুবিশাল পর্বতশ্রেণির বুক থেকে নেমে আসা কিছু পাহাড় আর ছোট ছোট টিলাগুলির কোলে বেড়ে ওঠা আকাশ ছোঁয়া সবুজ জঙ্গল ঘেঁসে ছোট্ট সোনার হেমতাগাঁও।

কাকের বাসার মত বিক্ষিপ্ত অগোছালো ছোট ছোট ঘরগুলি পাহাড় আর সবুজ গাছের স্নেহে লালিত আজীবন। সবুজ গালিচা বিছানো শাদ্বল ভূমিতে বাড়িঘরগুলো দেখলে মনে হবে পৃথিবী যেন আজও সেই আদিম রূপেই রয়েছে। না আছে বিদ্যুৎ, না আছে মোবাইল পরিসেবা। জীবনযাপন এখানে অপরিসীম দুঃখ আর যন্ত্রণার। মাঝে মাঝে লাল কাঁকরের পথগুলি সর্পিলাকারে চলে গেছে ছোট্ট জনপথটির ভেতর দিয়ে। বৈঠকবা জনজাতি আর কিছু শবর এখানে সেইকাল থেকে বাস করে ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। যেখানে দিনের সূর্যের আলো আর রাতের কুয়াশা, বৃষ্টির ঝাপটা, দাপুটে হাওয়া প্রবেশ করে অনায়াসেই। উত্তরের হিমালয়ের কনকনে ঠান্ডায় এই কাকের বাসাগুলো নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টায় আকুলি বিকুলি করে সারাক্ষণ। মুষ্টিমেয় এক দুটি ঘরে ইঁটের গাঁথুনি হয়েছে কি হয়নি। কিছুটা সামনেই কল কল করে বয়ে যাওয়া এক পবিত্র নদী, কোনও এক সময় সে নাকি শোন নদীর সাথে সংযুক্ত ছিল, আর শোন নদী ছিল গঙ্গার সাথে, আজ সেই পবিত্র নদী কালের নিয়মে ক্ষীণ জলধারা হয়ে শোন নদীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেও পবিত্রতার আভিজাত্যের গরিমা এতটুকু ম্লান হয়নি। সমাজের উচ্চশ্রেণিরা তাকে পবিত্র পিতা বলে জানে, তাই এই পবিত্রতা ও সুচিতার নিরিখে এই নদীর জল স্পর্শ করার অধিকার সবার নেই, যেমন নেই বৈঠকবা আর শবর জনজাতির।

ভোরের সূর্য ফুটতে না ফুটতেই এই জাতির মানুষদের খাদ্যান্বেষণে বেরতে হয়, শিকার নিষিদ্ধ বলে তারা বনের কিছু ফল, লতা পাহাড় থেকে নেমে আসা শীর্ণকায়া স্রোতা থেকে

কিছু শামুক কিছু মাছ তাদের জীবনধারণের সহায়ক আজও। তাদের হাতে থাকা জমিও অতি সামান্য। বৈশ্য আর উচ্চবর্ণের মানুষেরাই অধিকাংশ জমির মালিক। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে আসা নাবাল পাথুরে জমিতে যৎসামান্য ফসল ফলিয়েই একপেটা খেয়ে কোনোরকমে তারা জীবন অতিবাহিত করে। সামান্য ফসল বিক্রি করার জন্য অন্তত পনের-কুড়ি কিমি যেতে হয়, পবিত্র নদী যে তাদের চলার পথের অন্তরায়। ঐ নদীর জল স্পর্শ করার মত ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস তাদের নেই। পদপেষণে পার হওয়া তো দূর অস্ত।

জোগুল তার মেয়ে শৈব্যার জন্য কটা শাকপাতা আর দুটো মুরগি বেচে একটা লাল টুকটুকে জামা এনেছে। বাড়ি এসেই উদাত্ত কণ্ঠে ডাক ছাড়ে, 'ও শৈব্যে দেখ না কি নে এলু?'

'কোটে বাপ?' শৈব্যা খুশিতে আত্মহারা হয়।

লোকের অগচোরে জোগুল তার মেয়েকে শৈব্যা বা শৈব্যে বলে ডাকে, অন্য কেউ থাকলে ডাকে না। এই দেবতার নামের সাথে মিল রেখে নাম রেখেছে জানলে পাশের গাঁয়ের উচ্চব্রাহ্মণ আর বৈশ্যরা যে আস্ত রাখবে না সেটা সে জানে। যদি কোনও উচ্চবর্গের কেউ নিজে থেকেই আসে এই এলাকায় কোনও কাজের জন্যে তখন সকলের সামনে ওকে দলিতা বলে ডাকে। এতে অবশ্য সম্মানীয় উচ্চবর্গের লোকেরা খুব খুশি হয়, গর্বে বুক ফুলিয়ে বাঁকা চোখে বার কয়েক সেই দলিতার দিকে কপট লোভাতুর দৃষ্টি হেনে বিদায় নেয়। জোগুল জানে এই মেয়েকে আর বেশিদিন এই ঘরে রাখা যাবে না, ও যা দুরন্ত হয়েছে, শেয়ানি হয়েছে তো বছর খানেক হল, তবু জোগুল ওকে বিয়ে দিতে চায় না, আর একটু মেয়ে লায়েক হোক, কিন্তু নিজেদের সমাজেই তো কত বাধা আর কথা শুনতে হয়।

'দ্যাখরে জোগুলা, শেয়ানি মেয়েক ইভাবে ঘরে রাখা ঠিক হবে না। কবে যে ওরে ধরি জঙ্গলে লি সর্বনাশ করি ছাড়বে টেরও পাবি নে।'

জোগুল জানে ওরা খুব ভুলও বলেনি, ওই উচ্চবর্গের কিছু ছেলেরা যে এদিকে কেন আসে তা তো কারো অজানা নয়।

এই তো সেদিন মালা বলে এক শবর মেয়েকে অত্যাচার করে মেরে ফেলে দিল জঙ্গলে, পুলিশ তো কেসও নিলে না। বললে, পঞ্চ ডেকে মীমাংসা করে নিতে। মালার বাপের আর কত সাহস ওই সব মানুষদের মোকাবিলা করে? শেষে ছেলেগুলোকে কয়েক হাজার জরিমানা করে ছেড়ে দিল, সেই থেকে মালার বাবাও আর এখানে রইলে না। কোথায় গেল কেউ জানে না। মালার বাপের সাথে প্রকৃত শবরের ন্যায়ই বিচার হয়েছে বটে! এখানে আইন আর বিচার ভগবানের সমান। মানুষ যেমন ভগবানকে দেখতে পায় না, তেমনি আইন আর বিচারের আশীর্বাদের বাইরেই এই গাঁও।

শৈব্যার সাথে মালার বড় ভাব ছিল। মেয়েটি বড় দুরন্ত কারও কথা শুনতে চায় না। যদি বাপ বলে, 'ও শৈব্যে ওদিকে কিন্তুক যাবি নে', শৈব্যে সেদিকেই যাবে। সে যে কতবার ওই পবিত্র নদীর দিকটায় গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। জোগুলের ভয় হয়, মালার কথা মনে পড়ে, কিন্তু কী করবে, ওকে যে মাঠে যেতে হয়, মাঝে মাঝে মেয়েকে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু ঘরের কাজ গরু-বাছুরও তো সামলাতে হয় তখন শৈব্যা যেন একটা বৃহৎ ছুটি পায়, দৌড়ে আসে গোয়ালে, কিংবা ছাগল নিয়ে মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন যে মেয়েটার কি হয় ভেবেই জোগুলের প্রায়ই রাতের ঘুম উড়ে যায়।

শৈব্যা মাঝে মাঝেই সেই পবিত্র নদীর কাছে চলে আসে, এই নদী তাকে চুম্বকের মত টানে। কে জানে কী আছে তার মহীমা! ভীষণ ভালো লাগে তার। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে গুটি গুটি পায়ে ছাগল নিয়ে চরাতে আসে। কাকের চোখের মত স্বচ্ছ তার জল, পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, কোন দেবতার আশীর্বাদ ধন্য এই নদী ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। জলের তলার ছোট ছোট নুড়ি পাথরের গায়ে শ্যাওলাগুলি যখন তার শরীরকে স্রোতের অনুকূলে আন্দোলিত করতে থাকে তখন ওর মনে হয় ওই শ্যাওলার মত পাথরের ধারে উবু হয়ে শুয়ে নিজেকেও এভাবে আন্দোলিত করতে। কিন্তু এ যে পবিত্র নদী! এর জল যে ছোঁয়াও বারণ! মনের দুঃখ মনে চেপে সূর্য যখন তার রশ্মি কমাতে কমাতে ওই পাহাড়ের

আড়ালে লুকিয়ে পড়ে তখন সে ঘরে ফেরে। আর সারারাত তার কোমল চোখে ভেসে থাকে পবিত্র নদীর স্বচ্ছ জলধারা। মালা যদি থাকত তবে হয়ত আরো কিছুক্ষণ সে ওখানে থাকত। ওর খুব সাহস ছিল, সে মাঝে মাঝেই বলত, 'একদিন দেখবি আমি এই নদী পার করি ওপারে যাব, আবার আসব।'

'তোর অন্তরে ভয়ডর বলি কিছু নাই?'

'আছে, তাই বলি সবসময় ভয় পেলি হবে? আমরা যত ভয় পাবো তত ওরা ভয় দেখাবে। একটা মনের কথা কই, এই পবিত্র নদী যখন আমাদের এই পূর্বপুরুষের ভিটের উপর দিয়ে বয়ি গেছে তো আমাদের সবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করি গেছে। কেনে তুই জানিস নে, সারা ভারতের সব জায়গাতেই তো কত কত নদী, ওটা তো সবার প্রয়োজনেই।'

পড়াশুনা শেখেনি মালা, তবু ওর কত বুদ্ধি, কত যুক্তি, ও যদি লেখাপড়া জানত তবে না জানি কত বুদ্ধিমতী হত! কী করে লেখাপড়া করবে, নদীর উপর যদি একটা ব্রিজ হত তবু পাঁচ কিমি হেঁটে স্কুলে যাওয়া যেত, কিন্তু এখানে তো ঘুরে যেতে অন্তত পনের কুড়ি কিমি যেতে হয়, এখানে একটা স্কুল হলে খুব ভাল হত। ভাবতে ভাবতে চোখের ঘুম কোথায় যেন পালিয়ে যায়, পাশের ঘর থেকে দড়ির খাটিয়ার উপর শোয়া বাবার নাক ডাকার শব্দ কানে আসে, আকাশের চাঁদটাও হাসতে হাসতে মাঝ আকাশে চলে আসে, তখন একটু ঘুম ঘুম পায়। ভোর হতে না হতেই ছাগলগুলো ম্যাঁ ম্যাঁ করে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। শৈব্যা উঠে পড়ে, আর একটা সুন্দর দিন আর পবিত্র নদীর আহ্বান তাকে তাড়া করে বেড়ায় সারাক্ষণ।

মালা নেই, ও হারিয়ে গেছে ওই পবিত্র নদীর জন্যই। ওর কথাগুলি যেন আজও শৈব্যার অন্তরকে রিনিঝিনি শব্দে কাঁপিয়ে দেয়। 'আমায় ওপার যাওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না দেখিস। এ কেমন বিচার! আমরা কি মানুষ নই?'

হ্যাঁ সে বাধ মানেনি, সুযোগ পেলেই ছুটে আসত পবিত্র নদীর ধারে, ছাগল গরু চরানোর নাম করে চষে বেড়াত সারা জায়গাটা। জিজ্ঞেস করত সেই নদীর স্বচ্ছ জলের ধারার দিকে তাকিয়ে, 'সত্যি কি আমরা নিচু জাত, সত্যিই কি তুমি আমাদের ছোঁয়ায় অপবিত্র হও? কেমন করে হও? তবে তোমার পবিত্র ধারার স্পর্শে আমরা পবিত্র হই না কেন? তোমার এ কেমন বিচার! এই নিষ্ঠুর বিচার মানি না আমরা!'

হ্যাঁ মানেনি মালা, নদীর পাড়ে বসে সেদিন পড়ন্ত সূর্যের অস্তরাগ দেখতে দেখতে কখন যেন আনমনা হয়ে আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু নুড়ি-পাথর দিয়ে একটা একটা করে ঢিল ছুড়ছিল জলে, সেই ঢিল যখন জলের তলদেশে হারিয়ে যাচ্ছিল আর সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল সূর্য ডোবা সেই পাহাড়টার দিকে। কী অপরূপ সুন্দর রঙে সেজে উঠেছে পাহাড়, আর তার ছায়া এসে পড়েছে যেন এই জলে। এতক্ষণে তার ছাগল ছানা কোন সময় পাশের আলু ক্ষেতে প্রবেশ করেছে সে খবর পায়নি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছুটে আসে কিছু উচ্চশ্রেণির লম্পটের দল, 'আরে আরে কার কাজ, এত বড় সাহস, সামান্য শবর হয়ে আমার ক্ষেতে ছাগল ছেড়ে দেওয়া! আর এই নদীতেই পাথর নিক্ষেপ করে অপবিত্র করা!'

রে রে করে তেড়ে এসেছিল ওরা কয়েকজন, মনের খুশি মত লাথি ঘুষি চালিয়েছিল, পবিত্র নদীতে ঢিল ছুড়ে অপরাধের শাস্তি স্বরূপ সেই আলু ক্ষেতেই তাকে বিবস্ত্র করে নৃশংস অত্যাচার করেছিল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সময় মালা বলেছিল, 'এই দিন বেশি দূর

❖

দলিতা তো পবিত্র নদী হতে চেয়েছিল! এবার তাকে ছোঁয় কে? কার সাধ্য তাকে সাজা দেওয়ার। দলিতা আর পবিত্র নদী যে এক হয়ে গেছে!

নয় তোদেরও হবে।' অস্ত্রে কাটা ক্ষত-বিক্ষত দেহটা তারা লুকিয়ে ফেলেছিল জঙ্গলে, তাই বলে খবর প্রচার হতে দেরি হয়নি। না, সাজা হয়নি অপরাধীদের। পবিত্র নদীতে ঢিল ছুঁড়ে আর আলু ক্ষেতে ছাগল ছেড়ে সে যা ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। তবে এভাবে মেরে ফেলা ঠিক হয়নি, হাত পা কেটে ফেললেই হত! গ্রাম পঞ্চায়েতের নিদান। যাই হোক, কিছু টাকা জরিমানা দিলেই হল। উঁচু জাতের আবার অপরাধ কী! সে তো বিধাতার নির্দেশেই বিচার করছে! আর শাস্তি দিচ্ছে সমাজে শৃঙ্খলা আনার জন্যে! হায়রে জাত আর তার বিচার!

মালার বিচারের কথা ভাবলেই শৈব্যার চোখে জল এসে যায়। সেও যে মালার মত দুরন্ত, ঘরে মন টেকে না, তার উপর শেয়ানি হয়ে এখনও বিয়ে হয়নি। সেও আসে, মালার জীবনকে মনে রাখতেই যেন কোনও এক কুহকের টানে সে বারে বারেই এই পবিত্র নদীর ধারে আসে। যেন মালাই তাকে অদৃশ্য আহ্বানে ডেকে নেয়। সেবার কয়েকজন ব্রাহ্মণ একটু ফুল দুব্বো দিয়ে পুজো করে সেই নদীকে আবার পবিত্র করেছিল। সামান্য হাতের ছোঁয়া পাথরেও যে জল অপবিত্র হয়, তবে সেই জল কবে পবিত্র ছিল! ঠিকই বলত মালা, 'তবে আমরা কেন তার ছোঁয়ায় পবিত্র হই না?'

কে দেবে এর উত্তর? এই দেশে আইন নেই, কিংবা আইনও ভগবানের মত যার দেখা পাওয়া যায় না। ফলে আইনের আশীর্বাদ এখানে এসে পৌঁছায়নি। আইন আর সমাজ তো এক নয়, সমাজ ঘরে এসে শাস্তি দিতে পারে, আইন ঘরে এসে রক্ষা করতে পারে না, সেটা একটা বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ। সূর্যাস্তের পর নিজের ঘরে ফিরে গেলে জোগুল বকে, 'তুই আবার কেনে রে নদীর ধার? কী আছে ওটে?'

ওখানে কী আছে কী নেই সেটা শৈব্যা বলে না, ওখানে আছে বন্দি পাখির মুক্তির উল্লাস, আছে শেকল ছেঁড়ার গান, আছে ভৈরবী রাগিনীর সুর, আছে ক্রন্দসীর তাণ্ডব! বাড়িতে যতই শৈব্যাকে নদীর ধারে যেতে নিষেধ করে ততই অবাধ্য হয় সে। ততই সে ডানা মেলে ধরে আকাশে, ওই নদীই তাকে আবার কুহকিনীর মত কাছে ডাকে, বলে 'আয়! আসবি না? আমার বুকে একটু সাঁতার দিবি না!'

ছুটে যায় শৈব্যা, সেই শ্যাওলার মত পাথরে আটকে থেকেও যে নদীর বুকে সাঁতার কাটা যায়, জলের তলার মাছেদের মত স্বাধীন ভাবে পাখনা মেলা যায়, সেই ডাক কি পারে শৈব্যা ফেরাতে! মাঝরাতে উঠে বেরিয়ে যায় সেই নদীর ধারে। এক পা এক পা করে এগোয় জলের দিকে, আর একটু দূরেই সেই পবিত্র জল, তার ছোঁয়ায় একবার পবিত্র হতে চায়। আর মনের মত সাঁতরে বেড়োতে চায়। সূর্য উদয়ের আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকি, শৈব্যা নেমে পড়ে জলে, আহ! কী মিষ্টি মধুর সেই স্পর্শ! যেন আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে শৈব্যাকে। শরীরটা ঝুঁকে আনে জলের বুকে, পাথরের বুকে হাত দিয়ে ধরে, যেভাবে শ্যাওলাগুলি পাথরকে ধরে রাখে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে, তার পর নিজেকে ছেড়ে দেয়, জলের স্রোতের ধারার সাথে শৈব্যা ভাসতে থাকে, মাছের মত আন্দোলিত হয় শরীর। অদ্ভুত বিভঙ্গে শরীর দাপিয়ে ফুটে ওঠে এক অপার শিল্প সুষমা। নৃত্যরতা জলও তাকে গভীর ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখে। হ্যাঁ এটাই তো পরম মুক্তি, পবিত্র নদী তাকে আবার পবিত্রতা দান করেছে। আজলা ভরে পান করে সেই নদীর সুমিষ্ট জল। চুলের ঝাড়ুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আবার ডুব দেয়, তবু মনের সাধ মেটে না। সূর্যের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে শৈব্যার শরীরে, তিনিও যেন চাইছেন শৈব্যা এই পবিত্র নদীতে মিশে যাক। কিছু সময় পর, কোথা থেকে একটা অদ্ভুত চিৎকার তার কানে আসে। এক দল ছেলে উন্মত্তের মত হাতে লাঠি দা কুঠার নিয়ে উল্লাস করে আসছে। তাদের মুখে এক রকমের হুংকার। 'মার মেয়েটাকে, আবার আমাদের পবিত্র নদীকে অপবিত্র করার সাহস দেখিয়েছে, মেরে ফেল মাগীকে। নোংরা বৈঠকবা!'

শৈব্যা ভয়ে জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে যায়, ওরা আবার এসেছে, যেমন করে মালার সময় এসেছিল, আবার সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু এতগুলো পশুর সাথে সে পারবে কেন! ওরা শৈব্যাকে চুলের মুঠি ধরে নদীর জলে সেই পাথরে মুখ থেতলে দিতে থাকে, আবার উপরে তুলে থেতলানোর চেষ্টা করে, তখন শৈব্যা একবার শ্বাস নেয়। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই বার বার আঘাত করে। সেই খবর পেয়ে গ্রামের আর সব শবর বৈঠকবারা এসে হাতে পায়ে ধরলে প্রাণে মারার থেকে মুক্তি পায়।

না মরেনি শৈব্যা, সে শুধু স্থির হয়ে ছিল, ওর চোখ দিয়ে জল বেরয় নি, বেরিয়েছিল আগুনের ফুলকি। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'কাপুরুষ!'

এই শেষ কথা, শৈব্যা আর কথা বলেনি, সবাই বলে ও পাগল হয়ে গেছে, এবার ওকে হয়ত ক্ষমা করা যাবে। তাই আর ওকে নিয়েও ভাবনা নেই বাড়ির কারো, এমনকি সমাজের। সব আবার আগের মত স্বাভাবিক গতিময় হয়ে ওঠে, আবার জঙ্গলের মাথায় লাল সূর্য ওঠে, আবার পাহাড়ের ওপারে সমস্ত জগতকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বিদায় নেয়, সারাদিন সবার কাজ হয়, রাত হলে জঙ্গলের ফল দিয়ে বানানো মাদক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু জেগে থাকে শৈব্যা, ওর চোখে ঘুম নেই। ও সারারাত ঘুরে বেড়ায় আবার চলে আসে। ও কোথায় যায় কি করে কেউ খোঁজ রাখে না। ও যা পায় তাই কুড়িয়ে জমিয়ে রাখে একটা বস্তায়, সারাদিন ওটাই ওর কাজ।

মাস কয়েক পরের ঘটনা, একদিন ভোর হতে না হতে ওই ওপার থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশ ছেয়ে হাওয়ায় উড়ে এদিকেই আসে। গাঁয়ের বৈঠকবা আর শবররা ভোর ভোরেই উঠে পড়ে। সবার নজর যায়

ওদিকেই। ওপারে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যদের গাঁয়ে আগুন লেগেছে। চিৎকার আর চিৎকার, এত বড় আগুন কিভাবে লাগল কেউ জানে না। ফাল্গুন মাস, গাছ-গাছালির পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, খড়ের পুঁজিগুলো জ্বলছে দাউদাউ করে, আর একটু হলেই অরণ্যে চলে আসবে। বৈঠকবা জনজাতি আসে, আসে শবর থেকে সব নিচু শ্রেণিরা, জল চাই, চাই জল, ওই আগুন নেভাতে প্রচুর জল চাই, কিন্তু জল কোথায়, সেই পবিত্র নদী ছাড়া তো আর উপায় নেই। এই নদী পেরনোর সাহস নেই কারও। এ যে পবিত্র নদী! ওরা জানে ওরা যদি সবাই মিলে বালতি বালতি জল নিয়ে ছড়িয়ে দিত তবে আগুন নেভানো সম্ভব হত, কিন্তু এত দুঃসাহস দেখাবে কে? চিৎকার থামেনি। শোনা গেল কয়েকজন সেই আগুনে পুড়ে মারা গেছে। কারা ওরা কে জানে।

সকালের সূর্য আবার নির্মল হাসি মুখ নিয়ে উদিত হয়। একটি মেয়েকে ওরা ওপার থেকে এদিকেই সেই নদীর অভিমুখে আসতে দেখে, সে খুব ধীর ভাবে এগোয়, প্রত্যয়ের সাথে এগোয়, বিজয়ীর মত তার চলনভঙ্গি। তাকে এখনও চেনা যায় না, ওর চুলগুলি এলোমেলো ভাবে বাতাসে উড়তে থাকে, ওর গায়ের কাপড় উড়ে উড়ে পেছনে সরে যায়, সে এগোয়, সেই পবিত্র জলধারার দিকে এগোয়। যখন প্রায় জলের কাছে চলে আসে তখন কে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'আরে এ তো আমাদের দলিতা! ও ওখানে কেন? ও দলিতা, ও শৈব্যে, তুই নদী পেরোলি কেন? এবার তোকে আর বাঁচতে দেবে না, একেবারেই মেরে ফেলবে রে শৈব্যা।' জোগুল চিৎকার করে। 'ও শৈব্যে? হায় কী করলি!'

না শৈব্যা আর কথা শোনে না। সে হাসতে হাসতে পবিত্র জলে এসে তার পা ছোঁয়ায়, একটু একটু করে গভীরে নামে, হাঁটু ছোঁয় সেই পবিত্র নদীর জল, দু হাতে যেন জড়িয়ে ধরতে চায় এই নদীকে, কটিদেশ ডুবে যায়, ডুবে যায় ওর আঘাতের ঘায়ে কালশিটে পড়া পেটের ঊর্ধ্বাংশ, ক্রমে ক্রমে ডোবে ওর থেতলে দেওয়া স্তন যুগল, ওর চুপসে যাওয়া গলা, তবুও সবাই ডাকে, 'ও শৈব্যা ও শৈব্যা?' এবার থুতনি ছোঁয় জল, ডুবে যায় কপাল, মাথা, কয়েকটা এলোমেলো চুল ভেসে ওঠে জলের তোড়ে। তারপর আর কিছুই নেই। পবিত্র নদী আবার আপন মহিমায় বইতে থাকে দলিতার শরীরের উপর দিয়ে। এপারে সবার হাত মাথা আর কপালে। 'শৈব্যা তুই কি করলি!'

ওপার থেকে ছুটে আসে সেই সব ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যের দল, তাদের মুখে কর্কশ ধ্বনি, 'ওই পাগলি সারা গাঁয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকটি বাড়ির দরজা লোহার শেকলে বেঁধে নিয়েছে, ওকে আর বাঁচতে দেব না আমরা। শালা নীচ! শালা দলিত!'

জলের নিচে শায়িত শৈব্যার কানে যায় সেই আওয়াজ। সে প্রাণ খুলে হাসে, ভয়ংকর সেই হাসি। সেই হাসির তরঙ্গে মোথিত হয়ে ওঠে সেই জল। সে ভেসে যায় জলের তলায় তলায় সেই শ্যাওলাদের মত, স্বাধীন মাছেদের মত। সে তো এটাই চেয়েছিল। দলিতা তো পবিত্র নদী হতে চেয়েছিল! এবার তাকে ছোঁয় কে? কার সাধ্য তাকে সাজা দেওয়ার। দলিতা আর পবিত্র নদী যে এক হয়ে গেছে!

জন্ম কোচবিহার জেলায়। হাইস্কুলের শিক্ষিকা। কোচবিহার জেলার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক। স্নাতকোত্তর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড করার পর শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সাহিত্য সৃষ্টি করা যখন ছোটবেলা থেকেই নেশা তখন শুধু এইটকুতেই থেমে থাকেন কি করে? শুরু হয় পথ চলা। 'আজ শুক্রবার' পত্রিকায় নিয়মিত ছোট গল্পের লেখিকা। ছোট গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সমাজের নানান দিক। সম্প্রতি প্রকাশিত ছোট গল্পের বই 'আট শূন্যের হিসেব'।

Khosiat Rustam
(Uzbekistan)

Khosiat Rustam was born in 1971 in the village of Olmos in the Chust district of Namangan Province. She studied at the Journalism Faculty of the National University of Uzbekistan (1988-1993) and at the University of Higher Literature (2001-2004).

She has been serving as editor-in-chief of the World of the Book newspaper since 2015. The poetry books which published by Khosiat Rustam : Osmondagi uy (The House In The Sky) (1997); Najot (Rescue) (2003); Rido (The mantle) (2004); Devor (Wall) (2006) August (2008); Ishg'ol (Occupation) (2011); 40:0 (2011); Unutilgan yillar (Forgotten years) (2014); Yupanch (Consolation) (2005); Bebosh bulutlar (Uncontrolled clouds) (2019)

What is more, several poetry books by Khosiat Rustam have been published in foreign languages and in other countries including: Ertasi yo'q kunlar (The days without tomorrow) (Published in Turkey, translated into Turkish language by Bashir Oksuz (2008); Qorxunç (Fear) (Published in Azerbaijan, translated into Azerbaijani by Resmiya Sabir).(2009). Her books have also been published in Kazakhstan, Columbia, Russia, USA and other countries in Kazakh, Spanish, Russian, English, German and other languages.

Khosiat Rustam participated in several international poetry festivals and was a winner in the international poetry festival in Thailand in 2018 for her creativity. She has translated poems by Marina Tsvetaeva, Eugene Eutushenko, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Ramiz Rovshen, Nigar Refibeyli, Riza Khalil, Neguib Fazil Kisakurak, Khusnu Daglarja and other Russian, Turkish Azerbaijani poems from Russian, Azerbaijani, Turkish into Uzbek language.

Khosiat Rustam was awarded with the 'Shukhrat' ('Fame') medal in 2004 and is a member of the Writers Union of Uzbekistan. She has been awarded with the international award of Azerbaijan named after Mikail Mushfeek in 2015. She has also been a member of Writers Union of Azerbaijan since 2019.

1.
Where did you go as so many years passed ?
Was life a long and bleak dream for you ?
Why couldn't you knock on my door
at the last –
Just once as you chanced to pass through?
I simply can't stay in this world any more.
I've put on my coat and I'm ready to go!
But you remain behind in my life as before –
Like a host seeing me off at the door for show.

2.
I am leaving the road of life right now.
I am merely an artist's tired sketch.
It maybe a bird, but it's on my brow,
Or perhaps my raw mother's milk made
me retch.
Who can I hate?
Who can I complain to?
Where in this moment should I be?
Is that why this poem is vulgar pain too?
And why it's utterly putrid... maybe?

3.
When I will come here again?
What will my visit mean?
I'm forever trembling with the strain
Like waves out on the seas…
If only I were scattered
Through this world's glittering sheen,
Like the tent of a roving Gipsy,
Like the characters in Chinese.

4.
The wind came by chance and left
again swiftly…
My window panes took a deep breath
and sighed.
It was ambling down our passageway
carelessly,
But it tipped my fragile heart on its side.
Where would it take me, and to which street,
As it overturned my life of before?
Yet my fear dispersed like a mist at my feet.
And there was no trace of my past any more.
Oh how much I loved you that day!
The trees on the streets and the moon
saw it all!
Its long silvery beams were showing the way,
The Earth is deeper than me as I fall...
My mind was confused, my heart
was quivering
The window of my soul was blown open too.
But luckily, you were above me delivering
Luckily it was you... it was you…

5.
Sometimes the wind is cross
And turns the opposite way.
It rolls its eyes at a loss,
Like grapes turn through the day.
The dry leaves of a bird’s nest
In deep puddles decay.
Empty nuts fill the breast
Of autumn passing away.

6.
The dark, stormy sky has got darker still.
It’s impossible to see to the other side.
The entire world is now dark-filled;
Even your big house seems to hide.
It's long until dawn and the wind's
gusting high.
The dessicated leaves will not recover.
Until summer returns, the trees must rely
On the ground – the garden's autumn is over.

The moon is rising. Can I hold on though?
Maybe the moonlight will linger a while.
The oblivious moon has forgotten to go,
And hangs there baffled over your roof tiles.

7.

I want to shout and yet I stay quiet.
I'm forever retreating to the back of the stage.
But a tiny snowdrop shows no fright –
It's cracked through the soil for many an age.
How and where does it find the will?
It's not scared of rocks, wind nor rain.
Yet there are such heavy feet stlll
That can pound a head in the ground again.
I am burning. My heart's full of fire.
Doomsday is blazing in my soul's glass!
But please God, there is one thing I desire:
To have at least the strength of grass.

8.

A tongue alone cannot endure,
It just can never behave.
It is quite impossible to keep pure
All the voices the universe gave.
Fields and steppes may run amok,
But the stone sleeps calmly through.
And trees keep their steady stock
Against the wind's tattoo.

9.

You're staring! Did you have
something to say?
I see your shadow on the floor in front of me.
Your light comes through my window
anyway–
No matter how hard you try, I can still see.
It’s like this each day: from the dawn skies,
Before the early breeze starts to arise,

Without hesitation, the thick-faced sun
Touches each of my windows one by one.
The gardens give all their love out
To the whole world roundabout.
But that stain from the sun will remain
In my carefully cleaned windowpane.

10.

The wind can't shift the Earth from its place,
A hurricane can't stop the sea.
And Life! For all your famous face,
You won't find killing so easy.
Lightning cannot smash the sky.
Autumn can't uproot trees.
My head is on the block, oh my –
Face to face with its decease.
You looked harmless from outside.
Are we that different, do you think?
But don't go drowning in the tide –
A cold fish can't drown or sink.

Sherzod Artikov

(Uzbekistan)

Sherzod Artikov was born in 1985 in the city of Marghilan of Uzbekistan. He graduated from Fergana Polytechnic institute in 2005. He was one of the winners of the national literary contest 'My Pearl Region' in the direction of prose in 2019. In 2020, his first authorship book 'The Autumn's Symphony' was published in Uzbekistan by publishing house 'Yangi Asr Avlodi'. In 2021, his works were published in the anthology books called 'World Writers' in Bangladesh, 'Asia sings' and 'Mediterranean Waves' in Egypt, 'Emerging horizons' in India, 'Healing through verses' in Canada in English language and his authorship book 'The autumn's symphony' was published in Spanish and English in Cuba by Argos Iberoamericana Publishing House.

The Spring

I like the autumn
I like the golden look of it
I like the smell of the leaves
The cold rains with a sour taste
And thick mists with a sad sigh.
Now it is springtime outside
It rustles as if dancing
A soft wind blows from the south
Passerby pass with a smile on their faces
The abricos tree is blooming madly.
I sit in front of the window like this:
From morning till evening serenely
With a cough on my throat
With a pain in my stomach
With a cup of hot coffee
And a book by Garsia Marquez in my hands.
Sometimes I glance longingly
To nature, to people, to everyone
And mutter " oh, where are you my autumn?"
But instead of answer
The cheerful spring again
Makes a rustling noise there.

Life without principle

I live without principle
Without any instructions whatsoever
Without goddamn idols
Without authorities like God.
My life is so simple:
I get up in the early morning
Run for losing the weight
Taking up boxing in the yard
With an uncomfortably hanging bag.
Then I dress reluctantly before breakfast
And in it I drink hot tea or coffee
Enjoying it fleetingly by closing eyes.
Then with an old-fashioned diplomat
I rush off to a bloody job
That tires me out
That poisons my soul
That makes me a painful puppet.
Also in evening without any change
Do like what I did in the morning
Run for losing the weight
Taking up boxing in the yard
And do not forget about tea or coffee.
The same…
Only one change
Before going to bed
I reluctantly get undress instead of dressing.

Cortazar's Tomb

The great one's ashes rest here
In the cemetery of vain Paris.
Among strangers a lonely tomb
As if staring into the horizon sadly.
From here impossible it is
To see kindly land of Argentine
The homeland where he was born
The homeland where was spent
His childhood and adolescence.
No, you can not see it,
Can not see it at all, painful tomb
It's as obvious as
Two and two is equal to four.
But, a stubborn grave
Does not want to admit it
And it's capricious claiming
To the gray clouds
To a half-naked trees
That beyond the horizon shines
The radiant smile of the motherland.

Sky's tears

Ruined and broken
Land of Palestine
Day and night
Under the bombs.
Blood flows like a river
Poisoned life of people
Dying children, old men
Dying fathers, mothers and sons.
Families are being destroyed
Houses, walls are being crumled
Nature is being terrified.
But, the world is silent
The Mankind is silent
The God is silent.
Maybe cries only the sky
Because of the cruelty of humanity
Carrying a complaint against them
Or being angry at their silence.
Maybe cries only the sky
Who caught in deep shock

Whispering in the company of Earth
Turning whose tears into the rain.
Maybe cries only the sky
For being not able to understand
In spite of the endless thoughts:
Why so bloodily killing each other
Brothers who in one land were born.

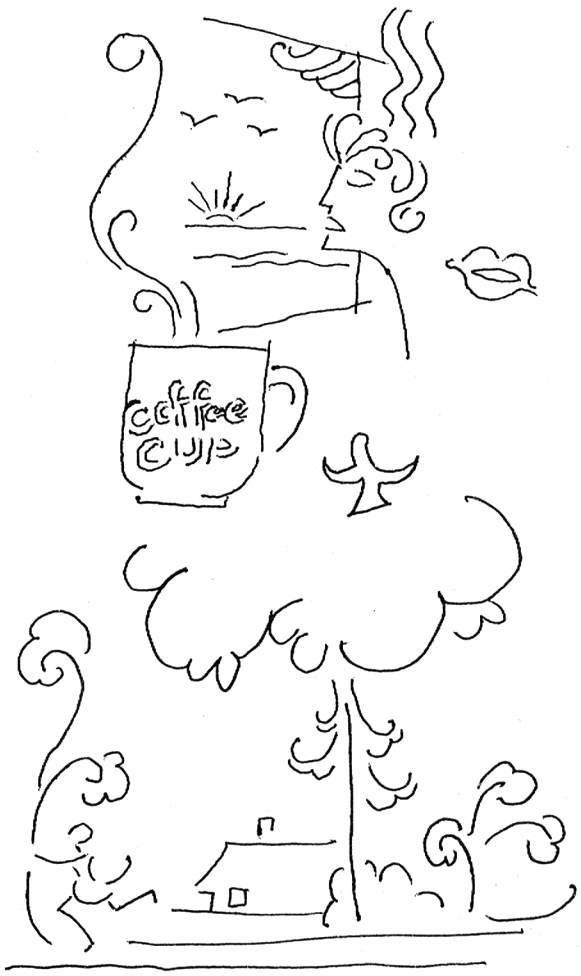

A Letter to Marquez

Teacher,
I pray for your homeland!
Now there reigns
Chaos, turmoil, bloodshed.
A threat to peace grows
Human rights are being destroyed
Justice disappeared.
Your Macondo weeps
Where you're safe and comfortable
Lived in past with a brunette Mercedes.
Where you wrote the fabulous Buendia family
And described the formidable Patriarch.
Your Makondo weeps
Where you breathed the fresh air
Opening the window in the early morning
Waiting for the sun on the windowsill
With a cup of coffee in your hand.
You Macondo weeps Master
Where you sang a serenade
Cheerfully with a smile on your lips.
Danced the tango, played tirelessly
With a glass of bitter tequila
Wearing a big branded hat.

Alina Velazco-Ramos

(Mexico)

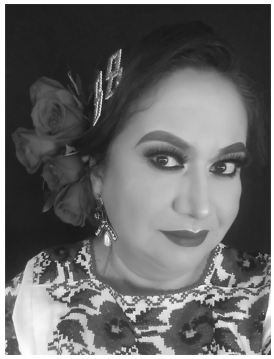

Writer, Poet, Journalist and Cultural Manager. Studied her major in Literature Creation from the National Institute of Fine Arts and has been present in lectures in multiple forums across México, Colombia, Chile, Brazil, Romania and India.

Honorable Mention in Poetry genre of the "XLIV International Poetry and Narrative Contest Audiobook Voices of Today, 2015", Argentina. Finalist in the contest "The Tenth is a Tree" of the Arts and Crafts Museum of Santa Clara, Cuba. Honorable Mention in the "V Edition of the International Poetry Contest 2018 of Altino", Italy. Has served as a jury in various literary competitions.

Translated into Romanian, English, Italian and Portuguese; published in México, Chile, Romania, Basque Country, Dominican Republic, Colombia, Spain, Peru, Argentina, Cuba, United States, Bolivia, Canada, Italy, Honduras, Brazil and India.

1.

Haré poesía en tu piel.
Te escribiré en cada centímetro.
Vendaré tus ojos para que,
a ciegas,
nos sientas por completo
ami y al poema que surgirá de nuestro encuentro.
Mis besos te erizarán recorriéndote
con una lentitud *non sancta*
hasta llegar a lo erógeno de tu entrepierna.
Y mi lengua continuará escribiendo poemas en ti,
para nosotros.

1. **(translation)**

I will make poetry on your skin.
I will write you on every inch.
I will blindfold your eyes so that,
blindly,
feel us completely
me and the poem that will emerge from our meeting.
My kisses will bristle you, going through you
with unholy slowness
until you reach the erogenous part of your crotch.
And my tongue will continue to write poems on you,
forus.

2.

Me seduces con tu voz y me desnudas con esa forma que tienes de mirarme.
Llegas al centro de mi alma
cada vez que pronuncias la certera frase que destroza mi coraza
y te metes al fondo de mi libido
con tan solo un movimiento silencioso, licencioso de tu lengua.
Aún tu piel no se ha acercado a la mía y ya me conviertes en agua.
Cada noche.
Religiosa pero profanamente.
En el ritual que me transforma en pecado
y me santifica las vidas en que hemos coincidido,
que libera la que tengo
y me redime de las que debía regresar pero ya no tendré que volver a ser/estar.
Anhelo tu abrazo y fundirme en tu pecho.
Y resguardarme de todo porque,
ahora lo sé de cierto, que es tu corazón mi lugar seguro.
El que no me permitirá ser alcanzada por mis demonios,
aunque me entregará sin pudor a la lascivia de los tuyo.
Me seduces todo tú:
tus palabras, tus miradas, tus actitudes y tus movimientos
y esa forma tan especial que tienes de sonreír
cada vez que la melodía termina y tu voz se queda en silencio.
Y me seduce aún más el cerrar los ojos y sentir tu abrazo al final de nuestro abraso.
En ese instante en que nuestros demonios suspiren
gimiendo por un poco más de piel con piel.
agradeciendo la paz que les brindamos en esos segundos en los que
calman su sed y pueden conocer la castidad del amor que tú y yo nos profesamos.

2. **(translation)**

You seduce me with your voice and undress me with that way you look at me.
You reach the center of my soul
every time you utter the accurate phrase that destroys my shell
and you get to the bottom of my libido
with just a silent, licentious movement of your tongue.
Your skin has not yet come close to mine and you already turn me into water.
Each night.
Religiously but profanely.
In the ritual that transforms me into sin
and sanctifies the lives in which we have coincided,
that frees the one that I have
and it redeems me from those that I had to return but I will no longer have to be / be again.
I long for your embrace and melt into your chest.
And protect me from everything because,
Now I know for sure, that your heart is my safe place.
The one who will not allow me to be reached by my demons,
although he will deliver me shamelessly to the lasciviousness of yours.
You seduce me all:
your words, your looks, your attitudes and your movements
and that special way you have to smile
every time the melody ends and your voice falls silent.
And I am even more seduced by closing my eyes and feeling your embrace at the end of our embrace.
In that instant when our demons sigh
moaning for a little more skin to skin.
thanking the peace that we offer them in those seconds in which
they quench their thirst and they can know the chastity of the love that you and I profess.

3.

Suena el despertador,
a tientas lo busco para llevarlo a un lugar común:
esos 5 minutos más que todos ansiamos.
Cuando ya no puedo postergar el despertarme por completo,
los abro y lo primero que me encuentro son los tuyos.
Y se que es la señal de que mi día irá mejor que nunca.
Los adoro con una fascinación extraña.
Confieso que desde el momento en que los conocí los amé.
Por estar llenos de amor y de justicia por el mundo.

Y por el modo en que sonríen a la vez que hablas de tus pasiones.
Por la impudicia con la que se vuelven agua,
sin importar nada más que dejar ir los sentimientos que los rebasan.
Porque encuentran la belleza en la enorme complejidad de la luna
y en las cosas breves, casi insignificantes,
como el alma que se contiene en mi cuerpo,
o en mi sexo que se contrae ante una palabra tuya.
Y por cómo me ven cada noche al volver del trabajo:
con un tipo de lujuria casta o una casta lujuria,
porque a pesar de todo, me permiten ser,
más que hermosa. Perfecta para ti.

3. **(translation)**

The alarm sounds,
I grope for it to bring it to a common place:
those 5 more minutes we all crave.
When I can no longer put off waking up completely,
I open them and the first thing I find are yours.
And I know that it is the sign that my day will go better than ever.
I adore them with a strange fascination.
I confess that from the moment I met them I loved them.
For being full of love and justice for the world.
And by the way they smile while you talk about your passions.
Because of the impudence with which they turn into water,
without caring about anything other than letting go of the feelings that exceed them.
Because they find beauty in the enormous complexity of the moon
and in brief, almost insignificant things,
like the soul that is contained in my body,
or in my sex that contracts at your word.
And for how they see me every night when I come home from work:
With a kind of chaste lust or a chaste lust,
because despite everything, they allow me to be,
more than beautiful. Perfect for you.

4.

Deseo recuperar la libertad en tu abrazo,
que me lleves al orden al que no sé por dónde comenzar.
Aprender de tu sabiduría y seguirte
en la paz de los siglos que ya no necesitaba vivir.
Recobrar el amor, resurgir. Ya no estar oculta.
Reencontrarme con ese sitio tuyo que me enloquece,
con la claridad de los sentimientos que me inundan
cada vez que me veo en tu alma.
Ansío tomar nuevamente el papiro
y decorarlo por ambos lados, pero que mis letras nunca sean tuyas.
Para que permanezcas junto a mi
la eternidad que necesito para hablarte del amor que me produces.

4. **(translation)**

I wish to recover freedom in your embrace,
that you take me to the order that I don't know where to start.
Learn from your wisdom and follow you
in the peace of the centuries that no longer needed to live.
Recover love, resurface. No longer be hidden.
Find myself again with that place of yours that drives me crazy,
with the clarity of the feelings that flood me
every time I see myself in your soul.
I long to take the papyrus again
and decorate it on both sides, but may my letters never be yours.
For you to stay with me
the eternity I need to talk to you about the love you give me.

5.

Hoy hubo luna llena
y como cada noche en que es así
salí a cantarle. A rendirle tributo.

Aunque esta vez fue diferente.

Le pedí qué me licántropo regresara,
pero no fue así.
El pasó la noche con su manada verdadera
y con el despertar del embrujo,
mi voz perdió los motivos para volver a sonar.

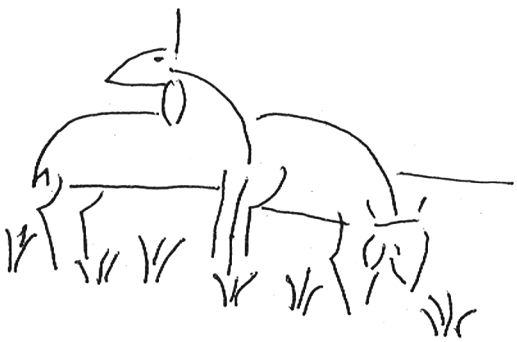

5. **(translation)**

Today there was a full moon
and like every night that is like this
I went out to sing to her. To pay tribute.

Although this time was different.

I asked him that I was a lycanthrope to return,
but it was not like that.
He spent the night with his true pack
and with the awakening of the spell,
my voice lost the reasons to sound again.

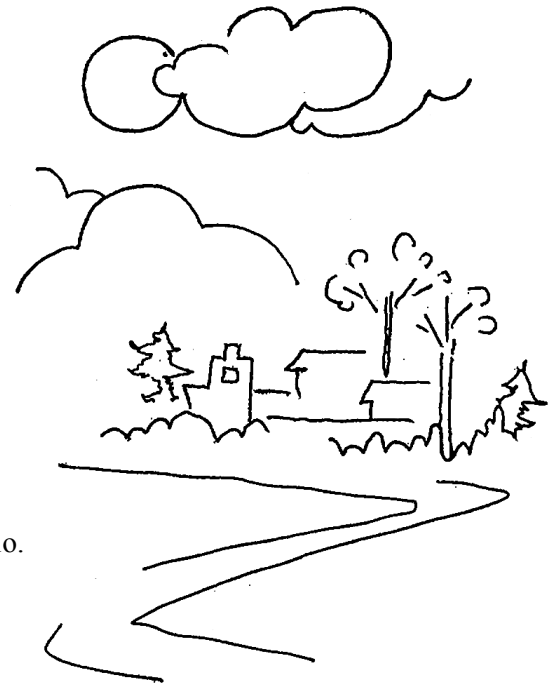

Te Encontre

Te encontré en una tarde de invierno.
Entre el frio y el anhelo
de alguien que me diera amor.

Te encontré en la tarde invernal,
entre el invierno de Vivaldi y una taza de té egipcio.

Te escuché como una sonata lenta.
Sentí tu ritmo y tus notas dentro de mi cabeza.

Te vi en los dedos del pianista y en la mano del director.

Tú eres mi música.
Me dejas volar contigo en las notas musicales.

Eres mi flauta.
Cuando te toco con mis labios, escucho tu música del amor.

Eres mi arpa.
Cuando mis dedos te tocan,
produces hermosos sonidos que me hacen feliz.

Tú eres mi piano.
Cuando mi alma te toca, haces realidad nuestra amorosa sinfonía.

Me encanta nuestra sinfonía.
Caliente.
Húmeda.
Llena de color y plena de sentimientos.
Transformas mi invierno en primavera solo con tu voz...

La sinfonía caliente y húmeda comienza lento.
Y llega hasta el rápido *finale*.
de tu sentimiento y el mío.

I Found You

I found you on a winter afternoon.
Between the cold and the longing
Of someone who would give me love

I found you in the winter afternoon
between Vivaldi's winter and a cup of Egyptian tea.

I heard you like a slow sonata.
I felt your rhythm and your notes inside my head.

I saw you in the fingers of the pianist and in the hand of the conductor.

You are my music.
You let me fly with you on the musical notes.

You are my flute.
When I touch you with my lips, I listen to your music of love.

You are my harp.
When my fingers touch you
you produce beautiful sounds that make me happy.

You are my piano.
When my soul touches you, you make our loving symphony come true.

I love our symphony.
Hot.
Damp
Full of color and full of feelings.
You transform my winter into spring just with your voice...

The hot and humid symphony starts out slow.
And it goes to the fast finale.
of your feeling and mine.

T a n i a   M a r t i n e z   S u a r e z
(Mexico)

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (énfasis en Estudios Multiculturales) por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, trabajo en la misma Universidad desde hace 12 años, laboré en el Centro de Educación Continua y a Distancia y actualmente colaboro en el Sistema Universitario de Medios Autónomos; soy escritora y gestora cultural. Formo parte del Círculo de Escritoras Margarita Michelena y soy parte de la mesa directiva de la Academia Nacional de Poesía capítulo Hidalgo de la Ilustre Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México. Mi trabajo literario de encuentra publicado en diversas plataformas digitales, así como compilado en diversas Antologías físicas y digitales.
Mi primer poemario unipersonal se encuentra en proceso de edición.

Bioma desértico

El viento
Y la lluvia,
La lluvia y el viento,
Se arrojan sobre el concreto,
Debajo de este la tierra que clama,
La lluvia no llega, no llegan las lagrimas,
El viento revuelve las ideas,
Y los pasos,
los días en el calendario,
El tiempo es inexacto y precario,
El polvo del viento se disuelve en el agua.

El viento
Y la lluvia,
La lluvia y el viento.

El viento
Y la lluvia,
La lluvia y el viento.

La vida va ligera, los pesados somos los humanos

Hay una gracia sutil en las personas que pueden afrontar sus días con calma,
Con paciencia y tranquilidad,
Todos tenemos problemas…
Pero esa fiereza de quienes los asumen con sosiego
Es de un valor indescriptible,

Lo más fácil es llorar,
Es montar en cólera contra todo y contra todos,
Eso es sencillo…
Pero quien toma entre sus manos la posibilidad la templanza puede sin duda ver con claridad.

Es un regalo maravilloso mirar a traves de una dificultad,
No enfrascarse en una discusión,
No reaccionar ante quien nos provoca,
Y simplemente continuar tú camino.

No siempre lo entendí así,
Mi respuesta muchas veces ha sido retadora,
He vociferado malas palabras,
Y reaccionado mal ante las circunstancias,
Sobre todo cuando el resultado no es el que esperaba,
Sobre todo cuando me agredieron,
O insultaron a quien amo.

No siempre pude voltear con una sonrisa en el rostro,
Y alejarme serena de una mala situación.

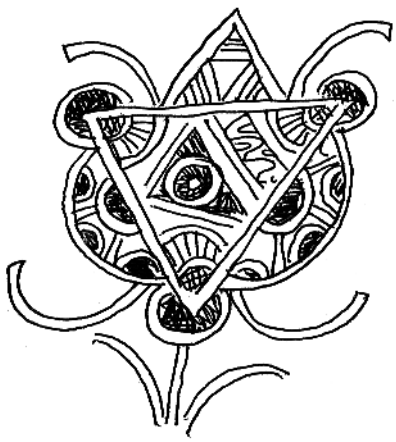

No siempre quise hacerlo así,
No siempre pude,
Pero mi corazón de alegra de hacerlo ahora.

No hay una pelea que resulte necesaria,
Para que salga de mí.
No busco la furia como hálito de vida,
Encontré en el amor la sustancia inocua,
No tengo ganas de pelar.
Vivir es de lo que se trata, eso es lo más importante.

Imprecatoria

Una hoja en blanco es mi corazón,
una hoja seca que pende de un árbol…
se resiste a caer,

se resiste a morir en el lecho de un tronco podrido.

Una nube es mi corazón,
que navega en el cielo negro de los que no quieren recordar,
que brinca de cielo en cielo buscando encontrarte,
las nubes tienen primera fila en el espectáculo del sol,
al presenciar como se nace y se muere todos los días.

Una flor es mi corazón,
con filamentos amarrados al suelo,
buscando el calor del astro rey y el consuelo del mundo,
mis pétalos exclamaciones para llegar a ti,
en lo efímero de mi vida radica su belleza.

Periplo

Y si un agujero negro me tragara hoy?
podría volver a comenzar todo de nuevo,
reinventarme,
confabularía rituales nuevos,
palabras nuevas,
olvidaría todo lo que conozco,
lo que me es importante o necesario,
me olvidaría hasta de mi,
y la idea que tengo de lo que soy.

SÍ hoy un agujero negro me tragara ,
sería otra,
quizá no sería humana, o mujer,
sería una ave diminuta de alas rojas y cresta amarilla,
sería un bosque enclavado en la orilla de un desierto ,
para mirar como las dunas caminan por las noches y llegan al mar,
sería el viento que recorre las ciudades
pero siempre vuelve a los campos en donde nace,
sería una aparición,
un remolino,
un jardín de alcatraces,
sería un rumor que alguien mantiene vivo.

Sí hoy un agujero negro me tragatra,
tal vez volvería a ser yo,
pero habiendo conocido todo esto que enumeró,
sería yo, pero sería distinta,
como cuando tomas un largo viaje
y luego tienes los recuerdos intactos en tu memoria.

Ninfa

Su cabello era un río,
Castaño vaivén le cubría la espalda,
No hacía falta peinarlo demasiado,
O someterlo a la tortura de las pinzas y las pistolas,
Bastaba con que sus dedos
invocarán una silenciosa danza,
Y los cabellos cedían a su hechizo.

En ese río quería bañarse cualquiera,
Era tal la sensación de frescura,
De ligereza y
Que a su paso la rondaban los suspiros,
Y algunas extrañas proposiciones.

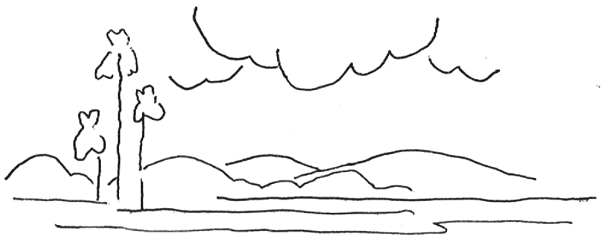

Prometeo

Era hermoso,
era un chico con los dientes perfectos
y ojos brillantes que me ensordecian,
era alto,
de piel blanca,
con mejillas sonrojadas cuando reía,
era perfecto,
a sus 27 años era un adonis que no sabía que lo era,
yo veía el movimiento de sus pies mientras pensaba,
mientras elucubraba una historia para contar,
veía sus manos como se hundían en su cabeza
como buscando ideas escondidas entre el negro mar en su cabeza,
lo veía morder el lapicero,
jugar con él entre sus dedos,
y mi pelvis quería ir hacia sus brazos,
y mi corazón apurado buscaba su encuentro,
disfrutaba mucho mirarlo,
en sueños lo encontré mientras bailabamos juntos,
me dijo que no podía prometerme amor,
porque desde hace meses me amaba ya,
así… en silencio
y con la certidumbre que da un imposible,
aun cuando lo tienes de frente,
aún cuando le has dicho todo,
desperté del sueño y hoy no he querido ni mirarlo.

Corina Oproae

(Spain)

Corina Oproae (Romania, 1973) is a poet and translator who lives in Barcelona and writes in Spanish and Catalan. The Romanian versions of her poetry collections stand somewhere between translation and recreation.Herpoetry books in Spanish are:Mil y unamuertes [A thousand and one death](2016), Intermitencias [Intermittencies] (2018), Tempranaeternidad [Early eternity],which is a personal anthology published in Colombia in 2019 and Desdedóndeamar[Where to love from](2021). In Catalan she has written La mà que tremola[The hand that trembles](2020).She has translated many Romanian poets such as Marin Sorescu, Ana Blandiana, Lucian Blaga, GelluNaum, Dinu Flamand, Ioan Es. Pop. From English, she has translated Red Bird, by American poet Mary Oliver. She is the author of the anthology of contemporary Catalan poetry published in Colombia, La hora indefensa (2021) and of an Anthology of Romanian poetry in the 20th century (2022). Some of her poems have been translated into Czech, Italian, Serbian, Slovakian, Swedish, French, English, Portuguese, Arabic, Hebrew and Bengali.

El Jardinero Que Vuelve De La Muerte

"Nuestra especie ha dejado el Jardín hace mucho tiempo:
queda el Jardinero que vuelve de la muerte."
Pascal Quignard

I.

Caminas

y queda atrás el verde
aplastado en cada paso
la hierba preparada para soportar
el peso de otro cuerpo

eres el jardinero
que recoge las hojas
en el jardín de la muerte

II.

Enel jardín de la muerte
se hablan tu lengua

las víboras muerden
la mano abierta
de las palabras

III.

Delas palabras
brotan flores que se marchitan
en el vientre de la madre

IV.

Enel vientre de la madre
bailan lunas rotas
reminiscencias fugaces
de la primera danza

en la muerte
el deseo es una sombraque devora
la ausencia

V.

Laausencia

aquel viento
que danza
intrépido
y ahuyenta
los recuerdos

VI.

Losrecuerdos
se clavan en tus ojos
por dentro

como vidrios finos
yalargados
penetran tus pupilas

a veces
la felicidad
es una herida
invisible

VII.

Invisible
en tus ojos
el miedo que paraliza al ciervo
antes de la huida

efímero ancoraje
en una geografía
que siempre ansías

bajo tu piel pájaros
latidos imperceptibles
que arrancan los pétalos
de las flores

VIII.

Delas flores
aprendes la muerte
si cierras los párpados

y la vida
si los abres

el padre
es un cerezo
olvidado en el jardín
donde caminas

IX.

Caminas

y el Amor

el Amor
está a salvo
dentro del corazón
del jardinero que vuelve de la muerte

HAY ciervos en mi sueño
sus ojos
guardianes del miedo
rastrean los bosques extraviados
dentro de mis pupilas

hablan
todas las lenguas
que alguna vez he sabido
y yo los entiendo
y me regocijo
cuando el caos se me hace cosmos

desde dónde amar

desde un lugar de aire y luz
que sólo existe en la memoria
desde una infancia imaginada
que palpita dentro de este sueño
como el movimiento inalcanzable de una
estrella

las palabras
duermen en mi garganta
un sueño superfluo

desde dónde escribir

desde aquel verso incierto
que al leer dejé de serme ajena
desde antes de cualquier comienzo
sin comienzo

porque jamás tuve un primer amor

porque jamás escribí un primer verso

EN este sueño
tengo muchos nombres
Sylvia Ana Anne Alejandra Marina Maria
Anise Olga Wis³awa Juana
todo lo que sé
es que soy mujer

hay también árboles
en mi sueño
las palabras son raíces
y ramas y hojas
soy vertical
soy savia que sube
desde la raíz
hasta la copa del árbol
que sale del sueño
y encuentra su lugar en el mundo
aquí
soy la mujer-palabra
hija de todas mis madres
reina de este reino
escribo poemas himnos letanías
poemas que nacen
de todos los nombres
y de todos los sueños
hilos que tejen la vida
hilos que rigen la muerte

leyendo a Cecília Meireles

UNA niña flota hermosa en el agua de mi
pensamiento
que discurre fragmentado
en silencio

su belleza me atraviesa como una espada

su belleza no está en el ojo que mira
está encerrada en sí misma
es altiva e indiferente

no puedo escapar
su mirada hipnótica
me atrapa y me culpa

una niña flota hermosa entre
la muerte y la vida
no hay ninguna rama de sauce rota
hay sólo el engaño en la esperanza
esta armonía tan simple que repele el grito
que aniquila el instinto

finjo que entiendo la muerte
finjo que estoy a salvo

una cortina transparente me aísla
la niña la traspasa lentamente
se levanta de su lecho y baila

ahí donde acaba el sufrimiento
comienza otra cosa
que no tiene nombre
una danza efímera como una flor
se abre en mi ojo

es demasiado tarde pedir que esta muerte
no se me haga poema

ya sé que sólo se está a salvo en la palabra

ME detengo
en medio del camino
y palpo
mi cuerpo exiliado

ese no saberme bastante
ese extravío entre lenguas
entre lenguajes
rescato mi verdad
y reconozco mi máscara

lo que en el cuerpo se aprende
ya no se olvida

NO es ni helecho ni zarzamora
la muerte

elijo la vida lenta
esta vez
el sosegado envejecer del árbol
que tengo delante
y que ahora me sostiene
el camino infinito
hacia el mar que vi por primera vez
aquellas montañas gigantes desplomadas
en un cambio de estado de inmensidad
y el lento sumergir de mi ser
en un coro antiguo de aguas
lágrimas
que se mezclan con la sal
y se vuelven plegarias
reminiscentes caricias de la diosa petrificada
dentro de mi primer sueño

elijo la vida lenta
esta vez
ignorar que el árbol siempre reverdece
soñar dentro de este mismo sueño
rezar en octosílabos que encierran el sentido
último del mundo
y curan para siempre todas las heridas
olvidar a la madre
olvidar al padre
mas sinser huérfana
sentirme hija madre diosa hermana hada bruja
más allá de la vida
más allá de la muerte

que no es ni helecho ni zarzamora
sino oscuridad y caverna
círculo y esfera
de nuevo y siempre
fulgor destello luz

Melita Mely Ratkovic

(Serbia)

Hello Blue Bird

In deep space
you build your nest,
without shackles and cages in peace
you live, you fly, you dream, you sing.

Infidelity in people scares you,
they don't know that paradise rests in you.
When they see you, they shoot you in the wings.
You are prey for them, they don't know anything else.

And you spread love with a song,
you carry the angel's message with you.
You come early at dawn, sleepy one
you wake up. Even the sky is not the limit,

what can a little blue bird do,
faith is your ally, early dawn
companion. If only people would
had they known, they would never have shot at you.

Melita Meli Ratkovic is a famous poet and writer from Serbia. She is equally popular in children's literature. Professionally, she is the literary ambassador of Brazil and Serbia.

Julia Piera

(Spain)

ARDE. LA LLAMA DE LA LENGUA te enseñó toda su historia. El dique, la bahía rota, rompiente. El deseo del mar, que disminuye y que crece. Sus viajes. Tu ojo clavado allí, intoxicado, entre la red de atrapar mareas y el anzu elo azul.

Frágil como fotógrafo calzado de goma que persigue su imagen en la bahía. El agua se corta y se aleja. Haz que empiece una vez más y levantas el sortilegio. La mezcla. Las serpientes rojas, los caracoles verdes que mueven tu pelo, los lagartos amarillos y ágiles y tú los intentas cazar cuando saltan.

BIENVENIDA. TU AUSENCIA, tu silencio en mí, los años de cactus uno a uno. La infancia de maíz. Subes, me alcanzas, me envuelves de mirra y bruma y lentamente recreas mis piernas.

Tu molde es la región entre mi vientre y tus huesos. Perforas lava, hierves vértigos, flotas.

Si fuéramos seres ingrávidos arderían nuestros ojos, el blanco, el barro, la velocidad…

Chillan las nécoras. Cero otra vez. Tus manos saben, silban. Quien deseas es tu piel ¿qué forma tiene? ¿Qué queda ahora? Tú o yo, más cerca dentro. Copular con el mar para engendrar un museo de esferas borrachas.

AUMENTA EL ATARDECER Y EMERGE LA CORDURA

en un plano de desechos.
Vuelven las manzanas de oro
a endulzar nuestras camas
junto a las mareas,
se borran los cielos de alquitrán
y el olor a moluscos cadáver.
Hay alas limpias.

Calmas.

Distancia expón
para esculpir uñas nacaradas
donde no había dedos. Dame
tu despacio,
ofrécete un rumor o ruido claro,
labios, *olas al envés*.
Procúratearterias
resinas afluentes caudal,
crespones expón de hueso
sobre llaves abrazos margen,
reinventa marfil
preferidos nudos músculos blancos,
sien.

Mas dame un alma,
caída de imperfección suficiente,
rotación de luces,
un alma no animal,
azalea, corona, almendra, maíz

Y TE FIGURAS

perfil sin definición
apareces roce
bruma y contorno,
roce racimo, acanto,
más tú que nunca tú
surgen razón y contenido.

Y te figuras,
no hay lágrima u onda que abarque
ni imagen frente hábil
ni llanto espectro
para acoger silueta tan breve
silueta acaso tú

si te toco
te asumo asombro en dos manos

y te presentas
"palma en mi palma"- dices-
permanece al fin
línea vida
erguida como un suspiro
codo al agua,
Amor.

Y te figuras
palmas, yemas de miel

From : *B de Boston*
(Papeles de Trasmoz, Olifante, 2019)

A María Victoria Atencia

Y ABRE UN TEXTO

Unos acordes de guitarra clásica, suaves
y precisos, se escuchan en la cubierta del
transatlántico. Subimos la escalera atraídas
por la música. Las notas huelen a mar,
a viento, a sales. Acariciamos el perfil
de las caracolas, las olivinas que la poeta
consagrada nos entrega en su diminuto
estuche de coral. Refulgen.

Llevamos a nuestro lado las estelas
bioluminescentes,

el arpa hundida en la maleta, un reloj
amarillo, un cuerpo a tierra que mi
hermana y yo tuvimos que expatriar. Pero
todo empieza a perder peso cuando
el Atlántico extiende su mapa.

Ya cantan los corales y la guitarra nos avisa:
azul, ahora, vuela.

From: *Puerto Rico Digital* (Bartleby, 2009)

"este es un estado desgraciado",
cuando nos persiguen las ratas buscamos el
origen
de un origen inexistente de origen

Pierde su pasaporte
azul, maduro, cae
al fondo de una isla
con el ruido de su cuerpo página
ombligo pinchado henchido
de insertar tinta y arena
a chascas de sol
en su agujero-carne
loca.

"huele a hierro,
loca,
el cuerpo página"

Isla en corte leucocito
caer y rodar
“loca, tú sí…”
coágulo de documento
por la pendiente

Y así comienza de nuevo
con la política del miedo sobre los hombros
dientes sudorosos de rabia
un pecho hecho esgrima de llanto

entre basuras, *screen*,
cúmulos súcubos de basuras…
el terror con un cursor en la manito quemada
salvapantallas, multietnias
“personalizadas”, por ella,

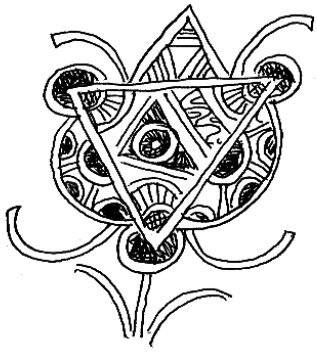

ante un balcón blanco
de rejas y pitas
salta la b.,
gladiola digital,

y en algo inmenso
se sumerge.

Akelarre a la clara mañana
una tras una las fotos de sus conquistas
extraídas del cofre tristrastristras
como fuegos fatuos:
“hacíamos listas de nombres
con todas las que nos tirábamos”.

Vocabulario de b., sonrisas de carne
en proyección inmortalizada. A sorbos,
como en escenas (*cultural particularism*)
de Kusturica tropical
absorbe sus huesos entre dientes de oro
cubano.

Bilingüismo a mordiscos,
filtro de huracán postcolonial,
salamandra a uñas de café,

con lápiz rojo escribe “corazón” en un muslo.

Zapatillas Rojas Sin Tiempo (Mexico)

Sálvame de mis alas sin aliento,
camino por los cielos que tiemblan
tiemblan.
Cimbran mis pétalos sin llave, sin aliento.

Sálvame del tiempo que como ola furiosa
navega en tu saliva de remolino.

Sálvame de la enfermedad del deseo,
mientras el reloj, abraza mis zapatillas
rojas de arcoíris.

Libérame de mis muertes
enredadas en mi espalda
y las montañas de fuego
que brotan de mi cabello.

Libérame de las agudas
letras de tu nombre, mi hombre
tu nombre.

Desátame del cielo y el inframundo
del que tiemblan mis piernas
asustadas de vino,
vino de sangre amancillada.
Libérame de mi garganta
al pronunciar tu nombre
que explota en el cuerpo de mi voz.

Ángela Escobar Clarimonda cursó el diplomado de creación literaria en la Sociedad General de Escritores Mexicanos (SOGEM) Es actriz, escritora y cineasta. Ha publicado en diversas revistas electrónicas tanto como en papel cuento y poesía. Publicó su primer libro de poesía con el título: Debajo de mis venas silenciosas. Fue ganadora en la convocatoria “Historias del té” por la Compañía Nacional de Teatro de México. Ha sido publicada en países como Argentina, Francia, Grecia, España y Alemania. Fue ganadora del VI festival Urgen Musas.

Yo soy agua
el fuego se incendia entre mis mares
en tu pecho se esconden tesoros,
tesoros que nunca buscamos
entre mandalas mal escritos.

Sólo eres una fotografía
fotografía que jamás
el tiempo
capturó.

Junio, obituario de nuestros cuerpos

Junio, florece en tus ojos de atardecer,
inquietos mis pensamientos yacen difuntos,
manjar de tu constelación: pálida
expuesta a mi jardín lleno de rosas en la mar.

Niños que florecen de nuestras olas
en la proa que tú gobiernas,
zozobra del minutero que tiembla de nuestras manos.
Al fin, la luna nos abraza con su cuello cantando
rodeando tu espalda de náufrago
en tu desierto, destino de miel.

Llama abrasiva en mi adorable primavera
alma mía, eres el espíritu de mi cuerpo de estatua que
nada y nada muriendo en el otoño de nuestra voz.

Obituarios de nuestros cuerpos
jadeando en la tumba de un solo corazón,
unidos en el embarcadero oscuro de un rock,
ladrón de frutos líricos
imagino tu voz débil de música
¡AHHHH! Y el estruendo de tu tormenta de
nuestros cuerpos de fuego hundidos en la mar.

Primavera

Luminoso sol
baña la madre tierra
vivo preludio.

Samhain

La noche fría
abrigo de otoño
estrellas fijas.

Noches blancas

Sol reluciente
en el manto nocturno
luna ausente.

Ditirambo

La uva crece
vino de sangre santa
inmortalidad.

Ella que en la nada

A Alejandra Pizarnik

Entre ella y yo hay una delgada fisura,
camaradería amarga,
entre el juego del recuerdo y la memoria.
Ella con el cigarrillo de sol puesto entre sus labios,
sosteniendo nubes.

Ella que en la nada,
el viento muere en su herida
y, la noche mendiga su sangre.

Yo costuro las líneas del tiempo,
en nocturno despertares.

Señor.
He consumado mi vida en un instante,
La última inocencia estalló,
ahora es nunca o jamás,
o simplemente fue.
¿Cómo no me suicido frente a un espejo
y desaparezco para reaparecer en el mar,
donde un gran barco me esperaría

con las luces encendidas?
¿Cómo no me extraigo las venas,
y hago con ellas una escala
para huir al otro lado de la noche?

Ella tiene miedo a la muerte,

sabe del terror en su sangre cuando se
esconden ratas hambrientas.

Yo también siento pánico,
al eco de mis muertes ausentes, que escribió.

Ella inocente a la noche que se va,
pide su mano;
Yo tejiendo versos,
en esas tinieblas convertidas en reflejos.

Ella es una niña que juega en la plaza,
igual que el recuerdo de yo en ese atardecer
bailando,
con la cuerda de la sonrisa perfecta.

Ella ahogada en pastillas y poesía,
esas mismas marcas de arena,
del miedo con sombrero negro
la vida misma es un hoyo cadavérico.

Ella, estallará en la isla de un recuerdo,
en la prisión de huesos de mi memoria,
ausencia sin mañana.

En el vidrio que dibujo su espíritu;
nosotras en una noche que no es noche,
es sol.
Es sangre que llama a las palabras,
vestidas de féretro,
infiernos y vientos.

Es la transparencia de la coincidencia,

de muertes rojas,
llamaradas que queman a la luna.

Ella escribe mística triste,
y su sombra es un sonido roto,
frente a mi espejo pálido.
Ella amordaza palabras,
en el papel arrugado,
lenguaje nacido de vino, papel y cigarrillo.

Ella, luz mala,
se mimetiza en la noche abierta.

Yo le respondo cuando el baile muere,
donde la noche se rompe,
en el ululante silencio de la tinta,
de una página insatisfecha,
en esa noche de otoño roto,
de suspiros y respiro de las ánimas.

Alberto Prado Morales

(Colombia)

Nació en Santa Marta en 1963. Formador del Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Miembro fundador de la Asociación de escritores del Magdalena. Premio Nacional de poesía Rafael Maya 1997, Popayán. Premio Un Canto a tu hijo, Casa de la Cultura del Magdalena. Tiene publicados los libros Memorias de Romero, editado por la Universidad del Magdalena, 2007. Noches de Montaña, 2016. El delgado hilo de las huellas, 2019. Publicó en la antología: Susúrrame un poema Magdalena, 2021. Participa del colectivo Bohemia Itinerante.

LÁGRIMA DE MAR

Al llegar la noche
busca la sonrisa de luceros,
de esos encontrados una vez
tras la palabra
de ojos desprevenidos.

Pregúntales
si en algún puerto de esta patria
alguien mira estrellas
y lleva en sus pupilas
una lágrima de mar
endulzada con la sonoridad
de tu nombre.

BARCOS Y LLUVIA

Partiré en el lomo de la lluvia
a comienzos del verano,
llevando en las pupilas
enjambres de recuerdos
y pagando segundo a segundo
la aventura de los sueños.

Navegación perenne
en noches de pirata
con muchos soles de náufrago
colgados en las espaldas.

Partiré
en el lomo de la lluvia
bajo las letras borrosas
de un frágil barco de papel.

MÚSICA

El tiempo no existe en tu voz,
cada centímetro de esa palabra
lleva en sus entrañas la misma fragancia
de lo que alguna vez fue obsequio
a la identidad de mis oídos.
Sílaba a sílaba
te haces calidez de canela
en el regocijo de los poros.
Ruborizas los ríos
que reposaban en su pausa de sequía,
silentes, dóciles.
Niego los relojes
esta vez y para siempre…
Entras al alma en sonidos vivos,
música… salvación de poemas,
a pesar de tantos calendarios.

NOCHE

El reloj ha marcado
ese color de la noche
en mi nostalgia.
He sido el vacío
en cada pedacito
de ensueño.
He habitado espacios
negados por la luz
y la sabiduría callada
de los ojos.
He instalado distancias
tras los espejos
y me he reflejado
en la oscuridad
que arrojaron
los hombres al mar.

CULPABLES

Cuán distantes
están las rutas y los nidos,
sólo la memoria puede vivirlos
en ese instante puro del alma.
Las flores se quiebran
como papeles golpeados.
El papel se envenena
con tintas de color púrpura.

Ah!
Pobres las metáforas
cuando son puntas afiladas
en búsqueda de culpables.

GRANO DE CENIZA

Escribe lápiz.
Píntate
en palabras de barro.
Procrea poemas
vestidos con piel hombre.
Inventa
color a la oscuridad.
Que cuando
vengan todos,
ya seas un grano de ceniza
con sueños de arena.

Luis Pabón

(Colombia)

Luis Pabón, Nacido en la ciudad de Santa Marta, Colombia es administrador de empresas hoteleras, estudiante de Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Buenos Aires, Argentina. Parte de su obra poética ha sido traducida al francés y al portugués.
Coordina el Picnic Literario Palabra Libre y conduce el programa Palpitando Poesía.
Publicó los libros:
Demencia o realidad en 2014 (Poesía), Palabras escapadas 2016 (Poesía), Sueños Inocentes 2017 (Novela), Poemas Malditos y otros apócrifos 2018 (Poesía)
Es Coautor de Caballitos de mar 3 publicada con el apoyo del ministerio de cultura de Colombia, Compilador de Antuna I (Antología de narrativa con compañeros de la carrera de artes de la escritura) y ha sido publicado en varias antologías nacionales e internacionales.

Vacíos

La casa no tenía puertas y el sol ardía en la piel
el sonido del mar amenazaba con la muerte y
en el fogón la leña permanecía a la espera de un dios.

De aquella infancia nada
ni los besos guardo
ni las oraciones (que dicen) hacía con fe.

De la casa nada
un palo de quebracho
y una cerca de púas para matar deseos.

De sus abrazos nada
ni un hilo para volar cometas
ni un barquito de papel pa´ desafiar las olas.

De absoluciones nada
ni un dios que perdone
sin herir o sin castigo
de ventanas y puertas nada
solo vientos golpeando los muros
y soles quemando los ojos.

De la infancia
pupilas temblorosas y ángeles mudos.

Fogón de pájaros

Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra.
Reyes 17:14
Se levanta y calza sus chancletas de barro
el fogón es un nido de pájaros diminutos
el aceite gotas tristes
y la harina ya no empolva el frasco.

El niño duerme profundo
no quiere despertar
y ella no quiere que vuelva.

Camina despacio
la veo silenciosa,
se arrodilla
y rezo con ella a un dios que olvida y mata,
rezo como si creyera
que algún profeta de otros tiempos
pida un pan y multiplique
las mañanas del pequeño que sueña.

Ella no me ve, no me siente
y me espera.
El niño despierta
y lo acuna en sus brazos
le dice que vuelvo
¡Ella no sabe que de este lado
la ausencia es tan fría como la muerte!

Sin pena ni gloria…

He aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre.
Salmo 51:5

Nací sin nada,
sin noción de tiempo ni espacio,
sin otra cosa que un líquido rojo
recorriendo mi cuerpo,
unas manos sin títulos
me recibieron en un lecho humilde
en una casa prestada.

Mis ojos negándose a ver lo que no conocían,
y mi boca
abierta de un golpe
conoció el dolor.

Sin pensamientos de maldad ni de bondad,
sin gusto por algún color específico
sin idiomas
sin saber de padre o hermanos;
solo mi Madre y su cordón
mi cordón...
unión que también rompieron bruscamente
con un arma afilada por extraños.
Así nací
sin dueño
ni dueña
sin nombres ni apellidos…
Nací sin gloria
sin magos
sin mirra
sin oro
y ningún humo perfumando el lugar.

Nací sin Dios, sin diablo
sin ángeles ni demonios
sin vírgenes
sin santos
sin brujos
sin saber de liberalismo

conservatismo
izquierda o derecha.

Todo lo fui aprendiendo
despacio provee el veneno
me dogmatizaron
los colores
los sabores
el dolor
el llanto
la risa.

Todo fue implantado poco a poco.
Nací sin nada más
que la condena de un libro negro
sentenciando mi pecado;
pecado que otro cometió según la historia.

Yo nací santo,
y sembraron el demonio dentro.

La Cayena

A: Ana Padilla

El día que conocí a la abuela
traía una flor de cayena en su pelo
bailaba con sus abarcas de fique
el polvo era uno con ella seduciendo al viento
su risa
su voz
su cuerpo de espiga
las manos al compás de sus pies.

El pueblo era un silencio
ella era la fiesta
¡Baila Ana Flores, baila!
Un solo canto
y el polvo.
¡Un baile de cayenas cada tarde de viernes!

Ahora vuelvo a poner la flor en su pelo
muevo su mecedora.
Ella ríe,
canta
y recuerda aquellos tiempos
el pueblo
Las calles
el polvo
¡Baila Ana Flores, baila! (Dice)
Me mira y sus ojos brillan
¡Baila Ana Flores, baila! (digo)
y la balanceo
y la recuerdo
como aquella tarde que fui al pueblo.

Percepción

Ve cómo el mundo se acelera y lo suspende,
las caras se hacen una en miles
el subte es un gusano y lo mastica
adentro no hay nada,
todos están muertos:
la chica de rayas
el calvo de lentes
el gordo de zapatos rotos;
la señora del bastón y anteojos negros
parece ser la única inconsciente del estado
putrefacto

como si también fuera carente de olfato.

En la cabeza centenares de voces se agitan
el monje, el ateo, el escritor
el pastor, el hetero
el bisexual que se revuelca en UCI
y el de siete colores que se cree libre
y grita en la más oscura de las prisiones.

El pulso es la máquina
que mueve a todos estos muertos.

El gusano se detiene y escupe furioso
nauseabundo
vomita en este infierno sin formas.

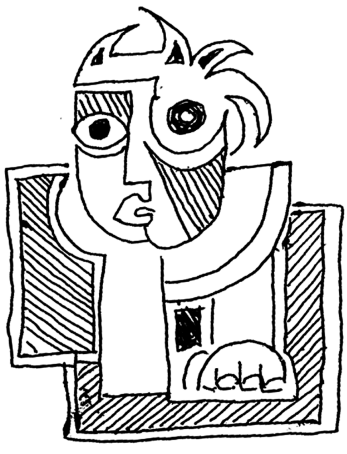

Peces en la ciudad

El semáforo no cambia
está detenido con ojo exterminador
el ritmo parece oponerse
las bocinas son mares agitados.
¡Nadie se conoce
sólo los gatos en las ventanas!

La luz sigue estática
inmutable
absorta en las olas suspendidas
y las mareas de hierro.

La cebra tiembla con el aleteo
de los peces que caminan
un gato mira desde el borde y lame sus patas
el otro mueve su cola y se ríe.

¡Abajo caminan los peces!

Gustavo Hermógenes Arrieta López

(Colombia)

Santa Marta en 1.971. Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Magdalena (1.996) y especialista en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Pamplona (2.008). Cursó la maestría en Literatura Hispanoamericana y del Caribe de la Universidad del Atlántico, sin graduarse aún.

Pertenece a la Asociación de Escritores del Magdalena, dirige el Grupo Talium el taller literario de la Universidad del Magdalena y se desempeña como docente en un colegio del distrito de Santa Marta.

Ha publicado de manera artesanal el poemario "IMAGO" en 1.999 distribuido entre los amigos y En el Lenguaje de las Burbujas – poemas desde la Sierra Kogui- Ediciones Exilio, 2010. También las cuatro antologías literarias del taller literario de la Universidad del Magdalena. A demás, parte de su obra poética ha sido publicada en diversas revistas y periódicos de la ciudad e incluida en las antologías "La Nueva Poesía del Magdalena" en 1.995, en "Esta Ciudad del Mar" en 1.998 y en "Poetas Bajo Palabra" Barranquilla en el 2008.

Ha obtenido varios reconocimientos entre los que se destacan el Primer Puesto en el IV Concurso Nacional de Poesía y Declamación Universidad del Norte, Barranquilla en 1.994 y la Mención "Gaviota del Arte" por el Instituto del Cultura del Magdalena, en 1.996. Segundo puesto en el XVI encuentro nacional de declamadores y poetas de Chinú (Córdoba) diciembre de 2.008 y el primer puesto en el XII concurso poema musical inédito en Chinú – Córdoba en diciembre de 2.008.

---

*

la piedra
quién si no la piedra
para proteger nuestra memoria
en su centro laten
los secretos.

*

el aprendiz nuñhuakuivi
lleva zhatukuamonkú
-totumaagua-
baja al río allí donde le llega el agua nueva
observa totuma busca algo
toca el agua busca algo
el mama aguarda respuestas
zhatukuataukai
-totumaadivinación-
es común, pero promete
la hukultsuni blanca traslúcida
-piedracuarzo-
anhela las burbujas
el lenguaje desconocido:
en el lenguaje de las burbujas
una burbuja de agua en el aire
una burbuja de sangre en el agua
una burbuja de lágrima en la sangre
una burbuja de amor en las lágrimas
una burbuja de sueños en el amor
una burbuja de clarividencia en los sueños
una burbuja de algodón en la clarividencia
el mama lee en zhatukua
-medioadivinación-
en el lenguaje de las burbujas
dialoga con las burbujas en seyzhua.
-lugarceremonialpáramo-

*

los caminos son conjurados
de la erosión del hombre del agua del viento
en el trabajo comunitario del pueblo
como hormigas ante las hojas
las malas huellas del tiempo borradas
la pesada piedra en la uña rodada
el cadáver del árbol vuelto fuego
el discurso de la lluvia desviado
lo pantanoso drenado
lo pedregoso escalonado
el camino se asfalta de rastros nuevos
de pies descalzos y de bestias en sus cascos
de hojas secas de aguacates y de estrellas
entonces el camino brilla en su luz
se amansa se acorta se nivela
acaricia acompaña aconseja
el camino por donde el alma se queda
cada vez que se viene o se va
desde nubizhaxa a la bodega y viceversa.

*

maría lava sus añitos
imitando a su jaba
la jaba mira respeta su sueño
la manta entre sus deditos
acaricia la piedra en leves golpecitos
salpicando universos de gotas
en su carita de flor
su fantasioso ritual
no quitará las travesuras de barro y comida
de la pequeña lona a manera de vestido
maría sacude y restriega contra la piedra
igual que su mamá
pero a ella la corriente no se le lleva la mugre
le cuenta sus secretos y le enseña
que muy pronto dejará de ser el importante
juego
y que maría la mujer se acerca
que la niñez se le escapará
a medida que la manta
le vaya quedando cada vez más limpia.

*

los animales al atardecer
son asegurados por los niños
patricia hala al cerdo con una cuerda
bernabé busca al buey en la loma
maría joaquina llama a las gallinas
desmigajando plátano

josémanuelle pica caña a las dos mulas
para llevarlas al potrero
de igual forma catalina trae las ovejas cerca
de la casa
el gato y el perro se acurrucan por sí solos
en un rincón cualquiera
los pájaros se empluman en su sueño
los sapos y las ranas los grillos y cigarras
las luciérnagas y los cucarrones
y otros bichos raros los suelta la noche
como al frío y a las estrellas
o a la neblina a la topa tolondra
el jaguar muy pronto pasará revista.

*

me interno en este corazón
que es una sola gran montaña
a pasos de torrentes sanguíneos
donde se represan los caudales del tiempo
planto como de costumbre
día a los días en los días
sin contar con los sueños
enlazando constelaciones en hexagonales
celdas
por donde ascendería a un estado alerta
volcánico o no
este corazón se extravía en lo ancestral
de una etnia tayrona
jaba gaulshovang y jate serankua
-padresuniversalescreadores-

siembran sus caminos hacia el río del cielo
que en cascadas más y más dentro germinarán
mis huellas
y toda la piel que es este verde verde
responderá a la caricia de mi aliento...
pregúntale a la piedra
responderá en su latido.

*

puedo reconocerme
mestizo ente los ojos verdes de la sierra
el mapa de pálpitos de mi pecho
me lleva aferrado a estos pasos que se van
perdiendo
en lo más sublime de un dios
que me identifica como soy
en medio de una etnia de ropas blancas
y pies descalzos y cabellos negros largos
los senderos no son los tallados por el correr
del t i e m p o
como un hilo atado a mi respiración
vengo desde el primer hombre
reconociendo sin saberlo
de lo que está hecha mi sangre
estoy en los días plantando mis segundos
estoy en la piedra sentado junto al río.

Elena Ershova

(Russia)

Elena Ivanovna Ershova (born in 1963 year), city Nolinsk, Russia - novelist, poet, children writer and poet, publicist, aphorist, composer and author-performer. Academic of International Academy for the Development of Literature and Art (IADLA - New York, USA). Honorary member and head of Volga-Ural department of Writers Union of North America (WUNA - Monreal, Canada). Member of International Union of Writers (IUW - Russia). Member of International Union of Singer-Songwriters (IUSS - Russia). Vice-chairman of the Public Relations Department and member of Russian Union of Singer-Songwriters (RUSS - Russia). Head of the authors song club and president of the International Art Song Festival 'New Name', city Nolinsk, Russia.

Awarded medals: 'Vladimir Mayakovsky 125', 'Sergei Yesenin 125' for the contribution to the development of Russian culture and art (RUR), 'For the achievement in culture and art' (RUSS), '75-th anniversary of the Great Victory', order 'For achievement in culture and art' (WUNA), badge 'Academic' International Academy for the Development of Literature and Art (IADLA), badge - 'Honorary worker of World literature and arts' (WUNA).

Laurete of international and all-russian literary and international competitions. Prizes of Mark Twain, A. G Snitkina-Dostoyevskaya, Duke de Richelieu 'Diamond Duke', L. O. Utyosov, 'Poet of the Year', 'Sergei Yesenin', 'My Russia', 'Georges Ribbon', 'Charles Aznavour', 'Bulat Okudzava', 'New Name', 'Greenland', 'Guitar Soul', 'Soul Notes' and other competitions.

Was published 7 authors collections of poems, stories and fairy tales.

Publication in more than 20 almanacs, collections and anthologies in Russia and abroad.

Worked as a journalist in newspapers 'Selskaya nov' (city Nolinsk, Russia), 'Kirov vecherniy' (city Kirov, Russia), 'Novoye plemya' (city Kirov, Russia) - journalist and editor of newspaper 'MK na Vyatke' (city Kirov, Russia).

Presently is engaged in creative activity.

НЕ КЛЯНИТЕ СУДЬБУ…

Если жизнь на полыни настоена –
Слаще мёда бывают мгновения,
Видно Свыше всё это устроено,
Чтоб пришли к нам потом озарения.

Ведь тогда даже счастья пригорсточка –
Как подарок судьбы за терпение,
Даже каждой удачи наперсточек,
Для тебя не в укор – в наслаждение.

И все горькие слёзы алмазами
Обернутся в течение времени,
Не кляните судьбу – как заразу вы,
А примите, как дар во спасение…

НЕ ТОТ ВЕЛИК, КТО В ГРЯЗЬ НЕ ПАДАЛ

Не тот велик, кто в грязь не падал,
А тот, кто падал, но вставал,
Не тот мудрец, кто много ведал,
А тот, кто многое познал!
Не тот могуч, когда в победах
Над слабым властвовал сполна,
А тот, кто слабым руку в бедах
Подал и вытянул со дна!

Не тот герой, который имя
Везде и всюду продаёт,
А тот, кто будто бы святыню
И честь, и имя бережёт!

Не та звезда, что славой блещет,
Чьё имя всюду на устах,
Не та, которой рукоплещут,
А та, что будет слыть в веках!

Не тот святой, кто много страждал,
А тот, кто боль не показал,
Не тот богат, кто златом важен,
А тот, кто многое отдал!

ОБОЖЖЁННАЯ ДУША…

А обожжённая душа
Колючим временем,
Вставала снова, чуть дыша,
Под тяжким бременем.

Но улыбалась: «Я жива!» –
Ей ли до радости?!
Но только тёплые слова –
Мгновенья – сладостью!

А обожжённая душа,
Как птица ранена,
Но возродилась не спеша
И стала пламенна.

И птицей огненной взлетев,
Как будто горлица,
Запела песни нараспев,
Степною вольницей!..

ЦЕННОСТЬ…

Ценить людей по душам нужно,
А не по кладезям ума!
Что толку, если в душах пусто,
Хотя ума полна сума.

ИЗМЕРЕНИЕ…

Измеряется жизнь не годами!
Много ль проку в количестве лет?..
Измеряются вехи делами,
Что оставили в вечности след!
Измеряется мудрость не возрастом,
Мудрым может быть стар или млад...
Измеряется мудрость познанным,
Где открыл себе истины клад!

НИКОГДА НЕ ЗАВИДУЙ

Никогда не завидуй счастливым,
Счастье делают, а не ждут!
Манна с неба ещё не свалилась,
Будь по жизни ты честный иль плут.

Никогда не завидуй красивым,
Красота – это то, что в душе!
А не в глазках и лицах смазливых,
Внешний глянец не моден уже.

Никогда не завидуй богатым,
Радость жизни не в кладах земных.
Мы не вечны, и бренное злато,
Нас в мирах не согреет иных!..

ВСЁ ПРОЙДЁТ!

Если ночь была очень темна –
Утром снова выглянет солнце!
Даже грозная шторма волна,
Успокоясь, ляжет на донце.

Дождь стеной ли, бущующий гром –
Огорчаться – просто нет смысла.
Вспыхнет радуга за дождём,
И повиснет цветным коромыслом.

В жизни много несчастий и бед –
Крутит жизни нить веретёнце.
Ходит счастье за горем вослед –
И появится в вашем оконце!

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Разве счастье в алмазах, да виллах богатых,
Разве счастье в нарядах от стильных кутюр,
Иль в крутых иномарках и яхтах крылатых,
Или в деньгах, с которыми вечный «ажур»?

Разве счастье в чинах или санах великих,
В золотых унитазах, в швейцарских часах,
Может, в славе, медалях, из золота литых,
Или в ваших надёжных, по блату, друзьях?

Меркнет злато и платина меркнет,
И ни званье, ни слава здесь вовсе не в счёт,
И вся светская пышность, поверьте, поблекнет,
Если в вашей квартире любовь не живёт!

В вашем доме тоска – если нет в нем ребёнка,
Его радостный смех и шаги не слышны,

Вот где счастье лежит, да в обычных пелёнках,
Так похоже на вас, как две капли воды!

Королевские залы, короны ни к черту,
Если нету любви, то и трон не хорош!
Не спасут от недуга крутые курорты,
Счастье то, что не купишь даже за грош!

Счастье то, чего нет ни в одном магазине,
Счастье то, что любуясь у сердца хранят,
Счастье только лишь там, где любовь, как святыню,
Берегут, защищают и бережно чтят!

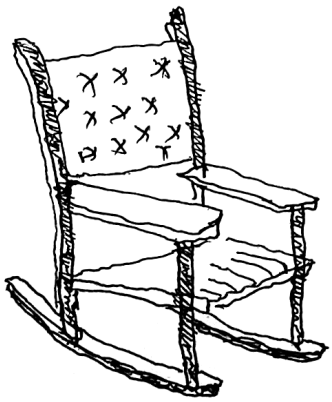

ТВОРИ ДОБРО!

Твори добро – оно к тебе вернётся:
Ручьём, звенящим звонко меж камней,
Цветком изящным, что весной проснётся,
Улыбкой милой собственных детей.

Твори добро – оно всегда вернётся:
Руладой птиц на утренней заре,
И солнца лучиком, что щёк коснётся,
Кусочком счастья в жизненной поре.

Твори добро – оно лишь украшает
Что проку жить нам в ханжестве и зле?
И злое сердце в доброте оттает,
И мир всегда пребудет на земле!

DO GOOD!

Do good – it will come back to you:
By stream ringing loudly between stones,
By graceful flower, that will wake up in spring,
By nice smile of your own children's.

Do good – always it will come back:
By bird trill at morning dawn,
And the sun with a ray, that touches the cheeks,
By a piece of happiness in life time.

Do good – it just decorates,
What is the use of us to live in hypocrisy and evil ?
And the evil heart will thaw in kindness,
And always the peace will stay on earth!

Translated by : Elena Ershova

ХОЧЕШЬ, СТАНУ
Я ТВОИМ АНГЕЛОМ?!

Хочешь, стану я твоим ангелом,
Или в небе ясной звездою?
Иль гореть буду ярким факелом,
Если в стужу душа заноет?

Может, лучиком солнечным, сладостным,
Тёплым, нежным и незабвенным?
Чтобы жизнь твоя была радостной,
Хочешь, буду твоей Вселенной?

Хочешь, стану водой родниковою –
Смою все твои беды, печали?
Или, может, серёжкой ольховою,
Что под ноги падёт на причале?

Хочешь, стану твоим талисманом,
И беречь тебя буду всюду?
Не бывает любовь обманом –
Та, что словно подобна чуду!

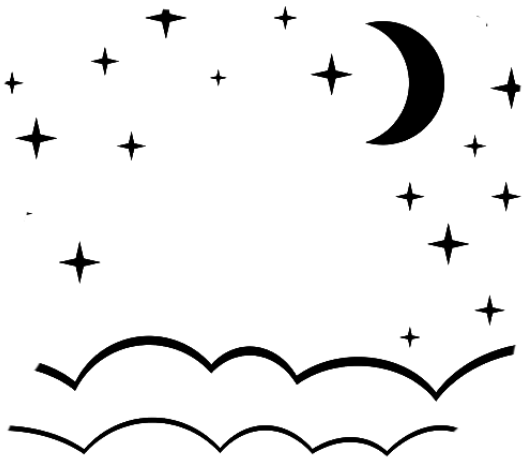

DO YOU WANT ME TO
BE YOUR ANGEL?

Do you want me to be your angel?
Maybe in the sky a wonderful star?
I will bright like a torch without changing,
If your soul gets cold in the night.

Maybe I will be a ray of the sunshine,
Warm, gentle, sweet and unforgettable?
To make your life easy, joyful and fine
Or I will be your universe so kind and sensible?

Do you want me to be a spring water?
I would wash away all your troubles, sorrows
Or maybe I will be a long earring of the alder,
That will fall under your feet on the pier tomorrows.

Do you want me to be your talisman?
I will take care of you everywhere by magical.
There is no loving deceit, oh my man,
Because my feeling is like an incredible miracle!

Translated by : Nargisa Karasartova (Kyrgyzstan)

Я БЕССОВЕСТНО СЧАСТЛИВА

Я бессовестно счастлива,
И сегодня, и вчера!
Не могу я быть унылой,
Как неон, свечусь с утра!

Кто-то скажет: “Вот везёт же,
И живёт, не зная бед!
Улыбайтесь, будьте проще
У меня один ответ!

Я забыла все обиды,
Пусть цветёт задор и смех,
У судьбы свои причуды,
Я настроюсь на успех.

Вместо слёз – дарю улыбку,
А на зло – в ответ шучу.
Оттолкнула горя шлюпку –
Буду жить, как я хочу!..

I AM HAPPY UNSCRUPULOUSLY

I am happy… unscrupulously
Today, yesterday!
Can’t be gloomy,
Shine as neon since morning everyday!

Someone will tell: “She’s lucky,
She lives without troubles!
I say “people, smile!”
Be happy, don’t worry.

The reason is simple to the offenses
Prefer i rest,laughter and fancies,
Each person has his whims,
So why I should cry wasting life-glimpse?

Tears – smile,
Mucks – joke.
And I left the boat of sorrow…
I’ll live as I want…doncha think about tomorrow!..

Translated by : Anastasiya Andreeva

M i r i a m M a n c i n i

(Argentina)

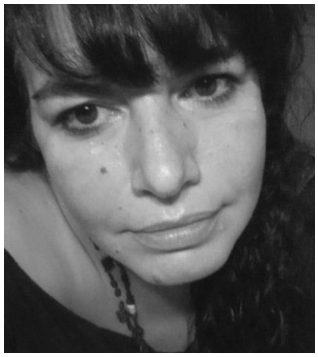

Cantata para un labial rojo y un lengua viperina

Allegro assai velenoso
Rossetto mortale
A tempo

Divertimento

Puro veneno,
armonioso,
labial rojo y beso
de la muerte.
Besos. Besos.
Pequeña Taipán roja
tomada de la lengua
cuando Nin Puabi
entre la música
de las liras de Ur,
asió con blanca mano
al universo sumerio
de la muerte cosmética.
De ese modo, los mitos
cuneiformes se esparcieron,

Miriam Mancini Directora Red Muridial de Arte sede Argentina, Embajadora cultural de la Confederacion Internacional del jibro, Directora de Relaciones publicas Internacionales del Instituto Cultural Iberoamericano, escritora, editora, creativa docente y poeta.

reptando imperceptibles
hasta las rojas arenas
de las antiguas piedras
ceremoniales,
bajo la atenta mirada
de la esfinge risueña.
Albayalde, te convoco.
Ya lo hizo Teofrasto
quien, sobre los renovados
lomos de las piedras,
te bendijo
mucho antes
que pequeños escarabajos
(peripatéticos e iridiscentes)
marcharan por el misterioso
cráter en la luna
roja de sangre
que, desde entonces,
aterroriza
a los pusilánimes
con el fin de los tiempos.
Purísimo veneno.
Taipán.
Taipán interior,
en cada corazón
enrollada
atesorando
su mordida
pecaminosa.
Vanidad
de los pecados
capitales
que gota a gota
inocula
su veneno mortal.
Cien hombres
se rinden a tu mordida
y mueren como ratones.
Dejan escapar
húmedos estertores
de sus rudos pulmones
y así suena
la última
y fúnebre música
del fondo
de sus gárgaras,
hasta que el ceremonioso
cortejo funerario
los hunde en su tumba
definitivamente.
Memoria
apasionada
de la pederastia,
kataphilein
de la pequeña
y erótica víbora
que con su bífida
lengua descubre
cíclicamente
el desnudo
de Bagoas
danzando rojo
su contorsión
eunuca
al rey conquistador
sumido en sueños
de amor hasta
su joven muerte.
Besos de la serpiente
elevada en el desierto.
Llena de lujuria por la gloria
ataca con sus roja mordida
y con la bífida lengua
masculina
besa las heridas
de los extraños
caminantes.
Besos de bronce,
enarbola la serpiente
Moisés que la reparte
como amuleto
contra la muerte

mientras vagan
los desterrados
hacia la tierra prometida.
Labial rojo
de las dulces
hormigas ciegas
caminando
sin otro destino
que devorar
las plantas griegas
antes de ser fécula
de besos.
Siglos después,
polvo real
en las leves comisuras
carmines de las bocas resecas
del Imperio;
pasta ceremonial
del beso rojo,
intensamente rojo
de la pálida Isabel primera
cuando decapitó
a María Estuardo
y untó los labios
con su sangre.
Cuando acabó el desierto
y los reinos
escondieron sus guillotinas
en los anaqueles
de las bibliotecas,
estampó Puig el beso
contemporáneo
de la mujer araña
y las boquitas pintadas
de Peggy, Betty, July, Mary
rubias de New York.
Taipán angelical
de pubis rojo,
húmedos,
nerviosos
labios rojos,
carnosos,
lúbricos venenos
amatorios.
Puro veneno,
armonioso,
labial rojo y beso
de la muerte.
Besos. Besos.
De los políticos,
de los diplomáticos,
de los militares.
Pequeñas taipanes rojas
en trajes de gala
y coloridos uniformes.
Ellos, la lengua en dos
a cada lado del beso
venenoso, donde saboerear
el sabor carmesí
de la última muerte
entre los dientes.

Cantata for a red lipstick and a viperine tongue

Allegro assai velenoso
Rossetto mortale
A tempo

Divertimento

Pure poison,
harmonious,
red lipstick and kiss
of death.
Kisses. Kisses.
Little red Taipan
taken from the tongue
when Nin Puabi
between the music

from the lires of Ur,
took with a white hand
to the Sumerian universe
of cosmetic death.
Thus, myths
wedge-shaped scattered,
creeping unnoticeable
to the red sands
of the old stones
ceremonial,
under the watchful eye
of the smiling sphinx
Albayalde, I summon you.
Theophrastus already did it
who, on the renewed
back of the stones,
blessed you
long before
what little beetles
(peripatetic and iridescent)
They will march through the mysterious
crater on the moon
red blood crater
that since then
terrifies
to the faint hearted
with the end of time.
Pure poison.
Taipan.
Inland Taipan,
in every heart
rolled up
hoarding
his bite
sinful.
Vanity
of sins
capitals
what drop by drop
inoculates
its deadly poison.

Hundred men
they surrender to your bite
and die like mice.
They let escape
wet rales
from his rough lungs
and so it sounds
the last
and funeral music
From the bottom
from his gargles,
until the ceremonious
funeral procession
sinks them into his grave
definitely.
Memory
passionate
from child abuse,
kataphilein
of the small
and erotic viper
and with forked
tongue, discover
cyclically
the nude
from Bagoas
dancing red
his contortion
eunuca
to the conquering king
lost in dreams
of love until
his young death.
Kisses of the snake
elevated in the desert.
Full of lust for glory
attacks with his red bite
and with the forked tongue
male
kiss the wounds
from strangers

hikers.
Bronze kisses,
makes the snake flutter
Moses who distributes
as amulet
against death
while wander
the exiles
towards the promised land.
Red lipstick
of the sweets
blind ants
walking
with no other destination
what to devour
greek plants
before being starch
of kisses.
Centuries later,
real powder
at the slight corners
carmines of imperial
dry mouths
ceremonial paste
of the red kiss,
intensely red
of the pale Elizabeth first
when he beheaded
to Maria Estuardo
and smeared his lips
with his blood.
When the desert ended
The kingdoms
hid their guillotines
on the shelves
from libraries,
Puig stamped the kiss
contemporary
spider woman
and the painted mouths
from Peggy, Betty, July, Mary
New York blondes.
Angelic taipan
red pubic,
wet,
nervous
Red lips,
fleshy,
lubricious poisons
love affairs.
Pure poison,
harmonious,
red lipstick and kiss
of death.
Kisses. Kisses.
From politicians,
of diplomats,
of the military.
Small red taipans
in ball gowns
and colorful uniforms.
They tongue in two
on either side of the kiss
Poisonous, where to savor
the crimson flavor
of the last death
between the teeth.

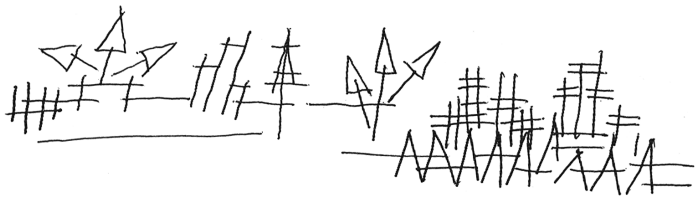

M a r c e l a R o m n

(Mexico)

Marcela Romn (Marcela Román). Nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Comunicación Colectiva y Periodismo (UNAM). Ha escrito poesía y narrativa. Se integró a los talleres de creación literaria “Haciéndole al Cuento” y “la Pluma del tiempo”, en el Centro Cultural “Tomasa Valdés”. La Revista La Pluma de Ganso publicó su cuento “Los Candelabros” en el 2004; En el 2005 publicó con el Colectivo Puro Cuento “De Ficciones y Divagaciones” y algunos más en el libro Letras para Armar con Armando Vega-Gil. Coordinó y colaboró en la publicación Pasiones en el 2008. Publicó con el Colectivo de Escritores de la Ciudad de México “Conciliábulo de Marranos”. Participó en 7° y 8° Encuentro Nacional de Poesía Max Rojas Ciudad de México. Actualmente prepara un libro de poesía y otro de cuentos.

Tu humo

No fue el humo de ese cigarrillo tuyo lo que dejó
Muertas las aves nocturnas, los olvidados recuerdos.
No fue ese humo lo que desplomó a los caminantes es día noviembre
Y tampoco fue ese humo quien cerró la puerta a las ánimas.
No, no fue ese humo tuyo, fue ese porvenir sin futuro dado
La pérdida de esa niñez temprana. El robo de esa ilusión.
Las telarañas que tenía la mente poco a poco se fueron desenmarañando
Y ahora al ver ese humo de tu cigarrillo veo reflejado mi propio crimen.

Mi morada

Cuando las horas muertas pasen mi paisaje tendrá matiz
Esos rostros que ultrajaron esa noche mi espíritu
Desaparecerán con el color del canto del pájaro
Y la lluvia caerá de nuevo recordándome las horas largas
Que descubrí en ese lugar solitario junto a ti.

Borraré esas manos como cuervos que hicieron tirones ese vestido blanco
Y lo trocaron en color escarlata, gris y apenado.
En mi morada te veré con el sol de otoño, la primavera ha pasado
Rápido, que no recuerdo ningún florecimiento, ni la brisa que da el verano.
Las sombras que dibujaba cada noche con la luz de la luna
No serán ya las mismas, porque fueron transgredidas.
Se disolverán los rostros en algún sumidero.
Y en mi morada volaremos a esos cielos de aires invernales
Con la gama de las sombras.

Ángel muerto

Con el tacto de la alborada en tus ojos sumidos
Veo la imagen de esos recuerdos rotos por el tiempo.
Entro de súbito a ese cráneo oscuro que dejó
Un ángel muerto una noche fría.

En tu mirar veo al crío que lloraba y
Lo atabas a tu pecho como una sanguijuela
Comía tu alma y llenaba tus penas de
Días oscuros sin estrellas y con soles morados.

El crepúsculo te llegó de golpe, no te avisó
No se molestó en llevarse ese cuerpo que cobijabas
Con tus brazos como filamentos inquebrantables.
Los rompió con el aire frío y desprendió polvo oscurecido.

Todo esto sucedió una mañana luminosa
Cuando un pájaro cayó del cielo y
Arropó con sus alas tu cabello azabache
Qué en un instante se cubrió de nieve.

Nunca más volvió a salir la luz en esos ventanales
Cerraron sus cortinas y el sol se escondió en el armario.
Ahora tu grito mudo, dolorido
Sale de esa cueva seca para volar en busca de tu serafín.
Me ves viva…

Me ves viva porque eso pervives de mí
Me ves viva porque mis brazos te dan calor
Me ves viva porque nunca pierdo la sonrisa
Me ves viva porque lloro, como y juego como tú.

Me ves viva porque no somos tan diferentes
Tenemos odio, envidia y desprecio.
Lastimamos al hablar, envenenamos el amor.

Nos vemos reflejadas al espejo, entones
Sí, nos damos cuenta que no nos vemos vivas…
Estamos rotas.

No hay respuesta

No hay respuesta para describir ésta agonía
Que nos reventó el corazón, el pulmón, el
Alma y dejó éste río en nuestros ojos
Y cubrió toda la arena.

No hay respuesta para entender el porqué
En ese cráneo roto se escaparon los recuerdos
Ni para ese rostro ojeroso de hospital nocturno.
Ni para saber dónde quedaron los tulipanes de tarde.

No hay respuesta para ese vientre sin lucero
Para la locura que ha nacido en la cabeza
Tampoco para esos labios que cortaron la caricia
Y volvieron cuchillas las sombras.

No hay ya ninguna respuesta para los hijos
Que gritan en la alcantarilla, y las ancianas que se les
Secaron los huesos y su polvo amargo vuela en el aire.
No hay ninguna respuesta.

La muerte no tiene réplica, nunca la tendrá
Ahora te veo tendida ahí con el rostro cadavérico
Rodeada de buitres que vuelan en círculos
Esperando que apague la luz.

Polidora Gomez
(Colombia)

Polidora Gómez Villalobos nos presenta su obra prima Hilván de retazos, donde crea, evalúa y revalúa con un conjunto de palabras que se alejan de los ideales tradicionales, pero centrada en valorar la percepción imperecedera de sus recuerdos. La poeta mantiene las calles, las risas, la tradición, el amor y el recuerdo de los suyos, de sus vivencias de una Ciénaga - Magdalena- de antaño, enmarcada en el olvido, pero traída con sutileza y encanto en sus páginas la hace en sí una "aldea universal" (parafraseando...) La poeta vive y sueña en el amor, pero no olvida las bases de la poesía donde conjugar y emancipar vivencias son necesarias.

BITACORA DE LA PALBRA

LA MENTE, HABITADA POR UN PUEBLO DE PALABRA, A VECES TIERNAS, VORACES,
AMOROSAS, QUE SE ALEJA VIAJANDO ENTRE TINTAS, A VECES: FUERTE, PÁLIDA O
DIFUSA.
YA CONVERTIDAS EN MEGA CIUDAD, BROTAN ENTRE PERGAMINOS
COMO LUZ DE BITÁCORA, DESBORDANDO PRIMAVERAS, ATANDO
VENDAVALES, CONSTRUYENDO TRINCHERAS DE SENTIMIENTOS
QUE VAN FORMANDO RÍOS QUE RIEGAN LA VIDA EN LA TIERRA.
PERO, LAS QUE NO VIAJAN ENTRE TINTAS, TRANSFORMADAS EN ARTE
LAS OBSERVAS PLANTADAS DE CUERPO ENTERO DESDE OTRA ORILLA
A LA VERA DE LAS HUELLAS DEL TIEMPO Y LAS INTERROGAS
TE ESBOZAN UNA TRISTE ALEGORÍA CON UN AURA DE CORAJE
RESISTENCIA Y AMOR A LA VIDA.

CERCA DEL JAGÜEY, NIÑOS JUGANDO BAJO UN ÁRBOL FRONDOSO
EN LAS RAÍCES DE SUS CABELLOS Y LA DELGADEZ DE SUS CUERPOS
SE REFLEJA EL CUADRO ATERRADOR DE LA HISTORIA RECIENTE;
INCOMPLETA, DIFUSA DE LA QUE VA BROTANDO EL SUFRIMIENTO EN INTERMINABLE
ESPIRAL DE VIOLENCIA.

AL FONDO, SOBRE LA NATURALEZA LA VIDA CAYENDO COMO GAJO
DE UVA DERRAMADO, FRENTE AL SOBREVIVIENTE
QUE RESPIRA CON EL HORROR ATRAGANTADO
EL ARTE YA CONVERTIDO EN ESPEJO RETROVISOR, TE RESPONDE
TU IMAGINACIÓN DEVASTADA, RECONOCE ESAS HUELLAS
Y SU TENEBROSO DESANDAR
EL PASADO REGRESA…

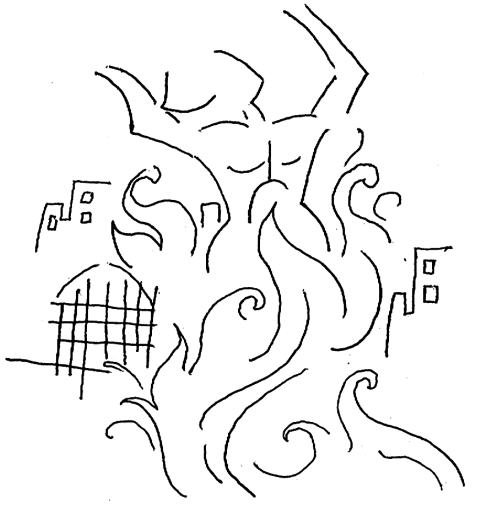

LA CASA DE TODOS LOS TIEMPOS

TODO ESO CRECÍA,
EL RETOZO INCESANTE
ERA MÁS QUE UN BULLICIO
EN CASA DE TODOS LOS TIEMPOS.

EN PLENA CONFUSIÓN,
SE DIBUJABA EL PASADO
EN FOTOS A BLANCO Y NEGRO
MIENTRAS EL PRESENTE,
SE ACOSTUMBRABA A VIVIR EN CUCLILLAS
A FALTA DE UN ESPACIO
DONDE ACOMODAR LA SILLA.

SENTADA EN EL COMEDOR
FRENTE A LA PUERTA DEL PATIO,
OBSERVABA EN DÍAS DE INVIERNO EL AGUA PRECIPITADA POR LA BRISA
O FLOTANDO EN UNA PONCHERA,
PEDACITOS DE CIELO
HASTA QUE ELEVADA POR EL NIVEL DEL AGUA
SALÍA A NAVEGAR ENTRE LOS ÁRBOLES.

EN MEDIO DE ESE TIEMPO
TODO LO RESPIRABA HASTA EL FONDO

PRESAGIO

Por Encima Del Horizonte,
Resbalaba El Sol,
Con Sus Destellos, Ocre Y Naranja.
El Agria Murmuraba
Bajo El Enloquecido Viento
Que Corría En Noches De Marea
Hasta Los Playones De Agua Coca,
Como Arrastrando Un Presagio,
Despeinando La Enea
Que Entumecida Observaba.

La Brisa Fresca Bajaba De La Sierra
Y Abrazada Por El Viento,
Lo Pellizcaba Con Fuerza En El Rostro
Enloquecida Por El Olor A Océano.

La "Maríapalito' Contemplaba Exhausta
Y Comenzaba A Caer En Círculo;
Sobre El Humedal,
Sobre Un Sapo Desenterrado
Polvorín Que Se Agachaba
Bajo La Lluvia
Y Más Allá.. .Más Allá, La Zona Bananera,
Testigo Presencial De La Barbarie
La Noche En Que El Pueblo Cienaguero
Vio Caer Parte De Sus Entrañas

Y Emerger La Poesía,
Cantada Por Los Poetas Que Aún Llevan
Como Velas Encendidas

Fragmentos De Un Sol Despedazado

TU LLANTO

VIDAS ARREBATADAS
EL SILENCIO SEPULTADAS
SI PUDIERAN ESCUCHAR TU LLANTO...
COLOMBIA EN TU ROSTRO DEVASTADO
SE DIVISAN BROTES
DE LÁGRIMAS NEGRAS
MUERES LENTAMENTE
SIN QUE TU PUEBLO SE INMUTE
ESTA GENTE NO PARECE TUYA;
LOS OBSERVAS SIN PRISA
SIENTES SU ANDAR,
LASTIMÁNDOTE LA PIEL
TE RECORREN COMO EN OTRORA
AMPARADOS EN LA SOMBRA
DEJANDO UNA ESTELA DE SAQUEO

Y EXTERMINIO
TUS HIJOS IGNORAN TU LLANTO...
COLOMBIA
CONVIRTIÉNDOTE EN EL FANTASMA
AL QUE TODOS TEMEN
SI ESCUCHARAN TU LLANTO,
PERO NO RUEGAN ALUCINADOS,
PORQUE NO CESE
LA HORRIBLE NOCHE.

NATURALEZA DESCALZA

VIAJO, TRAS LAS HUELLAS
DE LA NATURALEZA DESCALZA
HASTA LA CIMA.

EN EL COSTADO IZQUIERDO

DE SU ROSTRO, PALMERAS MODELAN
AL RÍTMICO COMPÁS DE LA BRISA.
EL MAR, EN MANSEDUMBRE PERPETUA
DUERME ENTRE VELADURAS Y SUEÑA.

UN RAYO DE LUZ,
ACARICIA LA ESPALDA A LA TIERRA BENDECIDA,
QUE TIEMBLA.

EL PLUMAJE DEL ALCATRAZ,
SE MECE REFLEJADO EN EL AGUA.
TODO ESTÁ COMPLETAMENTE
ABIERTO... ENTRO.
MI PINCELADA VACÍA EL CORAZÓN DESBORDADO DE EMOCIÓN,
POR CONTAGIO.

CONFINAMIENTO

LAS NOTICIAS SOBRE LA PANDEMIA SE SENTÍAN LEJANAS MIENTRAS LA MODERNIDAD LA ESPARCÍA.
EN ESTA ANTE SALA SOÑABA CON UN RIO DE AGUAS NEGRAS EN EL QUE LA GENTE DISFRUTABA MIENTRAS SE DESBORDABA ENTRE LOS PATIOS, HASTA INUNDAR LA ENORME COCINA CON ENTRADAS Y SALIDAS AL CAMINO POR EL QUE SUBÍA.
OBSERVABA SIN ENTENDER, LA TRANQUILIDAD DE ESA GENTE,
LA MISMA DE HOY, EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA,

QUE ABRAZADA POR EL CALOR Y LA REALIDAD SOMBRÍA
EMPIEZA A CONFINARSE CON UN TEMOR RECIÉN NACIDO, QUE CRECE.

DESPUNTANDO EL DÍA, SENTADA BAJO UN PEDACITO DE CIELO
VEO CAER, UN RAYO DE SOL QUE SE DERRAMA SOBRE MI PIE IZQUIERDO.
LLEVA MUCHO TIEMPO DERRAMÁNDOSE, SOBRE: EL PISO, EL LAVADERO, LA CUERDA DE DONDE CUELGA LA SABANA QUE DANZA CON EL VIENTO.

AL FONDO; EL CABALLETE, LAS HORTENSIAS APOYADAS EN LA PARED MIENTRAS ESCUCHO LA PRONUNCIACIÓN DE FRASES EN FRANCÉS Y EL GRIFO GOTEAR.
SIGO SENTADA EN EL ESPACIO QUE SIEMPRE HA SIDO MÍO SIN RECONOCERLO. EL CONFINAMIENTO LO PUSO AL DESCUBIERTO
IGUAL QUE AL HOMBRE SU ENORME POSADA LA QUE LE ESTORBA Y TORTURA.

EL CALOR INTENSO ME REGRESA. PARA SEGUIR CONFINADA A MERCED DE LA AGOTADA NATURALEZA ERIGIDA EN POSICIÓN DE DEFENSA FRENTE LA HUMANIDAD, QUE SE REHÚSA A RECORDAR SU ASOMBROSO… REGALO DE LA VIDA.

Ebelis Corzo Oñate

(Colombia)

Nació en Fonseca Guajira, en 1972. Licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Magdalena. Diplomada en Educación y Desarrollo Psicoafectivo en la Universidad del Norte de Barranquilla. Adelantó estudios de francés en la Alianza Francesa de Santa Marta.
En su vida Universitaria perteneció al Taller Literario Jorge Luis Borges.
Cuentos y poemas de su autoría han sido publicados en: Revista dominical Macondo; Antología Relata Cuento y Poesía; Red de Escritura Creativa; Magazín del Caribe (Escritores del Magdalena); Antología Poética Colombiana "La Palabra Provocada" y en la Antología Poética del Caribe Colombiano "Hilando Esperanzas" Autora de los poemarios "Quietud", "Cotidiana", "Silencio".
En el año 2020 participó en: Festival virtual de literatura "Talium Fest" de la Universidad del Magdalena, Festival de Poesía Realenga de Venezuela, "El amor en los tiempos del Covid" Aracataca Social, "XXXVI Encuentro virtual de poetas Colombianas" Roldanillo Museo Rayo, Tertulia "Voces Nuevas" Facatativá, "X Poetón Plenilunio", "Homenaje al poeta Mario Benedetti en su centenario" Uruguay, Viernes de poesía femenina "Chedamy Es Aluna" Santa Marta, "Mil voces un Canto" Colectivo BBC , "Bbceando la palabra para nombrar la vida", "XXII Encuentro de poesía y la palabra". Instituto Municipal de cultura y turismo de Tenjo, Primer Encuentro Internacional "Lecturas Urgentes de Poesía". Fundación Grainart, "Vitaminas Diarias de Poesía". Caldas, "Cuarto Encuentro Internacional de mujeres poetas y narradoras en Macondo".
Publicaciones: Antología Poética Mexicana. Libro "Soberbia". Antología Poética Colombiana "La Palabra Provocada".
En el año 2021: Día Internacional de la mujer "Mujeres Resilientes" Alianza Francesa de Santa Marta, "Rincón de la poesía". Universidad Santo Tomás.
Publicaciones: Antología "67 Voces al Viento", Antología Mexicana. Libro "Amor".
Poesía Andante (Estrategia para la sensibilización social frente a la poesía "Nocturno Marino".
Homenaje a Santa Marta 500 años. Publicación bilingüe Español Francés.
Recital de mujeres poetas del caribe colombiano. CECAR Sincelejo.
Antología Poética "Susúrrame un poema Magdalena. Ediciones Grainart. Santiago de Cali Valle del Cauca.
Antología Relatos, cuento y oralidad "Tejiendo memoria". Instituto Cultural Iberoamericano.
Año 2022; XVI Festival Internacional de poesía Palabra en el mundo sede Querétaro, México.
Antología Némesis. Lima Perú.
32 Festival Internacional de Poesía de Medellín.

ROBO CUENTOS

Robo cuentos y la vida me sorprende.
Días que se esfuman
en la complicidad del silencio.
Lágrima furtiva.
Gotitas de tinta.
Pies de barro.
Callejón infinito donde viene el alba
y mi mente cuenta sus propias historias.
Observo trabajadores de la calle
que cantan y pelean con el cemento.
Guardo las llaves de la voluntad en mis
bolsillos
Y leo versos para conciliar el sueño.

QUIETUD

Huele a lluvia a chocolate.
Eso dije en voz queda de espaldas al mar
con mi rostro descompuesto
y gestos en mi boca.

El corazón se convirtió en lágrimas.
Desollando magia en el lápiz, oigo quietud.
Toco tu rostro en el papel.

Puñaladas de recuerdos.
Yo en pedazos.
Ahora puedo contar historias en tu piel.

AROMA DEL CAFÉ

El aroma del café
embellece la casa.
Cambio de rutina,
las ollas quedan sin lavar,
mis manos están libres
de agua y fuego.

Salgo a pasear y me alegran
los papelitos de colores
que adornan calles estrechas.
En el camino escucho a un hombre
que canta desafinado a cambio de
monedas, la sombrilla reposa en mi bolso.

Prefiero que el sol cubra mi cuerpo
y alcance a quemar nostalgias.

I.
El espejo
me reclama una sonrisa,
despejo los monstruos
que insisten en habitarme.
El refugio… La libreta de notas.
Ruego a la primera tormenta del año
que no moje mis poemas.
Con la aridez de mis ojos basta.

II.
Brotan libros de las paredes,
el lapicero en flor ofrece su amistad,
soy resistente al descanso.
El poema inmuniza la locura.
Tomo el café, huelo la taza.
La poesía le está ganando a mi vida.
Identifico heridas para alcanzar la serenidad.
Respiro tus palabras,
paso los versos por mis ojos.
No fue una tarde perdida.
El tiempo… ladrón de la memoria.

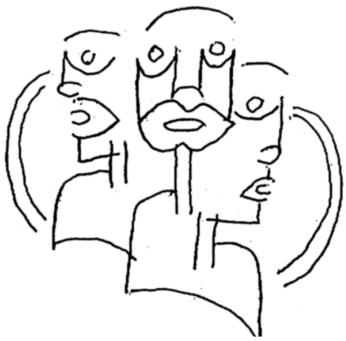

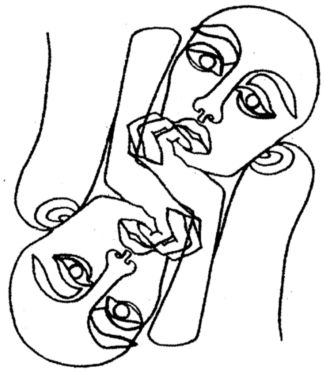

SOLEDAD DEL CARMEN

Veo a mi madre.
Camina más lento y con dificultad,
responde con sonrisas.
Sus ojos nublados merodean la tristeza.
Sola, en esa casa de tejas y paredes altas.
Recorro la casa, observo los detalles,
escucho el silencio.
En la sala vive el mismo espejo,
en el comedor no están los platos
servidos de alegría,
en la cocina un par de ollas a fuego lento,
los cuartos organizados,
en el patio un retoño
que acompaña al eterno Olivo.

Mi madre mueve su bata al despedirme,
muestra sus pequeños dientes
y yo me voy con la lista
de sus necesidades en mis manos.

L u c í a P é r e z
(California)

En modesto homenaje a Irene Gruss

(Blues y candencia de tango)

¿Se ha perdido tu sonrisa Lucía?
No lo creo. Tus labios, como siempre,
dibujan esa risa de muchacha.
¿Apartaste tu mirada de las pequeñas
cosas de la vida cotidiana?

No lo creo. Tus ojos aún brillan
porque su luz no se ha disipado en la oscuridad.
Brillan, y Amy Winehouse, también sonriendo,
canta solo para vos Back to Black
y la canción te devuelve al instante justo
cuando caminaste de sueño en sueño
cómo sólo las muchachas simples pueden
hacer cada día a cada instante.

¿Llevaste algo de equipaje para tu viaje?
¿Sólo tu melena negra algo desordenada,
y algo del viento salado del mar
que viaja subido a tus redondos hombros?
¿Llevaste algo de equipaje para tu viaje?
Mamá quiere saber porque ella te
preparará lo que le pidas.

Algo de sol que te acaricie para que
no sientas frío,
alguna flor que te dé su perfume
y un ramo de besos de los que te aman.
No es mucho, por supuesto,
pero será suficiente. Pedí lo que quieras.

Lo que vos pidas te será otorgado.
Afuera (afuera es aquí, allá, en todos lados),
miles de otras muchachas están a tu lado,
concuerdan tu camino y el de todas ellas.

No exagero. Miles. Todas Lucías.
¿Te parece extraño? Todas Lucías.
Llevan tu mirada a todas partes
y también tus sonrisas, tu música elegida
y tus amorosas ilusiones.
Y todo eso a pesar de los jueces
que quieren quitarte del camino.
No saben qué hacer con tu presencia.

Ellos, los que reparten injusticias
babean sus ridículas sentencias judiciales.
Los jueces, muchas veces, están para eso,
sólo para eso. Y vos lo sabés, Lucía,
mejor que cualquiera de nosotros.
Hemos escuchado sus ridículos alegatos
y sus pretensiones de señores del feudo.
Pero las cosas no quedarán de este modo.
De eso estamos seguros
porque no vamos a desandar lo caminado.

Viaja tranquila, Lucía, te esperamos.
Tus esperanzas son ahora tan nuestras
como si hubiesen estado siempre
dentro de cada corazón humano.
¿Cómo van a hacer para que no logremos
lo que todos nosotros exigimos?
Los violadores, sus protectores,
los que nos humillan a diario
finalmente serán derrotados. Completamente.
Viaja tranquila, Lucía, hasta la Justicia.

Lo que no puedo decir es cuán largo será tu
viaje.
Pero cuando llegues al fin a tu destino
serás feliz entre todos nosotros.

In modest tribute to Irene Gruss 1

(Blues and tango license)

Is your smile lost Lucia?
I don't think so. Your lips, as always,
they draw that girls laugh.
Did you take your eyes off the little ones
things of everyday life?
I don't think so. Your eyes still shine
because its light has not dissipated in the dark.

They shine, and Amy Winehouse,
also smiling,
sing just for you Back to Black
and the gang returns you to the right instant
when you walked from dream to dream
how only simple girls can
do every day at every moment.
Did you take some luggage for your trip?
Just your black hair a little messy,
and some of the salty sea wind
who travels up on your rounded shoulders?
Did you take some luggage for your trip?
Mom wants to know why she has to prepare
what you ask for.
Some sun that caresses you so
you don't feel cold,

some flower that gives you its perfume
and a bouquet of kisses from those
who love you.

Not much of course
but it will be enough. I asked what you want.
What you ask for will be granted.
Outside (outside is here, there, everywhere),

thousands of other girls are by your side,
They all share your way
I'm not exaggerating. Thousands. All Lucías.

Does it seem strange to you? All Lucías.
They take your gaze everywhere
and also your smiles, your chosen music
and your loving illusions.

And all that despite the judges
who want to get you out of the way.
They don't know what to do with
your presence.
They who distribute injustices
they drool their ridiculous court sentences.
The judge's, many times, are there for that,
just for that. And you know it, Lucia,
better than any of us.

We have heard your ridiculous allegations
and their claims as lords of the fief.
But things will not stay this way.
Of that we are sure
because we are not going to retrace our steps.
Travel calmly, Lucia, we are waiting for you.

Your hopes are now so ours
as if they had always been
within every human heart.
How are they going to prevent us
from achieving
what we all demand?
The rapists, their protectors,
those who humiliate us daily
they will finally be defeated. Completely.
Travel quietly, Lucia, to Justice.
What I can't say is how long your
journey will be.
But when you finally reach your destination
you will be happy among all of us.

Chen Hsiu-chen

(Taiwan)

Chen Hsiu-chen is the executive editor of 'Li' poetry magazine, has published books including 'Non-dairy, 2009', 'String Echo in Forest, 2010', 'Mask, 2016', 'Uncertain Landscape, 2017', 'Promise, 2017', 'Poetry Feeling in Tamsui, 2018', 'Fracture, 2018', 'My Beloved Neruda, 2020', 'Virus takes no rest, 2021', 'Encountering with Cesar Vallejo, 2022' and 'Heaven on Earth, 2022'. Some poems have been translated into more than twenty languages. She participated various national and international poetry festivals in Bangladesh, Macedonia, Peru, Tunisia, Chile, Vietnam, Romania and Mexico from 2015-2021, won 'Morning Star Prize' from Peru in 2018 and 'Naji Naaman Literary Prizes' from Lebanon in 2020.

The Sky of Neruda

The wind
tears off the notices from autumn one by one
that posted in the form of red maple leaves.
My heart in despair listens to
your one hundred love poems

The spring is in the distance.
I heard someone calling
a sound after a sound.

An ocean is hidden secretly in my heart.
From the Taiwan island
I am flying to the sky of Neruda
to praise in a high key
the love sonnets.

Oh, my Neruda,
I love you
as a Forgetting-me-not loves the May.

Oh, my Neruda
I am afraid
I would love you so
as the waves love the rocks along the coast
to crush myself.

Whisper

The white flowers
fly like snow.
The clop-clop sounds of high heels
stepped on a row of flowering trees
have dipped a luxurious floral smell.

It sounds like a Illusion
or a spell
Forget me not! Forget me not! Forget me not!
Is it the whisper from the petals
or the voices suppressed in my deep heart?

Oh, my Neruda,
under the starry sky of Santiago
my heart blooms like snow,
its petals are going to drift into your heart.

Forget Me

Not only the white flowers
even that red, orange, yellow and purple wildflowers
also under encouragement by the spring breeze
compete to one another in murmuring
in murmuring to me:
Forget me not! Forget me not! Forget me not!

Not only the waves or seabirds
even the leaves also under the silver moon-light
whisper to me
Forget me not! Forget me not! Forget me not!

Not only the valleys or hills
even the stars, moon and sun
also whisper to me uninterruptedly
Forget me not! Forget me not! Forget me not!

Oh, my Neruda,
It is you the only one in the world
have not confessed to me yet:
Forget me not! Oh,
Forget me not!

The Eyes in Santiago

The eyes are everywhere
as the narks arranged
here and there.

Like overbearing eyes of
a strict lover
in the inner room or garden
to test whether love is
persistent or not.

The eyes seem
being restrained by desire
to look for
a blind love.

Oh, my Neruda,
there are so many eyes,
eye, eye, eye.
Which one is mine?
Which one is yours?
Can we combine to form a pair of eyes
staring at the same star ?

I deliberate to capture you
but afraid, instead,
to be captured by you.

(English Translation by : Lee Kuei-shien)

Gerardo Ciancio

(Uruguay)

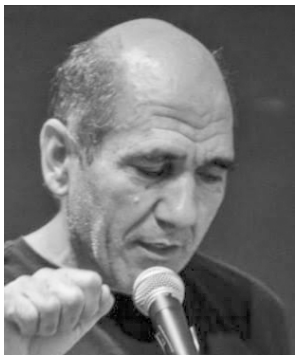

Gerardo Ciancio (Montevideo, Uruguay) is a professor of literature, holding a master's in Education Management. He has published the books of essays La crítica literaria integral (Premio Nacional de Ensayo, 1997), La ciudad inventada (Premio de Ensayo Academia Nacional de Letras,1998), La cultura en el periodismo y el periodismo en la cultura (2007), and Soñar la palabra (Premio Internacional Fundación Benedetti, 2012) and the poetry books Arquitrabe (2010), Cieno (Premio Nacional de Poesía, 2011), Haikus de Kiushu (2017), Los ojos críos (2021), and Linaje (Premio Onetti de Poesía, 2021), as well as the anthologies Nada es igual después de la poesía: 50 poetas uruguayos del medio siglo (2005), El amplio jardín: Poesía joven de Uruguay y Colombia (2006), and Los hijos del fuego: Poesía joven de Uruguay (2013). His unpublished book Casa de Salud (Nursing Home) won the Onetti Poetry Prize 2022. He earned a grant from the Ministry of Culture of the People's Republic of China to undertake studies at Peking University (2011), a grant from Japan's Agency of International Cooperation to undertake studies in said country (2012), and a grant from the Fundación Carolina to undertake studies in Madrid (2002).

Fragments of the book

Nursing Home

A rare transparency
makes the morning
and we enter the Nursing Home:
Mom lives in it with her faded words
wrapped in the sweet fervor of her single life.

The Home is a wasteland with steps of imaginary animals
and the burning of the siesta that makes all words unbearable.

Mom, I'm afraid
of silence
like a cliff from which we will not return.
(Your parched eyes seem to be roaring.)

Listen to my shaking voice
that scrapes
these checkerboard floors
these asbestos tiles
and the touch of the word Night.

Wrapped in the abstraction of your angels, Mom,
your holy card angels
those who did not descend at the call of your mended voice
because the ossuary of the poem howls in the long night
and among the leaves of the plane trees
the moon stalks
like an unknown animal of light
like a quiet bird of rigor.

This is the world, Mom. This is it. A spell.
There's an impulse of light
coming from somewhere
and we don't see it.
The whole garden burns along your eyes
and a motley owl is drawn in your brain.

The rest: silence.

I remember when you used to bring out the words
like mud
from your throat
and the afternoon was unfolding
and the landscape grew weary
in a pinkish horizon
alerted
from the bottom of the bay
and the thunderous flight of the lapwing
beating the wings of the world.

Language slips
little by little
on the

dazzling
ceramics
of the table
and the candor traces with which we watch
how the flowers devour us
in the landscape.

And the air feathers every word it touches
until it makes us look at
this reality that is already erased
through the corridors of the Nursing Home.

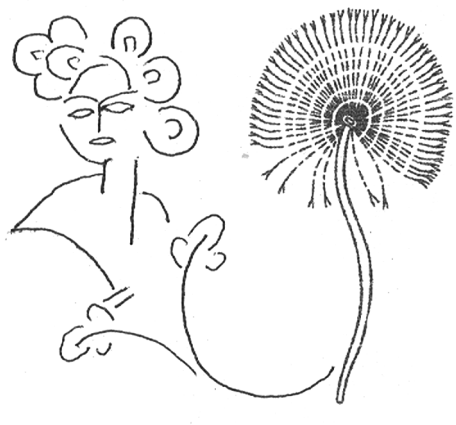

Fragmentos del libro
Casa de Salud

Una transparencia inusual
se gana la mañana
y entramos a la Casa de Salud:
mamá la habita con su decir desmadejado
envuelta en el dulce fervor de su sola vida.

La Casa es un yermo con pisadas de animales imaginarios
y el ardor de la siesta que hace insoportables todas las palabras.

Tengo miedo, mamá,
del silencio
como un precipicio del cual no volveremos.
(Parece que bramaran tus ojos resecos.)

Escucha mi voz desalineada
que raspa
estos pisos en damero
estas baldosas de amianto
y el tacto de la palabra *noche.*

Envuelta en la abstracción de tus ángeles, mamá,
tus ángeles de estampita
esos que no descendían al llamado de tu voz remendada
porque el osario del poema aúlla en la larga noche
y entre las hojas de los plátanos
la luna acecha
como un animal de luz desconocido
como un quieto pájaro de rigor.

Este es el mundo, mamá. Es esto. Hechizo.
Hay un envío de luz
que llega de alguna parte
y que no vemos.

Todo el jardín arde a lo largo de tus ojos
y un búho abigarrado se dibuja en tu cerebro.

El resto: silencio.

Recuerdo cuando sacabas las palabras
como barro
de tu garganta
y la tarde se iba desdoblando
y el paisaje se fatigaba
en un horizonte rosáceo
alerta
desde el fondo de la bahía
y el vuelo atronador de los teros
que batían las alas del mundo.

Resbala el lenguaje
de a poco
por las
cerámicas
encandiladas
de la mesa
y los restos del candor con que miramos
cómo nos devoran las flores
dentro del paisaje.

Y el aire empluma cada palabra que toca
hasta hacer que miremos
esta realidad que ya se borra
por entre los pasillos de la Casa de Salud.

Translated from Spanish to English by : **Teresa Korondi**

Gili Haimovich
(Israel)

Teresa Korondi
(Uruguay)

Teresa Korondi is a Uruguayan poet, narrator and performer, who also engages with literary translation. She holds a Diploma in Analysis and Poetic Studies by Fundación La Poeteca, Venezuela. She also gives workshops, lectures and readings at festivals and educational institutions in several countries, such as the Federal University of Pelotas, Brasil, and the University of Palermo, Argentina, which later gathered into the book Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XLIV (Academic Reflection on Design and Communication Nr XLIV, 2020). In 2014 she obtained the "Fondo Nacional de Música" (National Fund of Music) to produce Bo, a poetry-song album. In 2019 she edited the anthology Del Salvo al Barolo – un rioplatario poético (From the Salvo to the Barolo - a Poetical Riverplate). She is part of the 3rd Nancy Bacelo Illustrated Poem Exhibition 2022 Edition, of the Program for the Strengthening of the Arts (Municipality of Montevideo).

She had published ten books, including : La enunciación ('The Enunciation' 2016), Escandinavia ('Scandinavia' 2018), Par ('Pair' 2021), Corre, corre ('Run, Run' - IberLetras publication series - Argentina/Spain, 2021), the book Rodó porque rodaba ('It Rolled Because it Rolled', 2023), which received a National Poetry Award of the Ministry of Culture and Education in 2021 and Otaku, that came out in Argentina (2023).

Gili Haimovich is a prizewinning bilingual Israeli poet with Canadian background. She is the author of four poetry books in English, including *Promised Lands* (Finishing Line Press, USA, 2020), six in Hebrew, and a multilingual book, *Note* (El nido del fénix, 2019, Mexico).

She was awarded prizes for best foreign poet at the international Italian poetry competitions *I colori dell'anima* (2020) as well as *Ossi di Seppia* (2019), a grant for excellency by the Ministry of Culture of Israel (2015), a fellowship residency at the International Writers' Workshop Hong Kong (2021), and more, including several grants for her Hebrew books. Her poems are translated into 33 languages including full-length books in French, Serbian and Estonian. Her poetry is featured worldwide in numerous anthologies and journals such as: *The Best Asian Poetry Anthology,*

World Literature Today, *101 Jewish Poems for the Third Millennium, A World Anthology of Border Poetry - Blurred and Political* and major publications in Israel such as *The Most Beautiful Poems in Hebrew – A Hundred Years of Israeli Poetry*, *A Naked Queen – An Anthology of Israeli Social Protest Poetry.*

Gili participates in festivals and literary events in Canada, France, Mexico, Italy, India, Romania, Hong Kong, Taiwan, Kosovo, Chile, Kenya, Mongolia, Estonia and more. Gili also works as poetry translator. Her translations include the eminent Israeli poet Nurit Zarchi, the first Estonian poetry book published in Israel, *And the Line Turns into Shadow* by Mathura and *Dust and Colors* by the laureate Estonian poet Jaan Kaplinski. She works as an educator of creative writing as well, teaching in Israel and overseas such as in India and Canada and as a visual artists with her photography presented and exhibited in the US, Canada, Chile and Israel.

Being there

and being myself a roofed cave
to blow us up

My body no longer leaves the wake of your eyes
Hesitated when danger
ignorant of the giant
rushed to penetrate the memory
and saw the future
that unpicked wool sacks
hair by hair
Then this fear
wrapped around my palate
like a cat on the fine branch of the heights
stopped by instinct
and a talisman glowed in the muzzle of my legs
Opened the path of the Ossuary Weddings
until the last ash

Estar y ser

una cueva cerrada
para volarnos

Mi cuerpo ya no sale de la vigilia de tus ojos
Vaciló cuando el peligro
ignorante del coloso
se lanzó a penetrar en la memoria
y vio el futuro
que descosía sacos de lana
pelo por pelo
Entonces este miedo
arropado en mi paladar
como un gato en la rama fina de la altura
se detuvo por instinto
y un talismán resplandeció en el bozal de mis piernas
Abrió el sendero de las bodas de hueso
hasta la última ceniza

Holding Water

The day after our wedding,
at the beach in Palmahim,
pierced happiness,
a puncture for longings
to go through.
You held me
and I held water
and said:
“This is happiness. Happiness is happening right now”.
It was easy to be easy-breezy on the day after our wedding
in your hands
when you put them on my trigger
I know that happiness is a warm gun
yes it is yeahhh

Retener el Agua

El día después de nuestraboda
en la playa de Palmahim,
la felicidadperforó,
un pinchazo para que los deseos
atravesaran.
Me sostuviste
y sostuve el agua
y dije:
“Esto es la felicidad. La felicidad está
ocurriendo ahora mismo”.
Era fácilestartranquila el día después de
nuestraboda
en tus manos
cuando las pusiste en mi gatillo.
Sé que la felicidad es un arma caliente
sí lo es yeahhh

Now they are melted

the auroras of chance
So we are painting

I tripped halfway
in the womb of the street
Where we were conceived
humankind
split down the middle
as a peerless pair
Half-dead
in boredom
until the stumble
the clumsiness
the twilight fruit
A cardinal fusion
of bodies
We stumble
it is foretold
to rise
among the living
like odd gods

Son derretidas

las auroras del azar
Así pintamos

Tropecé con la mitad
en el vientre de la calle
Ahídondenosconcebimos
humanidad
partida al medio
como par sin par
Mediosmuertos
en el tedio
hasta el tropiezo
la torpeza
la frutaatardecida
Un fundirse cardinal
de cuerpos
Tropezamos
estádicho
para levantarnos
entre los vivos
como dioses impares

Before the Becoming

The people who knew us before our becoming
peel the darkness we carry
in the hollow pockets of our parka.
They witness our novelties,
quietly shaming.
Useful for nothing but heartwarming,
no confessions can be made
to the people who knew us before our becoming,
the ones we still secretly carry.
As much as I’m peeling your layers of clothes
away,
I’m unable to take away our familiarity.
The people that know us much after becoming
let the heat of their body shade our bareness.

Antes del Devenir

Las personas que nosconocieron antes de nuestrodevenir
quitan la oscuridad que llevamos
en los bolsilloshuecos de nuestroabrigo.
Son testigos de nuestrasnovedades,
avergonzándose en silencio.
Reconfortanteaunque de nada sirva,
ningunaconfesiónpuedehacerse
a las personas que nosconocieron antes de nuestrodevenir,
a quienesaúnllevamos en secreto.

Por mucho que te quite las capas de ropa,
soy incapaz de despojarnos de nuestra familiaridad.
Las personas que nosconocen mucho después de nuestro devenir
dejan que el calor de su cuerpo sombree nuestra desnudez.

May the fine moon

awaits us in the sea
while it is shining

We are two who shine
in the greed of mirrors
creating a candle for the night
light to the black scale
We are in the darkness
that tries
a mouth of sun that won't let go
I trust us
and caress the beast
that I adore
like a gentle animal
I give it my hands
to eat from them
To eat
them
while I understand
why
we seem invisible

En tanto riela

que en el mar nos encuentre
la luna bella

Somos dos que rielan
en la avaricia de los espejos
haciendo vela a la noche
luz a la escama negra
Somos en la oscuridad
que intenta
una boca de sol que no se deja
Me fío de nosotros
y acaricio a la bestia
que adoro
como a un animal amable
Le doy mis manos
para que coma de ellas
A ellas
que se las coma
mientras entiendo
por qué
parecemos invisibles

All the poems in italic type of font were created in Spanish by **Teresa Korondi** and translated to English in collaboration with **Gili Haimovich.**

All the poems in regular type of font were created in English by **Gili Haimovich** and translated to Spanish by **Teresa Korondi**.

Debasish Dutta

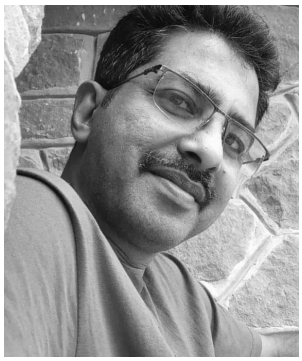

Debasish Dutta is well Known theatre personality With 25 years of theatre experience, Scholar of Sangeet Natak Academy and Member of Paschim Banga Natya Academy, Resource Person of Estern Zonal Cultural center (for theatre workshop) and working experience as a designer with many eminent directors like – Shri K. N. Panikkar, Shri Satish Anand, Shri Bratya Basu "I want to keep the dignity that you have given me as a designer. Please allow me to reject my old design and let me redesign, Shri Bhaskar Mahapatra and many more. And With many more achievements and experiences like 20 Years of experience in theatre design (light, set, costume), And As a director working with institute (IFTA) Institute of Factual Theatre Arts, He also got awards like **Stage Craft Award 2018** for Best Director, **'Dr. Parmanad Pandey Yuva Puraskar'** from Pranggan (Patna), **'Bratyajon Samman'** from Bratyojon(Kolkata), **'Sampark Samman'** from Sampark, Rourkela, Odisa and many more.

Six months with him…

"I want to keep the dignity that you have given me as a designer. Please allow me to reject my old design and let me redesign ."

It's really difficult to begin, memories keep coming like waves. How should I start the article about Kavalam Narayana Panikkar, our dear Panikkar Sir. I consider myself very lucky to have had the opportunity to get acquainted with Panikkar Sir, at the very beginning of my theatrical journey. Those six months of 2009 is a very important chapter of my life. At that point of time I have

completed 1st phase (state level) and 2nd phase (Eastern zone) of the Young theatre artists training program, organized by Sangeet Natak Academy. In the same year, for the first time, my directorial debut production, 'Path, the waterfall', was selected at the Bharat Rang Mahotsav. Almost, at the same time of that year I had the great opportunity to learn the Art of Theatre from the doyen Director Shri K N Panikkar with the support of Sangeet Natak Academy.

I was waiting eagerly with great interest, joy and suppressed anxiety. Finally, the day came. After a hectic journey from Kolkata I reached Trivandrum, and then arrived at the main destination, Sopanam (Sopanam Institute of Performing Arts and Research Centre) which was going to be our address for the next six months. After arrival, I heard that I was the only one from West Bengal and four more friends from other parts of the country got the opportunity. Neeraj Kunder, Kamlesh Malviya, Anita Gupta, Lata Sangre and myself, Debasish Dutta. We started the journey. Panikkar Sir was going to stage a theatrical production in Hindi, for the first time in his life. We had the opportunity to be a part of that work. Some of us will act and some of us will take part in off-stage assistance. In short, we had the unique opportunity to engage and learn from the very beginning of his production process. We were ready to take most out of that…

The work started. The play was Bhavabhuti's 'Uttararamacharita'. It was a unique feeling to see ourselves developing bour craft bit by bit every day and at the same time seeing the theatre production getting ready in front of our eyes. Since we came together from different parts of the country, each of us had different languages, cultures, thoughts and ideas. At the same time, the language, culture and environment of the place where we were working was completely different. Yet in the midst of this diversity we were slowly becoming united. It was the result of the foresight of our mentor Panikkar Sir.

I don't have the ability to explain or analyze how great a theatre director or an organizer or a great teacher he is. But I would like to mention one incident that has become one of the most memorable events of my life . That incident marked the course of my life. Taught me to discover myself as an artist. And the person who was at the center of that incident is our Panikkar Sir. Let me tell you that story now.

Production design was on full swing then. Our friends were performing in harmony with the members of Sopanam. Neeraj and I had decided to handle the backstage and not to perform as actors. Since design and direction was our first priority. So, Sir accepted that too. In the meantime, Panikkar Sir called me one day and gave me the responsibility of designing the set and costume of the production. Me and Neeraj were given the responsibility of light design jointly. The responsibilities encouraged us. We jumped into the new venture.

I have been passionate about painting since childhood. So, I had keen interest in visual design of theatrical productions. I started talking to Panikkar Sir regularly about this subject. I was lucky to get the great opportunity to share, understand, and learn from his valuable thoughts on aesthetics of theatre.

The work process began. There were lots of locales in the play. So the plan of the set was

very minimalistic. Basically, few levels of elevation were used. Reharsals were underway. I saw the characters walking in front of my eyes. Since it was a period drama, the costume and visuals were very important. The costumes were supposed to make the appearance of the characters believable in front of the spectators, the look of the production was supposed to make them look authentic. That's what I was thinking.

I wanted to make the play colorful, eye-catching, glamorous and authentic at the same time. The bright colors of my color palette were floating in front of my eyes. I sketched each character, drew their costumes and filled colour. I wanted to put all my education and experience behind this work. I gave my earnest effort. I was able to create almost a perfect story board and took it to Panikkar Sir. I did it with utmost devotion. I was confident about my work. A suppressed pride and arrogance was playing in my subconscious mind. I looked at Panikkar Sir's face with great interest. He was looking at my story boards and sketches with great interest. As time flew, my anxiety level increased.

Finally he looked at me and said, "well done", only. I expected more, maybe a bigger compliment or a suggestion to improve. Anyway, at that moment I was very excited. I didn't want to waste time. I wanted to start working fast. I began to explain that there was still a lot of work to be done. We have to choose the material to make the costumes. Material must be purchased. Then only we could start cutting and stitching. Then the final fabrication and the decoration. After that there will be a trial. The actors have to wear those costumes for final fittings. He looked at me, and asked with a gentle smile, "what are

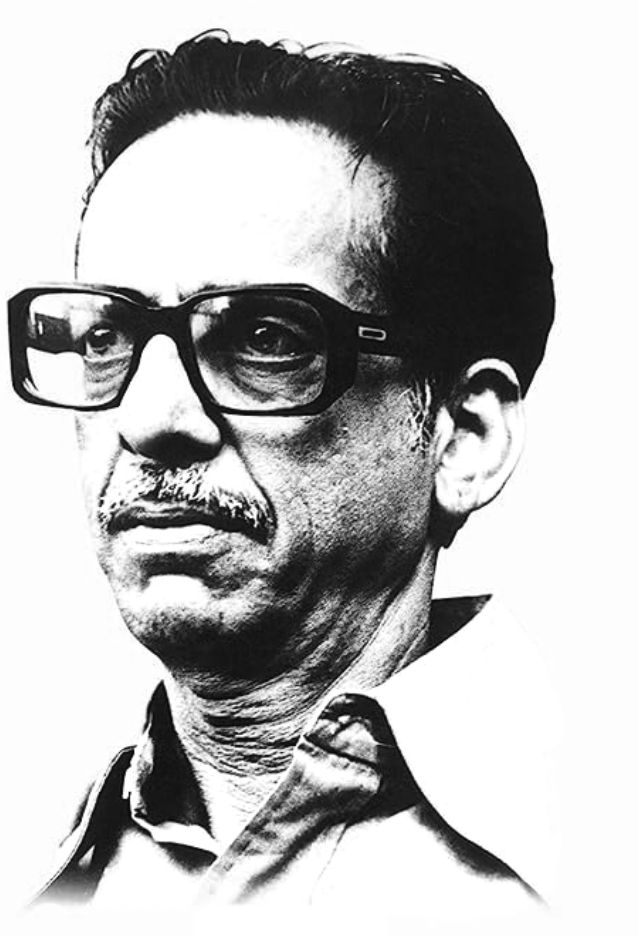

you trying to do?" I was a little shocked to hear his question. He himself had given me the responsibility of this work. What happened then? Keeping my fears in mind, I told him, "Sir, I want to finish the job as soon as possible. "Then the money was approved from the office as per his instructions, the material of my choice was bought, the costume was made. After the costumes were ready, I was looking forward to the costume rehearsal. Several days passed but the costume rehearsal did not happen, so I pursued it with anxiety. I could not resist myself from asking Panikkar Sir, "what's the problem?"

Panikkr Sir did not answer my question directly. Instead he gave me a few assignments for the next few days. The first

task was to go to kannur. Sir told me everything about where to go and whom to meet. I found out later that he had called the gentleman himself and asked him to help us in need.

Neeraj and me caught the night train from Trivandrum station. We had to make a journey of about 500 kilometres. We reached Kannur the next morning. He, who was our guide, took us to a well decorated ground. On the way we heard from him about Theyyam. He told us that theyyam is a popular ritual form of worshipping dance in Kerala and Karnataka. Theyyam consists of several thousand year old traditions, rituals and customs. The performers of Theyyam belong to lower caste community of ancient caste structure formed by Namboothiri Brahmins in Kerala, and have an important position in Theyyam. The people of these districts consider Theyyam as a channel to a God and they thus seek blessings in Theyyam.

Arriving there, we saw all the details of this festival. Artists or worshipers do make-up, for the performance or worship. The thing that attracted me the most was the costumes and make-up of the performers. I noticed that all the materials and colours used for make-up are herbal. I was even more surprised to see 'organic costumes' of the artists. The costumes were made from coconut leaves, coconut and bettle nut tree bark, banana tree bark, etc. Costumes made from these may be one time usable, but they were also great to look at.

We came back with a unique experience. But only those visuals were floating around in my mind. My thoughts were filled with Theyyam's fragmented visuals and concepts. At the same time, Panikkar Sir's smiling face was also floating in front of my eyes. Did he want to tell me something special? Which I didn't understand. we came back to Sopanam with these thoughts in my mind. When we returned from Kannur to meet Sir, he reminded us about the next task. He did not give any opportunity to talk about Kannur's experience. Inevitably we got down to complete the next task. The next task was to see some performances. Some special performances mentioned by Sir.

We experienced Koodiyattam and Mohiniyattam. The performance was in the evening. The only source of light was lamps. The dim lit performance was like a trip on a time machine. As if we travelled centuries. The feeling was surreal.

Koodiyattam is a traditional performing art form of Kerala. It is a combination of ancient Sanskrit theatre with elements of Koothu, an ancient performing art, from the Sangam era. It is officially recognized by UNESCO as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Mohiniyattam, is one of the famous classical dance form of Kerala. It follows the, 'Lasya', a style described in Natya Shastra. It is a delicate, eros-filled ,feminine dance form. It is traditionally a solo dance, performed by women.

I had a wonderful experience. I rediscovered the roots of Indian theatre. I could feel our heritage and glorious past. One by one, things started to clear up for me. I could guess why Panikkar Sir gave us this series of tasks. However, the journey was not over yet. There was still a long way to go.

Gradually, I noticed a change of mind within myself. The way I approached began to change. I was able to realize in my mind that there is a greater India beyond the urban

splendor, superficiality, and bookish knowledge.

But our task was still incomplete. There we're many famous Ayurveda hospitals and colleges in the city of Trivandrum. Then we went to Trivandrum Government Ayurveda College. Several new things learnt there. The most interesting of these was the various methods of preserving organic products. This time things started to become crystal clear to me.

It was late at night when I reached Sopanam. It was not possible to meet Sir at that time. So, I had to wait till sunrise. I couldn't sleep that entire night. Countless thoughts flooded my mind. Even, I felt ashamed of myself for what I did. I laughed at my own stupidity. But in the end, I was swept away by an unimaginable, indescribable stream of joy. The joy of reaching the shore in a stormy night in a shattered, Shivered boat.

I ran to Panikkar Sir early in the morning. Even after reharsing the content of my cumulative opinions in my mind, I remained speechless as I could not figure out how to say it. He might have understood my state of mind. Gave me time. Then wanted to know what I meant. After much hesitation, I finally told him that I wanted to start my work from scratch.

"I want to keep the dignity that you have given me as a designer. Please allow me to reject my old design and let me redesign ."

Panikkar Sir gladly gave the permission. I redesigned everything from scratch. This time the costumes were made of jute mostly. No artificial colors used. Each material had its natural color. I used coconut and bark of betel-nut tree for ornamentation. Some fruit seeds were preserved and ornamented. The character of the costume changed. After finishing the work, my mind was filled with a strange satisfaction. It was great to see a glimpse of smile of satisfaction on Sir's face.

Then came the day of the show. The first show was in Trivandrum. The second show was in Delhi, at the Bharat Rang Mahotsav. And the third show was at Pondicherry, at the Adishakti Theater Repertory. We were supposed to attend the first three shows. Then come back. We must return to our own world. I was getting ready in my mind. I was also getting ready for the show. The day of the first show came.

Neeraj and me planned the lighting of the play. In the case of lighting we consciously avoided too many complications. we almost never used color in light. We tried to create an atmosphere as soft and calm as the light of a lamp. We tried to create a neutral space where the actor standing in the space and says that, look, I am a performer and I am just playing the character mentioned in front of you.

The first show was successful. Everything was going well. Everyone was busy preparing for the second show. But a question kept popping in my mind. I was looking for a suitable time and place when I could ask Sir. I got that opportunity after the successful completion of the second show .

I asked Sir, "Sir when you saw the sketch of costumes in my scrapbook for the first time and understood that you won't approve it, then why didn't you tell me that day? Why did you accept my demand and let me make the costumes as I wished. It was wastage of a lot of money. You could have barred me then. You could have told me to redesign at that very moment. If you said so, I would have accepted it."

Sir smiled softly. Then he said, "If I had told

you, you would have obeyed. But would you had believed it from heart ? You would always thought that the design you made was right. You were forced to change that. You would have felt like you had compromised. I didn't want that to happen. I wanted you to discover the flaws and imperfections of your design on your own.

So I wanted to give you that time. So that you could understand. You needed to find out for yourself. The mistakes must be recognized and corrected by the creator only. Even in life, you have to make the right decision. Remember, you are your own best teacher and guide. I listened to Sir with my mind and soul. That day I got the best lesson of my life.

Surprisingly, for a very ordinary student like me, he thought so much. He could have easily given me instructions, or could have ordered. In stead he allowed me the space of realisation. Gave so much importance in taching that lesson. Many days of my life have passed since then. Even today, when I think of the days left behind, my heart gets wet with gratitude to Sir. I bow my head in respect. He was universal to the extent that he assimilated and distilled from ancient theatre conventions beyond his own land, but ensured he drew his strength from the soil that nurtured him. Something he always wanted to teach us. Being natural and close to nature and tradition was his essence. I still carry that legacy within myself and it'll remain the same till my last breath.

Anindya Sanyal

Anindya Sanyal, an accomplished author, and former sub-editor of Shahar, Literary Magazine, is known for his works such as *Bilupto Smritir Gondhe, Majhkhaner Botam*and *Rasgulla Gayab, Sanyal Sahab.*
In *Rasgulla Vanished, Sanyal Sahab*, the translated and abridged version of *Rasgulla Gayab, Sanyal Sahab*, Anindya skillfully intertwines the disappearance of a beloved dessert with introspective narratives, delving deep into the intricacies of the human experience. Within the poignant tale lies a powerful moral, illuminating the harsh realities of job loss, closure of factories and accompanying struggles. Sanyal weaves together themes of adversity, loss, and the fragility of life's pleasures, captivating readers with his evocative storytelling and leaving them with a deeper understanding of the challenges faced by Sanyal Sahab and countless others in similar circumstances.

Rasgulla Vanished, Sanyal Sahab

(Translated from : 'Rasgulla Gayab, Sanyal Sahab')
An Abridged version

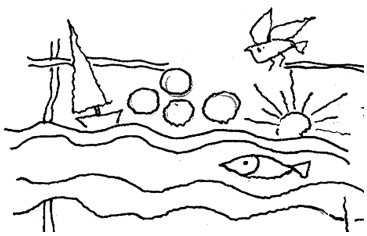

Sanyal Sahab was born of the stories the Neanderthals told and listened to around the fire, squatting in a circle.

My father liked stories, listened to stories, squatting, one hand turned around his back, resting on his hip. He swallowed the stories with his blinking narrow eyes. He liked to tell his own stories as well and interrupted the storyteller very often with his daydreams.

A few dogs snatching a piece of bone from each other, biting one another, growling, the beggars struggling for a plate made of Sal leaves, nothing left on it except a mammoth sized Rasogolla; *What have you achieved in your life, Sanyal Sahab ! You have lost your time Sanyal Sahab, you could have made your life much more decent. The boat that has already crossed the river will not return back before sunrise. Now wake up, let your daughter bring the fire to your mouth, let her light the funeral pyre.*

What a tremendous sacrifice, whole life I have struggled with this figure of bones packed up in a sack of skin, now where do you think you can take me to in your chariot, ha ha, I don't have any repentance, only habit has kept me fixed to this earth.

Sanyal Sahab sat up, that obvious squatting posture, the plate of Panta (a kind of semi fermented rice) in front of him, the summer whirling above his head, kwat-kwat sound of shuttle cocks coming from badminton court of the Officer's club, the unusual swimmer in his wet costume humming a Hindi song after coming out of the swimming pool, the vacuum feet of the bats on the glass window panel, the water loving gardener watering the shrubs of Dopati (Garden Balsam), Sanyal Sahab opened up his eyes, astonished, asked, Who are they ? Do I know all of them?

The water near the bathing point was calm, the aquatic creatures sank to the bottom of the water this time, sometimes the faint sound like a glub, like the sound of the heartbeat was audible. A train stopped at a small station beside a very low platform, so low that one had to hold the handle of the door carefully and after getting down on the platform asked for her hand to help her, holding a bag with his other hand. She tried to smile, he held her hand very carefully as if holding a very fragile object and suddenly remembered that she had vomited two times in the morning and after this journey might be feeling exhausted. They could have taken a Rikshaw, walking would be too bizarre an idea at this late evening, but remembering the condition of the road they experienced last time they decided to go on foot. They passed the cinema hall, now some shattered pillars and broken walls of a ghostly appearance, they passed the Dhaba (the roadside hotel) just at the juncture of Grand Trunk Road and Station Road, now a semi dark mysterious place with a few customers, an arrogant aroma of Egg Tarka filling the place, they walked cautiously on the bumpy roads with lot of potholes, she never left the part of her Saree which she held between her fingers and kept the Saree a few inches up her ankles. Suddenly the light of the bazaar was visible as a relief to the couple.

Ananyabrata assured her, the bazaar was not far away, suggested a cup of tea there if she wanted to take rest for a few minutes.

Sanyal Sahab had a style of walking that resembled a flying paper rocket, it looked like a moment's slowness would cost him something. He walked so fast as if going to return back a fish in the pond before it breathed it's last. He seemed to have no repentance, as if playing a game of Ludo and ready to cancel even a winning game, only the siren-like sound coming out of the factory was very important to him, and the clock also fastened it's belt around it's waist respecting his punctuality. But looking closely one could find lot of perforations, lot of folds where insects might have ended up in generations, reality was a mess, Sanyal Sahab managed all these by wetting the thinnest possible paper

with his saliva after stacking tobacco in it's fold.

Amitava once offered him a cigarette, slim and black, Ever seen this cigarette, its name is More, take a puff, you would fall in love. Oho, how are you smoking my dear, smoking or sucking a lollypop!

Coming back home Ananyabrata rushed to the washroom, cleansed his mouth, brushed, gurgled, did a lot of things to wipe off the evidence. Dad had a pouch of tobacco, whenever he opened the flap Ananya inhaled deeply as he liked the flavour, what a terrible day it was when Ananya tried to make a fag with this tobacco rolled in a newspaper not finding the fine paper actually meant for this purpose. The newspaper burnt like hell almost burning his nose.

All those Fires were now immersed in darkness. Fishes sometimes raised their heads above the surface of the water to find if the grim reaper had arrived. Assured of his delay they dove back into the water behind the algae and the water hyacinths and produced clusters of eggs. When they found their home

identifying two towering coconut trees the ding dong iron gate was wide open. They moved silently, a streak of candle light was leaking through the drawing room door, soaking the grass of the garden. He stopped, he could hear the faint sound of his mother sobbing. The bag dropped from his hand, Suchetana was also moved by the atmosphere, but controlled her tears, actually she hugged her child intensely in her womb. The cot where my Father was …. just yesterday … had a plate of rice, egg curry….. A candle was burning.

That memory haunted Ananyabrata throughout his life. A vacuum had been created where He actually stayed on and showed himself often on numerous window frames of the ruined colony. He used to plant chilli plants bearing small, round and very hot chillies, planted ladies' finger, brinjals, Ananyabrata was astonished to see how the fingers coming out straight upward trying to do a naughty fingering to the sky above. But Ananya didn't want to be Sanyal Sahab. He had never planted a single tree in his life. He wanted to do the opposite of his father. Sanyal Sahab didn't believe in Ghost, never was afraid of any paranormal but He had seen ghosts many times. Ananya never had seen a Ghost, but a tiny Ghost sometimes made eerie noise from the dark cobwebbed corner of the staircase at his rented housein Kolkata. Suchetana whispered to him, would you not wear the Kachha even for a single day? He didn't wear the Kaccha but somehow agreed to the proposal of shaving his head. (Kaccha – a two piece cloth a male mourner wears for a certain number of days after losing one of his parents. Shaving hair is also part of the same ritual).

When the blade was descending down behind his right ear, he observed a mischievous smile on the barber's face. Ananya felt like a tiny ant or some insect-like creature or in a strange imagination the messenger of hell started crawling from his toe and walking throughout his leg reached his thigh and sat down there to have a meal with the flesh of his thigh. He raised his hand to stop the barber, asked him why he was laughing and reminded him that everybody looked peculiar just after shaving their head. The barber swallowed his smile and started shaving his head. In new T-shirt and trouser he stood before the mirror, caressed his just shaven head with his hand and whispered, 'Shan Se'. (a dialogue of a bald headed villain in a famous Hindi movie, Shan Se meaning with pride or dignity).

They could not find a single tea stall open at that time in the market. Suchetana seemed tired, but she kept on showing a smiling face. Ananya was worried, he wanted to assure her, there must be a Tea store beside Jayshankar's potato godown. Suchetana replied, it's a matter of five more minutes of walking, don't worry, just walk slowly. There was still a crowd of seven or eight people in front of the chamber of Doctor Nitai, the homeopath practitioner. Sound of coughing and blowing nose. Loadshedding was still a big problem as suddenly the power went off and the entire area plunged into darkness. Every time whenever he camehome he shuddered with some fear, but he never mentioned even to himself the exact reason of the fear. This time knowing everything, a cold stream of shiver was constantly running throughout his spine. *Human being just changes his cloth*. His landlord, Ghosalbabu had given him a Gita knowing his passion of reading. A tiny abridged version, he immediately assumed

that Ghosalbabu would have received this at someone's funeral (gifting a book of Gita is a ritual in Hindu culture during the funeral ceremony). Sanyal Sahab might have left the sloka of *Vasamsi jirnani* to the next Sloka, he might be travelling from one page to the next, walking delicately like the cotton filled seeds of Simul, spreading by the wind in that extraordinarily romantic weather when Amitabh Bachchan sprayed gush of Colour on Rekha from huge Pitchkaris (water guns), the song of Rabindranath, mud water, the youngest daughter of Mitrababu, the washermen's huge water tank where the town's teenagers participated in a Holi gangbang, dried Garhi Chhuarra (dried coconut and dates), palm stamp on the walls with cow dung, Sunrays of afternoon poking infatuation for the next door girl; A candle just burnt out.

You all have…, Ananya couldn't believe that they had not waited for him.

Yes, his older sister took his bag and faded inside the darkness of the house like a heavy curtain.

Then in a huge mixer grinder raw meat, onion, chilli, garlic, ginger–The old Adil chacha was nodding his head while saying, Mix some chana Dal with this, then narrowed his eyes and said very confidently, But you can't make it like us, Bhiku Singh raised his head a little holding the border of the mixer grinder, said with a sleepy voice, Are you calling me Sahab? I am on my dibti (duty) Sahab, whole Zindagi (Life) I will be on my dibti, Ananya tried to wipe out a scar on the dish, failing, he called the waiter, Jahangir the waiter tried to explain that it was a crack on the dish, cracks were everywhere, like lots of scars on his life, wiping his hands in a frenzy he tried to convince his customer, if not convinced the customer might not visit the restaurant again, in a lifetime chance might come only once, only one shot, whether you accepted ten rupees or fifty rupees, he had learnt every worldly things holding the corner of his mother's Saree, Adil Chacha changed the dish of kebab, said that he was etim (orphan), I brought him here, Oho a child labour, if Adil chacha was not there the Government might have offered him fine Basmati on a gold dish, when Sanyal Sahab went to offer water in a burnt clay cup to that bearded man, almost naked, Dasbabu objected, Don't tease him Sanyal Sahab, you can't judge the motive of an insane.

But Ananya saw tears in the eyes of that insane man taking shelter in front of the closed gate of Bani Mandir club. The man forgot which was his right hand and which was left, nobody knew where he arrived from, Mom said, He might have escaped from Ranchi Mental Hospital, there was a rumour spreading throughout the town at that time of some inmates escaping some Mental Hospital. Sanyal Sahab ignoring the rumour said, Let him enjoy his freedom. The insane, or whatever he was, saw that the entire colony took a siesta in the late afternoon, in the evening the boys of the colony coming out from their quarters found that the man was replaced by a revolting stench of shit tried to cover up unsuccessfully by the empty burnt clay pot and the plate of Sal leaves which was offered to him with rice and vegetables.

He will not wear these Kaccha and all, I will go to the market and bring him some new clothes. Suchetana finally declared.

Ananya told her the story of the Sardarjee Tailor. His tiny shop was at the farthest corner

of the market. Whenever he visited him with his half pants and trousers Sardarjee used to tell him, Again you brought these to me? He knew where he should stich, where the manliness felt the maximum gravitational force. Sardarjee pushed his needle between his two thighs, but he never seemed unhappy with these minor jobs. For the important and glorious jobs there was a man called Salim. He used to come a few days before Durgapuja (the biggest festival of the Bengali Hindus), he was aware of the Sashthi, Saptami, Navami and all (the days of the festival), he knew how should the collar of the shirt look like, what should be the length of the shirt to the fraction of an inch and even if he delivered the dresses on Chaturthi (fourth day of the festival, the actual festival starts from the seventh day) the Sahab would obviously return back with some issues with the measurement and he would answer in his planned predetermined way and measuring the dresses again would say, I am finding everything ok Sahab, Oho, the waist is a bit tight, let me make it easy, he would tear off a few stitches, Aanaya would stand beside his Father, a few kids would obviously peep through the windows, Salim had lot of scars on his face as he once suffered from Pox. By the time Salim fixed the outfits Sanyal Sahab was offered tea boiled with ginger in a small stainless steel glass. Sipping the tea he followed up with the job Salim was on. Sewing, Salim would raise his face to Aananya and smiled and when he smiled only two of his front teeth were visible and he looked like a rabbit shown in the advertisement of Lijjat Papad. But without the dresses made by Salim, the daughter of the Bengalis would never have returned home, there would have been no beauty of the Kash flower (a grass native to the Indian subcontinent), the spider woman at the fair of Barokur would have suddenly become menstrual in the middle of the game and yawned and declaring her tiredness stopped the game forcing the game manager to return back the price of the tickets for the show. Without his stitches on your dresses the ink pot would have definitely tumbled on the unread novel by your favourite author, there would have been second October on the day of Ashtami and you could not find meat of any kind in the market. As it was a tradition in the family to have a grand feast on the eighth day of the festival with meat of either chicken or goat, falling the day on second October once resulted in a massacre. (Second October being the birthday of MK Gandhi and was observed as a day of nonviolence of any kind). No, you were not asked to put off your mosquito repellent. Ravi Kapoor, the driver and tour guide in Koomaon told him before entering Kaushani that if he wanted to buy some alcoholic beverage he could take it now, as Kaushani observed Dry throughout the weather. Why? he asked, astonished. Ravi smiled and said, because of that Old Man. On an eighth day of the festival they could not find a single meat shop open and they thought Salim might have made some fault on their trouser which must be repaired by the Sardarjee once the festival was over. At last they could find some Fishes, just captured from the Damodar river, but the kids were unhappy as they could manage bigger bones but not expert in taking care of finer ones of Fishes. Those days the system was religiously followed and availability of meat was not like today.

Ananya had painted Kumropatash (a famous character from Sukumar Ray's Aboltabol) on

the wall of the drawing room of their bungalow. Sometimes he used to stare at this funny animal character, as if it were a kind of demigod, or a Messiah to whom one should pray for anything he wished to achieve. If he ever had a religious book it was Abol Tabol for him, full of nonsense rhymes that built up his senses to perceive the way the world worked. But he could never steer his life even to a minimum decent comfort.When he realised, it was too late. Even worse, he discovered that his car lacked a break and the moment he realised the bare minimum requirement life demande d from a human being that he lacked, the car started rolling down the slope. He found that the car didn't even have a steering wheel either, no break, no gear, nothing, it was like a cart to which he was tied up and asked to pull. Exhausted and accepting his fate he thought of lighting a bidi (a mini cigarette filled with tobacco flake wrapped in a Tendu leaf) at least for some innocent comfort, but all the time smoking the bidi he had to hold the weight of the cart on his shoulder feeling the pain in the calf muscle. He wanted to draw the centre of gravity of the entire system of carrying a cart on his shoulder on a slope to find out some mathematical assurance and found that the line drawn met with the centre of gravity of another cart moving on a slope on the opposite surface of the earth like the Nile meeting the Ganges and then as silt gathered on the banks of the rivers sweat and hunger accumulated around the Holy Creation, slavery and migration of human being would now be repeated again like an eternal repetition, time would rotate and stand again at the same position guised as a new era, childhood memory of Molly would stand under the shed of bougainvillaea at evening filling the place with the fragrance of cheap perfume, the insane would burn the melancholy whores, breaking the sleepy shadow of the roadside trees Police would suddenly appear and smoking a cigarette claimed as his fee from a truck driver for letting him go peacefully and turning around

finding you would place his hand on your shoulder and say, Where from you are coming man, should I take you to police station? But again you would find some girl getting down from the opposite platform and walking along the lines. Ghatkopar (a place known for it's brothel) would appear again beside the railway track, the cultural stage would keep itself happy with its growing tummy, Abeer (coloured powder) would be thrown on neighbours on the day of Dol (Festival of colour), the boy of class eight playing his guitar at the annual function of the Officer's club while leaving the stage would stare stealthily whether Mou, the neighbourhood girl showed any change in her behaviour after listening to his guitar, Dasbabu would hurry up the ladies to have their dinner in the first batch; but some crazy people continuously nodded their head and repeatedly uttered, Nothing is correct, nothing is correct, Sab Jhut hai, everything is wrong. But they were always in a habit of objecting to many good things in the world and they always said, Everything is wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, sab jhut hai, sab kuch jhut hai.

Sanyal Sahab watched a black-and-white television, made by Telerama, an extinct company now, squatting in front of the device whenever there was some Bengali movie. Bengali movies were shown on Saturday evening only. He was not very fond of Hindi movies and watched them only for some climax and he was certain of the moment the heroine was going to declare that she was about to be a Mother now (Ma Bannewali hai) and smiling he would leave the Telerama Black & White to roll a cigarette once a 1962 movie was shown on a Saturday evening after almost three decades after it had first been released, Kanchanjangha, the entire shooting of the movie was done in Darjeeling, Oh yes, once they visited this mountain hamlet, what an innocent little boy he was, he wanted to ride a horse, horse riding being a popular activity in Darjeeling and he was offered a brown lame mare, definitely it was a mare, it carried him along the trail beside a steep ditch, trained and careful, affectionate towards their riders specially the kids. If Zulfikar sold the horseshoe one would

He could also realize some day that he must follow the understood that he was selling bravery and speed, selling courage, but by a hairline difference history could have been changed, the storyline might not have flown like this and suddenly stopped at the tea shop at the corner of the bazaar, might have asked for a cup of tea and a biscuit; but Zulfikar selling his horseshoes in front of the Kali Temple had a good number of customers and having his black horse standing beside him as evidence he sat on a mat spreading a few horseshoes, brassing and sharpening them, carving out rings from the metal. His customers bought the horseshoes to hang on the walls of their drawing rooms as good omen and were the believers of the magic rings made out of the metal of the horseshoe which had found them good son in laws.

Sanyal Sahab had a favourite programme on tv, The Lucy show, a comedy serial. That time the transmission of television channels was time bound. After the television channel closed for the day the colony went to sleep and the nights were probably darker than now and throughout the night they could hear the sound of the tyres of the trucks generated by friction as they moved slowly in que on the Grand Trunk road running beside the colony. When Dad was on night shift the night was the darkest, the barking of the dogs were more shrill and alarming. On such a night of dad's absence a thief came to find his fortune.

The regular thieves of midnight were of some special kind, they were not amateurs, not even violent, they did their job silently, climbing a wall, jumping on the courtyard, collecting their things of choice and again retuning back without any trace of their arrival. People were mainly worried of these types of thieves, afraid of losing their worldly belongings. That was a winter night and as usual very densely dark. From his childhood Ananya was provided a separate room of his own. Suddenly, mom whispered in his ear, a thief was there, in the courtyard, they could hear the sound of footsteps. Mom and his elder sister were scared, Ananya suddenly switched on the light and they all shouted. A few frequent footsteps and finally a blunt sound outside as if someone had thrown a sack of rice on the floor. They stayed awake throughout the night and in the morning finding some courage they opened up the door to the courtyard and found that the thief had only stolen their sleep, rather he had left half a pair of his plastic sandal.

Ananyabrata had many thoughts, always keeping him busy throughout the day. Yes, he thought that It's not mandatory that everybody would take away something with him, there were many instances of sacrifice, many instances of forsaking, even the ordinary folks never identified as doing some good for the mankind left something relevant unknowingly, apart from their excretions. Ananya enjoyed thinking like this. *Basically when we think about sacrificing something voluntarily we become emotional, sometimes philosophical, even we show the mason how well we can build our palace, let's talk something about the planning of building up something and spreading the seed to the following generations. To almost every parents their kids are carrying some brilliant seeds to carry throughout their life, in a simple word, very naughty, naughty being a sweet and affectionate word indeed*. With these types of naughty future generations some of my father's colleagues used to visit our home sometimes. They accompanied their parents just to show their creativity and expertise in doing naughty things, Saxena Sahab said, They are verrryy naughty, smiling and endorsing their mischievous play, they used to take away the whole plate of Chanachurs with the fists of both hands the moment my mom served the snacks, Mrs Tripathi uttering the words Badmash many times tried to snatch back the snacks from them, scolding them and teaching them the

modern age trend, realized what the customers wanted...

minimum decency and mannerism all the time glancing at us and throwing a smile through her dark lipstick stained lips. Mr Tripathi continuously nodded his head in a refusal note; my father used to call him Tea party confusing Ananya. Which one was a surname and which one was a party after all! Ananya could remember the same nodding of head of some tourist in Meghalaya who could not see the beautiful water fall of Nahkalikai, coming back and suggesting every tourist not to go down to try their luck. But Ananya pulled Suchetana by the arm and went down by the spiral staircase through the mist and like a curtain the mist slowly moved away unveiling the beauty of Nohkalikai and they experienced the beauty of the most spectacular waterfall he had ever seen.

Basically, the way the job rotation of cloud, rain and sunshine made Cherapunji a magnificent description of beauty, our life also became the fishing net of Monglu the fisherman playing hide and seek within the earthly umbra and penumbra. He threw his fishing net on the river Damodar from his tiny dinghy near the bank of Gagna, the Crazy river, once in the Palaeolithic era hugged the fire to his heart and slept only to wake up time to time to get into the huts and colonies on both sides of its banks breaking the stones; someday the barrage was built just to add a feather to the history of industrialisation. Ananya could smell in the air somewhere near the temple, the roadside sweet shops were frying Kachuri, he stopped on the tiny stone half submerged in the slim waterflow coming from majestic Damodar, holding Suchetana's hand. There had been a famous temple there, it was said that the Goddess was always awake to listen to the suffering of her devotees, but Sanyal Sahab could not ask anything from her as every time he was inside the temple and bending to repeat the Mantras chanted by the Brahmin Priest he could see in front of his closed eyes the round white Kachuris dancing on the surface of the oil in a huge black Kadai (utensil to fry something). He could even smell the fragrance of Dalda (the oil to fry the Kachuris) snatching away the mixed fragrance of incense, flowers, fruits and camphor inside the Goddess's abode. These types of sweet shops one could see near every temple, where the devotees could keep their sandals, could take the flowers and incense sticks properly arranged for the Puja (the worship or offering to God) and after the completion of the rituals getting refreshment by breaking fast with Kachuris, Singaras and what not. The regular devotees even had specific shops of their choice, as if that was the best shop there. No advertisement cost, no special scheme like buy one get one for free, the shop owner just ran his business with his smile, the bread and Ghugni seller at Dalhousie area in Kolkata once told him, Don't think that I am a Vaishnav by my Kanthi (a threaded garland of Tulsi seed) , but I have taken Diksha from a Guru, very big Guru indeed, my hometown is in Howrah district, in a village, then swinging the pan with a little oil on it on the charcoal made flame he asked, Should I mix some onion and chilli in your omlette? He could also realize some day that he must follow the modern age trend, realized what the customers wanted, realized new age customers had an urge for healthy food and he started selling chicken soup, thirty two years he had been selling bread and omlette standing on footpath, he said that Arthritis was bound to attack him, a cataract surgery, all these were some natural phenomena, all these things his Gurudev had

already forecasted …… there must be some relief in depending on the next batsman after being run out taking some unnecessary chance, like mentioned in daily newspapers, the batsman threw his wicket, as if he had literally threw the wicket, some wooden structure, as if Sachin Tendulkar threw his wicket, yes sometimes we felt like that from the gallery, astonished, asked ourselves, why did he play such a nasty shot! whenever Jalaj (the name means aquatic) was fielding at the boundary line the supporters of the batting side would loudly call by his name in a rhythm, Oh Jalaj Ahoy jalaj sort of and Jalaj would obviously missed his task and the ball would pass between his legs beyond the boundary line. Mihir was hitting every ball, from twenty two runs for seven wickets to hundred and seven for seven, Mihir was smashing the Jamadoba Team, still the game was not so fast and was not like a short term game like T-20, even in an one day match there was some slowness, some foreplay before every batsman took his first shot, some relaxed pleasure for the spectators, like a scene developing in holding the hand of Devika Rani in a car, like Sharmila Tagore invoking lust with her dark lips in the black and white movies, then came a song, time having a nature to flow on and it had been proven by time itself, the song was Aja Aja Aja (come come come) or that song, oho, Ananya forgot the song but could remember the movie scene, two pairs of feet coming out from a tent rubbing each other in an abnormal way. What a movie to encourage their adolescence! On the contrary there had been some cinemas where the poor people ate puffed rice from aluminium bowl, scenes of famine, of war, heroes were unshaven, no song; people used to call them Art films. But those colourful movies, the movies with lot of songs, having good looking heroes and lot of unrealistic fights, heroine's father having big bungalow and German Shepherd, villain abducting beautiful girls and ultimately punished, all these things could not satisfy their adolescence completely. When Bablu, son of the Police Officer of the local Police Station took out the innocent looking cassette of a Hindi Movie from the VCR and inserted another similarly innocent cassette and pushed the play button of the VCR machine, colour television was a new gadget by the way, they were seventeen or eighteen, escaped the evening class of biology and found out how biology could also be entertaining and exciting, we sat still in front of the device with folded legs and palms rested on the lap as if praying to something. Their adolescence satisfied. But Ananya had spent most of his life having a conscious idea of a circle calling it a Hole all his life.

Throwing a stone far away and watching its trajectory, one could become a physicist and one could be a scoundrel. According to the theory of probability, the stone might have hit a mango at the topmost branch of a tree or might have dislocated the basket of cow dung cake carried by old Basanti, the woman notorious for her foul tongue. My stone considered the butt of an old retired Schoolmaster as it's target.

For the purpose of study or to escape from colony life, I let myself be assimilated into an imaginary city. Imaginary, because the city didn't match my idea which I had always associated with the imagination I had built for this city. My mother warned me about the city dwellers, even about the relatives with whom

we shared blood and gene structure as they were brought up in a different way, they were habituated to the sweat and crowd of the buses and found relief when the pleasant breeze blew from the river Ganges and ate puffed rice with potato Chops beside the wide drains of municipality. I had a realization; Ananya understood how imbecile, how unsmart and how indecent he was in all aspects of life, he knew that when a new student entered a class and announced that he could write poetry one should respect him, but here he realized that one should always show one's superiority on others. Every day he discovered that he was different from the people around him.

Sanyal Sahab didn't have a headache for anybody's opinion about him, he was always immersed in his own thoughts. When he returned from B shift, it was quite late at night, Ananya only remained awake for him. Being a chemist by profession Sanyal Sahab loved finding out the result of the observations of oxidation reduction of the poems of Jibanananda and novels of Bibhutibhusan and Ananya waited for him to demonstrate his experiments with literature. Those reading and studying together were like spices sprinkled on the desire to go far away in a trolly moving on the railway tracks exactly as in the diaries of Bibhutibhusan to the remote forests of Narha Baihar, Siddheswar Dungri, Lobtulia on the Chhotonagpur plateau.

A priest was unfortunately called, he immediately was aware that this family was not so religious follower of the rituals. He said that he would not insist that they follow rigorously all the activities to keep the spirit in good health in his new abode. The elder brother of Sanyal Sahab came to attend the ritual and left disappointed after an hour of observing the rituals, which were cut short according to the bare minimum necessity to keep society and relatives to make any adverse comment. The big Sanyal, Sahab's elder brother sighed and said, My brother loved Puris, but you have not made arrangement for Puris today. Ananya whispered so that he could not hear, My father loved Mutton too (the ritual doesn't allow any food procured by killing animals). Lee Sung, he had another name although, Philips, he spoke in Mandarin with the other shoe sellers at Bentinck Street, but he used to speak in broken Hindi & English with Annaya. Once Philips told him after his mother's demise that he left some food at the burial ground for the peace of the soul of his mother. What he kept there? A little rice, A little pork, a piece of Chikkin and a glass of beer. His mother loved all these worldly subjects. Aha, Ananya's soul would also love to have such a wonderful meal. Ananya always thought about creating a religion as per his choice, as if some Supernatural had selected him as some messenger. Ahoy, the sons and daughters of Homo sapiens, when you were crossing the Red Sea it was twenty six feet deep with a high pulse rate and a scared heart, you gathered in groups and clans and tribes, *let's not deny the fact of the conjugal cranes*, after long search you found the fertile land beside the Parsian gulf, you produced lots of offspring, no chance to take a selfie, encouraged pleasure and hedonism, struggled for power, Man learnt to build History and learnt to adulterate History, Ananya could see all his memories of the colony shattered in the fire of the wooden

flame of his father's pyre, could not understand where actually he was standing while handing over his bag to his elder sister and asking her why they could not wait for him, he saw his KumroPatash burning in the flame of the Chita (funeral pyre), saw the bones, the tibia, the femur and all of Sanyal Sahab was breaking in the fire with cracking sound.

He left the city of his college life and travelled a lot, maintaining contact with Suchetana by letters only. Someday he felt that letters must be replaced with actual lady of his love. Luku Ali asked him, where would you keep your wife? Ananya didn't have a proper address. There was a river beside his one-room temporary cottage, its name was Dhonsiri and wherever it flowed carried an aura of melancholy with her. Just after marriage, they lived at a place near Dhonsiri for a couple of months. They always tried to save time from cooking and other worldly affairs and depended only on readymade food and Koni (egg in Asamese) which one could add to any cuisine and could be eaten any time of the day. Luku Ali was the grocer there, he supplied them packets after packets of Chanachur (a fried snacks), mastered sauce, rice, soap, Maggi noodles and other grocery items on credit and sometimes invited him behind the closed shutter of his shop at night after his day was over to take a note of the credit he had already offered him. The register or the loan book was opened along with the sound of the opening of a whiskey bottle. After having the first peg, Luku would obviously keep his loan book aside and asked, How can you eat so much of noodles and eggs! don't you eat vegetables, fish any other things? Do you know how many eggs are there in a crate? It's thirty, thirty eggs you two have consumed in last two days! Are you the descendants of Ravana?

One could easily get these types of friends, everywhere.

Ramu the Odiya loved him a lot, he used to bring special weed for him and would pass it on to him above the toilet door when he had constipation. It was a special weed from Odisha. What a pleasure it was having that kind of weed when you are on …… *lets not divert our direction, lets not lose the railway track*, but in bigger stations it was difficult even to stare between the railway lines, specially in the morning when the train stopped at the stations, some of the passengers would definitely use the toilets to relieve themselves and all of their excretion would have to be removed by spraying water with unimaginable force of hosepipes. Ananya generally avoided using toilets when the train stopped at some station, he would love the scene of the train leaving the station slowly, then accelerating, all sitting by a window. The image of a train leaving a station always offered him a kind of intoxication, a melancholic but addictive feeling of leaving something, leaving some place, leaving friends, leaving everything he could feel, smell, touch and smile at could capture his senses on hours, the humming sound, the red shirts of the porters, Wheeler's book stall who started selling pumping pillows, chains and locks, paper soaps along with books that they were actually invented for, everything added up to his melancholic and intoxicating feeling which he mostly cherished. He saw his father seeing him off someday and saw him walking back, slightly bent, the moment the train started, Ananya

could have stayed at the door to watch him for some longer time, but could not dare to do so, but someday he could stay longer watching Suchetana shedding her tears, Ananya could feel like a hero of a movie scene, sort of Aamir Khan, what a nomadic life he lived those days. Once he observed a group of passengers, two men and three women opening up the ceiling of the train with screw drivers after the train left Alipurdooar. There was a gap between the false ceiling and the roof of the train and the women passed on some packets filled up with sugar like things to the men who hurriedly stacked those packets in that passage so carefully that Ananya never kept his books with that much care in the bookshelves ever in his life. After keeping all the packets neatly arranged in that hollow space, they screwed the lids into their proper positions. As in a movie, the police generally showed up after the crime was done and they had nothing to do, some TTE escorted by a police force came searching for who knew what and asked every passenger what they were carrying. The group of that mischievous passengers had nothing important except some bags of inner garments and towels. They offered their bags to them chewing puffed rice and finally the TTE found a Walkman from Ananya's belongings and suspected that it was a kind of smuggled good. They asked for the invoice of the electronic item to prove that it was not a stolen or smuggled thing. Fortunately, it was a Philips product and an old one. Ananya was coming back to Kolkata to marry Suchetana this time and suddenly he could remember that he had some weed in his bag which Ramu had nicely packed for his friends at Kolkata. A chilled flow of ice ran through his spine, the Walkman had saved him, he stared at the group of men and women innocently chewing Muri (puffed rice). He got down from his upper birth and went to the door, lit a cigarette (that time it was not banned smoking inside a train) angrily cursing the group of smugglers. But what they were carrying! coming back he saw them opening up the lids with screw drivers and taking out the packs of sugar like things, the women arranging them neatly in the bags covering them with inner garments and towels. After everything was completed they sat down again and started chewing the left over of their Muri enjoying the conversation of the returning ticket checkers and policemen as they were saying, No, the news was wrong, there was no such thing in our train.

We call a stream of clean water which flows in front of our home a River. The water flowing stealthily at the back of our home, not trying to show its face is called a drain.

Did I define something?

Ananyabrata did not define anything. He didn't know how to define something. He was darpok, coward; but those in the habit of saying like I don't care and always teased others and coloured them as Darpok or coward, throwing shame shame sort of abusive words at them and tried to come out first after the first faint sound a thief could make in the night, but most of the time found in veils during a time of revolution. They most of the time swam in the direction the herd walked. They spread their wings according to the direction of the wind, they definitely would fly away if they could, otherwise they would be infected by bird flu with the whole society. Sanyal Sahab had minor demands. He wished for things like a small garden, a cup of flavoured tea returning

back from day's job, a little of The Statesman, a handful of brinjal, fresh chilli growing in his garden and always asking for all these small things had made himself a very small man, tiny and fragile. Once during a boat riding on Damodar near Panchet dam the son of Chatterjee Sahab, the little rat was asking everyone, whether they all would be saved if the boat drowned in the water and receiving no answer asked how he would have his lunch if the boat really drowned. Our fathers had large sized bottles in the Officer's picnic, we had smaller bottles of Campa Cola, Fanta, not only for refreshing our guts, but to shake the bottles to observe how the sugary carbonated water came out like jet as if like water gushing from Pichkari (water gun) we used in Holi. No, it was not like the pichkari used by Amitabh Bachchan, it was a spraying object made to give us a feeling of entertainment by wasting edible things. It was like the unused grains rotting in the grain storage and the price of grains touching the clouds inspiring the romantic poets to write something about Love, it was like wastage of paper by some young writer who had written only to please the parents of his fiancée, counting the words so that the story could be adjusted in the Sunday edition of the daily newspaper. If just breathing in and out called living, then we just lived Sanyal Sahab, we all just lived, but still felt melancholy engulfing us leaving the chair we sat at for so long time; tears we observed when Dasbabu retired and left his chair to Roybabu after so many years of smashing his butt and farting on it. A briefcase full of callous infatuation towards this short mortal life! Rasgulla was served at the end of that fabulous picnic, but the beggars could not wait any more, throughout the day they had been waiting and observed the Babus and Sahabs playing with the foods and beverages. They dreamt about licking the leftovers from the plates made of Sal leaves, their saliva was dripping imagining a bone of a chicken which could still have immense sap to satisfy their lust, but some of them were more fascinated looking at the shining white Rasgullas, the beautiful spheres, larger than the Earth, brighter that the Sun.

We called a stream of water flowing in front of our home a Ganges. If we called the water flowing stealthily at the back of our home Hoang Ho the cheap market would stare at us. Finding Laxmi and Ganesha idols during Dewali in Canning Street market having narrow eyes Ananya could remember a doll, a Black Seal, gifted to his friend by his American girlfriend. Lifting it's black fur he

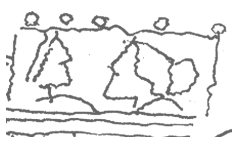

The game of an ancient market survived in the lap of civilization. Paradox evolved from this theory of survival, people debated on good and bad, and many good men stealthily visited them and returned back home and taught their sons and daughters mathematics, bought gold jewelleries to their wives.

could smell Beijing. Playing secularism his uncle went to Bengal Meat Shop at Belgachia in 1992 and returned back as if he won a trophy, Ananya remembered 1984, people said, violence was controlled in Bengal, he had seen young Sardars offering Sharbat during their festivals to the travellers, he was offered immense hospitality in the Gurdwara at Manikaran, but animal flesh, cigarette, Sharab (wine) was not allowed. Returning back from Manikaran he entered a roadside pub and had beer and as beer could not stay for long time in someone's body he asked the driver of the cab to stop somewhere beside the road and almost fainted observing the beauty of Pin Parbat while urinating on the bark of a Rhododendron. He thought at that moment that he would quit smoking, but ……. What a life he was still carrying over his shoulder, the whole world was minced in pieces like the flesh and bones of Bhiku Singh who was killed in the rotary kiln of the factory.

Mom sometimes murmured in her monologue, No, we can't stay here, we can't stay here anymore. The factory didn't announce it's closure yet. So some too optimists still gathered in the market, in the tea stalls, near the chamber of Nitai the homeopath. The foxes who were pushed into the jungle as the factory and the bungalows and the colony grew up started coming back again to capture their lost territory. They entered the abandoned houses and learnt to sleep there like dogs. Bharat Singh, once a wrestler wiped his tear in front of his Hanumanjee offering his deity a tiny piece of jaggery; one could easily hold his butt now with his fist, Oh, howthin and fragile he became. Salim left his aristocracy and started sewing everything, even he could now take over the job of sewing the balls of the half pants. Ananyabrata packed up some dresses and a few books and striding the staircase to his room number thirtyone at the third floor of his hostel saw huge windows, gush of wind filled his room the moment he opened them, DC current, the ever moaning sound of the fan, one could even count the number of blades even while the fan was on. He was given a narrow cot made for half a person, a desk and a wardrobe all filled up and reigned by bugs. That time he was trying to fathom out the city. He was like the old people of the villages who stared at the escalators of the metro railway stations. But he had many relatives scattered like dust almost every corner of the city of Kolkata. But solitariness was his habit and was injected into his veins. During night he was mostly found at the enormous rooftop of the hostel building, alone, smoking his Charminar (one of the cheapest cigarettes and without filter). Sudha was not far away. It was a fifteen minutes' distance if one walked from this rooftop and one minute thirty two seconds if one could fly. He could even imagine that Sudha's drawing room was visible from the roof of his hostel. But he could not distinguish which was the light Sudha showing amongst all the other lights of this city. He had visited his aunt's house a few times, his aunt asked him to stay with them, but Sudha was like a distant dream. Moreover, they lived in an ancient building constructed during the time of Lord Dalhousie. He always discovered a kind of smell of burning coke and cow dung cakes whenever he sat in front of Sudha. The smell came from his shirts, his appearance. Sudha was smart, frivolous, clever. Whenever

he stared at her he could feel his eyes rotating in cylindrical axis, but there was fun in that age, age of unreason, age of youth, more he thought about immersing himself in that fun, the more he missed the fun, he rotated throughout the circumference of that circle of fun. He had not yet lost the concept of that circle, it was like wiping one's finger around the rim of the empty bottle of butter to get some leftover, one day he didn't return to his hostel, they slept together and it was revealed by Sudha in the next morning that last night a ghostly leg had reached her thigh uplifting her nightdress and left her when she threatened it with a slap. It was a normal and casual incident in a house Sudha lived in. These eerie occurrences. Once there was a grave where their house was built. All bullshit stories. One could see these types of houses beside the Ganges travelling in a steamer from Howrah to Shovabazar. One could even see angels sitting on the rooftops of these houses. One could find angels at evening in the vicinity of such houses in Shovabazar standing for their one night's lover, colourfully dressed and stinkingly perfumed. The game of an ancient market survived in the lap of civilization. Paradox evolved from this theory of survival, people debated on good and bad, and many good men stealthily visited them and returned back home and taught their sons and daughters mathematics, bought gold jewelleries to their wives. Mom used to buy even a spoon at the time of Dhanteras inspired by her neighbours who believed in buying something, especially ornaments made of gold on this auspicious day. But as she could not afford to buy ornaments the spoon served as proxy to a new metallic object considered as property. This was a kind of learning by observation.

Business having a tendency to make something a rule to allure customers with discounts of 20%, 30%, 40% , even this system being cliché day by day formulating new marketing strategies, buy one mouse, get one cat free, MBA & MBA, get a blade for a handful of lentils, a bottle of mustard oil for a dozen of eggs, a cow for a mobile phone, Oh the age old bartering system, Oh making of an artificial world stacking a pack of cards, tug of war of money, the change of direction of the flowing water as if the Earth moving and holding a dish full of water and balancing it while rotating around the stupid Sun who still couldn't realize what all these restless rotation around him for ! Ananyabrata could never realise why Sudha talked with him for hours on end, he could never reveal the secret of the urge he felt every evening to make a visit to the Ghostly house of Sudha, actually he was finding some opportunity to,at least even for a moment to place his face on her cleavage as he was sure of some heavenly fragrance which he could have found only from the gorge between her mounds. He wanted to ride a horse, not a lame one as he was offered in Darjeeling, but a robust one like something used by the Kings and Bollywood Heroes through the gorge keeping the mysterious mountains on both sides. Sudha was aware of his solitariness, his restlessness and as she was astute in taking advantage of his situation teased him with the stories of his boyfriends. She used to unpack the story of one boyfriend after another and threw them in front of him unfolded showing all the designs and colour on them like Shaikh Saifuddin, the cloth store dealer, spreading the bedsheets one after another and saying, Take this madam, this will be a big one, it can cover a cot of any size and he didn't feel any

fatigue like Sudha showing all her bedsheets, their design and colour. And on the bedsheets and underneath the blankets one could feel the other with lust, got married sometimes without caring for love, made Honeymoon in cold places even in winter to enjoy the huge potential of the cave of blankets, Ananya had seen various Honeymoon packages in many hotels in Manali (a hill station in Himachal), but why this Moon? He answered his own query, Moon was actually beautiful even from the ventilator of the rented one-roomhouse of Belgharia, they used to observe the full moon night through the ventilator, hugging each other in the bed. Ananya and Suchetana observed the moon crossing the boundary of the ventilator, Suchetana placing her head on Ananya's chest. But had the moon ever realized the obsession people felt towards him? He himself had taken the light as a loan and never felt about repaying the debt, an eternal liability. Sometimes Ananya observed abnormally large sized stars in the sky. If one stared at the sky for long time he could definitely find something to talk about. Sudha had never stared at the moon for such a long time, how could she afford to spend her time for nothing! In villages people loved to stare at the sky, they loved to gather in the evening to gossip, they had plenty of time. One could observe them while driving by the National Highway, they gathered beside the paddy fields, the broken huts, bathing in the twilight of the evening sky. But did they appreciate the beauty of the sky, talked about the stars and moon or were they indulged in the political gossip or the cost of the cold storage thinking about the season of potatoes? He never listened intently to Sudha. Sudha had also never listened to his stories with minimum attention. Only his words were supported by her words to build a sentence and he helped her to complete her stories with commas, exclamation marks and a smile perhaps. All the time while Sudha narrated her stories, he tried to find some opportunity to touch her hand. One day when there was a bad twilight and there was a stupid Saturday evening movie aired in the television his aunt left, saying it was better to visit some neighbour, Sudha suddenly came out from her blanket which she covered herself with after lunch and said throwing her hands on both sides, undulating like pendulum, I am feeling sex starved. This was so abrupt and unexpected that Ananya couldn't immediately found any word and after a few minutes of silence with terrific and never to be forgotten stupidity he said, So, how I may help you!

Ananya liked to call her cats Pussy. But Sudha was very clever, she immediately hushed the cat away.

The scene was cut at the very moment and a new reel started rolling, Gabuda came in the next scene. By the way, the sound of CUT was also heard even from the Sovabazar steamer station and room number thirty-one of his Hostel.

When this type of sound was produced it was easy to switch to another scene, like a troop of people started searching for a new place leaving their homeland with their family, their belongings, their cattle, ornaments and

spoons. But if they failed to reach a new land they fell on their faces with red T-shirt and inspired news agencies. Many Children were brought up being kicked on their ass by many languages and confused to call a country as their motherland. We decorated a lump of mud with all our intelligence, with emotions and with all our artificial dogmas and called it our Mother Earth. We glorified and took out various branches from the idea of Mother worship formulated and mystified from a biological factor only, a genealogical factor of human being while feeling to take refuge in the black bosoms of the idols standing in que at Kumartuli (a place in Kolkata where idols of Gods and Goddesses are made). So the word Refugee was an insulting and obscene word. The fact might be that the Homo sapiens originated 200,000 years ago in Africa, the Big Cat or Dakshin Roy (the Tiger deity of Sundarbans) might have originated from the place the dolls and electronic items came to Canning Street market from, then what an amazing thing to call anything original, anything distinctly carved out from Motherland ! We only narrated our stories squatting around the fire since long long time, a little addition of colour to those stories would not adulterate them, we only wanted to present them decorated with some cucumber and lettuce, adding some salt and pepper and narrated in such a way that Sanyal Sahab appeared, appeared those who left us long back, a closed gate of a factory and Gabuda came into the scene, but not in a sequence. If one presented them in a sequence it would be like buying tickets for an amusement park, otherwise it would be like releasing your stories in an open field and in open air. Ananyabrata found the second option more interesting.

The stone thrown out of innocent fun and just by speculation really hit its target. The heads of the boys immediately disappeared behind the boundary wall beside the temple. They could still hear the incessant flow of curses coming out of Chandan Babu, the retired School teacher who immediately stood up from his prostrating posture in front of the temple gate. They were thrilled by the abusive and indecent words continuously coming out from the other side of the wall as they could realise that they understood every slang uttered by the Old man. But like some people living their lives on speculating and throwing stones to anywhere as per their impulse, Ananya lived his life and realized it to the marrow of his bones. A senior at hostel called this type of life an effed up one. Now he couldn't even rewind his life and had to live on the life as described by the senior mate. One day a man desperately ran after a bus with two clumsy bags in his both hands and fortunately reaching the staircase could find some other hands who took him on board. Clumsily swinging with the motion of the bus he could find a seat beside Ananya and placing his bags on the floor grinned as if wanted some appreciation of his brilliant effort. The opportunist conductor rushed to the man and asked not only for the fair of travelling, but for the two clumsy bags also. The man suddenly stood up and acted like getting down from the bus, said angrily, Stop your bus, you are asking fare for these two bags! So now you would ask fare for my two balls! There was an argument, the bus stopped at the Ting of the bell by the conductor and the angry man offboarded. The conductor Tinged his Ghanti (bell) again and staring at Ananya said, did you observe how he spoke ? what a language he used ! Yes, Ananya

thought, the power of language; the vocabulary one carried with him, the dialect one practiced with, with one's way of speaking to others one could make home everywhere, if it failed even the closest person could move light-years apart. Playing a game like this he still tried to find who was Sudha to him; the evenings with Sudha sometimes vanished in a mist, his predetermined planning confused him in such a way that he forgot even his vocabulary. He suddenly woke up and rushed towards the staircases of his aunt's house and without stopping even for a moment and finding himself on the main road took out a cigarette, the cheapest Charminar, realized that now all the stones were hitting Chandan Babu, hitting his butt, exactly hitting his butthole. But still he threw a stone again and breaking a bud, escaping cascade of branches of a tall tree Suchetana fell to his palms. Like the story of the Water God returning back the axe to the woodcutter, the Water God grinning from ear to ear dropped Suchetana on his lap. Another thing he had observed many times was that if he ever wanted to throw a cigarette butt end through the gap of the window panes of five inches width, the cigarette would never find the way and rebound back to him. So he had made a theory that if someone like him targeted the window pane itself and pretended that he wanted the cigarette butt to hit back he would be ultimately successful in throwing it through the gaps. It was similar, targeting an unknown and being successful. And a game started. The game became serious. Writing letters from both sides became an obsession. The Hundred-year-old house of Sudha had exclusive marble on the floors. The house was on the road of a crowded city and a slab of a marble being so exclusive and costly that many stones were removed by sneak thieves one after another from the staircase and from the ground floor veranda; even Budhan the barber had also stolen one and used it as a seat for his customers on Ramdulal Sircar Street. What a round shaped eyes Budhan had, like an owl, he stared at everyone with those eyes, mouth gaping and always gathering some new information and kept them to be passed on later to his Deshwali Bhais (countrymen). Ananya had never seen a barber demonstrate such slow motion while moving his blade on his customer. He had never seen a house like this before. He had never seen a man like Gabuda who was an usher at a cinema hall, showing people their proper seats, who was afraid of Ghost; there were many people like him in the property of Abinash Lahiri, a house now claimed by the fourteen descendants. This was a common scenario in many such big old houses of North Calcutta. Gabuda couldn't sleep at night due to the Ghosts he believed in who would certainly strangle him if he ever closed his eyes. Returning from the cinema hall late after the night show was over he kept himself awake throughout the rest of the night at the first floor veranda dressed only in a Gamchha (a kind of handmade towel) around his waist and killing mosquitoes by clapping and eagerly waiting for the dawn. The moment he could sense the warmth of the Sun his fear of the Ghost disappeared and he rushed to his room at ground floor and slept like he had never slept for years. This Gabuda had a significant role in the movie when his appearance suddenly sounded like a CUT and the hero and heroine immediately forgot their performance (as there was no dialogue in the scene) and the script of the movie took a different way diverting from the original one.

Since then, Ananya had a tendency to disrupt the flow of a movie or a novel or a serious debate. Once he took advantage of the dark cinema hall with only a handful of audience scattered at different corners. Suchetana warned him and pushed his hand from her lap, stopped writing to him for long time. Ananya could remember Shankar talkies, the only cinema hall in their small town, he could remember frequent loadshedding and immediately after the power cut a few streams of light from battery driven torches started focusing on the screen so that naughty audience could be restricted from trying to imitate some movie scene on the screen. Amidst the frequent whistle of various notes from impatient audience they could hear the sound of the generator started roaring. Amjad Khan and Dharmendra reappeared again, only a few ceiling fans didn't move with the limited capacity of the generator. There was a nostalgic and funny smell of urine and Pan (betel leaf) in those cinema halls, no irritating and incredible price of popcorn being served and the suddenly found cancer of the heroine not only brought tears to the eyes of the housewives but the pain and trauma of the filmy characters stayed for ever with them. Similarly, the wrestling match at Barik Maidan remained fresh with him for many days. The days were mostly uneventful and a wrestling match, a Jatrapala (kind of folk theatre) or a Musical night had very intense appeal in those days. Sanyal Sahab being thin and fragile didn't take interest in sports like wrestling and fond of cricket only, Ananya tried football but after scoring a same side goal confusing between the friends and foe left the football ground for ever. We Bengalis were mostly intellectual creatures, especially those who reached their office at ten in the morning and opened their tiffin Box at half past one. But one had to ride a local train running towards Howrah Station from suburban towns during office hours to get a glimpse of the intellect of Bengalis. Riding these trains Ananya realized that actually he knew nothing, he was, was sort of an ignorant brute. He was repeatedly corrected of his wrongly spoken Bengali by some of his relatives and friends in Kolkata. Ananya saluted them, it was a common thing to find fault in other dialect of the same language, but it was felt as if Ananya and the other inhabitants of a distant town form Kolkata had definitely some ignorance in using mother tongue, as if they were still hanging from the skin of their mother's womb. But they had a buffalo like perseverance, kept on trying to learn the dialect of Kolkata but finally juxtaposed everything and never maintained the proper usage of commas, full stops and semicolons, as if Ananya had boarded a train which stopped wherever it pleased and ran like a rogue bull ignoring the stations where it was supposed to stop. He liked the double decker bus departing from Tala Park, Oh that Tala Park where he had first time married Suchetana in a ritual like manner that they thought resembled Gandharva but instead of offering one another garlands it was done by offering ice-creams and potato chops. After the marriage Suchetana started irritating him by asking him where he was going to be transferred to, Assam or Andhra Pradesh, asking him whether he would remember the marriage after leaving her. Suddenly Saigal held the hand of Jamuna Barua and a song started being played in the background in nasal voice. The entire Park became a magical garden, like Vrindavan, the exuberant Rai

pushed Prawn Pakoras bought from Bacchu's tiny store into the mouth of her beloved Shyam, presented her Shyam with her meagre income by teaching a few students, a T-shirt and a Jeans Trouser as Ananya had lost almost everything in a train while coming back to Kolkata. He slept like a dead sack of potato in a sleeper class compartment and when he woke up didn't find his suitcase. All his clothes, a few books and his University certificate were gone. The thief left nothing, the scoundrel had taken away even his pair of shoes. By accepting the T-shirt and the trouser he had only given her the commitment to write letters in return and left for Assam after this hidden and sudden marriage. He remembered the day he left Suchetana and not getting any reservation in any train took a bus to Siliguri and changed for another bus for Guahati. The bus left Siliguri in the evening and before entering the forest of Buxa halted near a Dhaba for the passengers to have dinner. The Trucks were in que taking a side of the road and Tum To Thahre Pardeshi (you are unknown to this place, and you don't know how to stay together) by Altaf Raza was coming from a Truck. The driver might also be feeling nostalgic and waiting for the night to get over. The conductor of the bus was hurrying up the passengers. Ananya lit a cigarette, he had a hidden dream, to open a Dhaba beside a road like this, forest engulfing everything just allowing the buses and trucks to go by, a tiny Dhaba, Tadka, Roti, Egg fry with four eggs, if possible Rongapani (liquor), until late at night the trucks would stop by, some buses, a few minutes of human presence, he would pour Sugar and fennel seed on the empty pot kept near the cash counter and when every trucks would leave, every bus said good night he would take rest on the Choupai (cot) staring at the stars prominent on the clean dark sky and Suchetana would definitely sit beside him and he would remember many a forgotten episodes, even the first kiss when Suchetana slowly removed his glasses and said, you need to remove it, remove it, otherwise …….. otherwise …… other……

Once he lost his glasses, the light from the whole universe stumbled just before his retina, so he came to the bazaar to find an Optician who could provide a pair of concave lenses, Ramu the Odiya was with him, he was a native of a remote village near Talcher at the foot of the Banrua hill. He got a job at this private company by satisfying a Babu working as a foreman during the construction of the NTPC Thermal Power Station. Ramu had a room adjacent to the office where he worked as a office peon. Ananya visited his room as Ramu was the only admirer of his talent. Ramu didn't speak while he read and offered him sometimes from his dinner. Ananya offered him from his bottle of Rum a few drops as Prasad. His tiny room was a refuge from the mess where Ananya had to share his room with few other colleagues and found it difficult to find a space for his study. Sometimes Nabin used to come, the crazy Nabin, always worried about getting completely bald someday. He tried every means to get his lost hairs back; Doctors and Sadhus, Fakirs and magicians. Someday Nabin wanted to get the used tea leaves Ramu had discarded after making tea in the office, as someone told him that tea could help him get back his hairs. But Pandeyjee advised him some bizarre brilliant medicine to apply on his head, the vaginal fluid of a young woman, but Nabin could never find this immensely

powerful medicine. Sometimes the Orthopaedic Surgeon Dr. Sunil Sarkar visited the office being the friend of the Boss of the office. Nabin was his assistant and immediately hearing the footsteps of Dr. Sarkar tried to find a hiding place. The Doctor walked like an army officer and riding the staircase produced immense noise of his shoes and Nabin could immediately guess his arrival. One day Dr. Sarkar found him escaping from Ramu's room and came to know that after his duty hours his one and only job was to find some medicine to cure his baldness.

This Doctor chatted with the Boss and the frequent topic of their discussion was how to drink whiskey, with soda, with water or just dipping some ice cubes to create a turmoil in the whole ocean of ecstasy.

The Doc had two dogs, two brilliant dogs and one donkey, Nabin.

Every season Ananya brought home a puppy from the street. They made its bed with a jute sac, the puppy filled the house with its urine and shit and finally after living there for a few days became a street dog again. Mom couldn't tolerate it anymore. But it was provided with leftover food two times a day. Sudha had a lot of cats, their entire building and locality was full of cats. Sudha hugged them, adored them and liked to hide her face sometimes in the fur of a black plump cat. Ananya liked to call her cats Pussy. But Sudha was very clever, she immediately hushed the cat away. Actually she didn't have any Sudha (Sudha being the nectar) in her heart. But one day Sudha told him, All are going to attend some family function, even the ground floor talkative aunt would not be there. He asked her, Are you not going with them? She answered, I am staying alone. Ananya arrived at the right moment after everyone left except Sudha. They got their first flavour of Rum, Ananya bought it on her request, even the price of the bottle was sponsored by her. But they didn't know how to get the first sip. They found a stainless steel glass, the steel supplied by Tata Steel, poured the liquor without any measurement, added no water and sipped. Only one glass, but they didn't snatch the glass from each other after the first sip. Sudha took out a container of Muri (puffed rice) and said, this will help. The head started spinning after a few glasses, he could hear many voices, remembered many advises, someone told him people could speak with their eyes if they desired someone, yes, this conversation definitely started, they came to the terrace, a branch of a Pipul Tree stooping on the railing served the purpose of a curtain, he kissed her hand, Sudha parted her lips to say something and suddenly, unexpectedly the door shut behind opened by a gush of storm and Gabuda appeared, knotting his towel on his waist, stopped watching them and the Director of this scene shouted, CUT CUT CUT.

Is it so easy to cut something!

Try to go to another scene, the previous one would come back again.

When Salim scissored out the collar, the arms and length, his CUT was soft and affectionate. A sculpture could see the art inside the rough, neglected trunk of a tree and that vision made his hand so cruel that he could put the chisel on the wood to carve out his art. Sudha had never given him importance after this incident. She could guess his intentions and he felt like

algae and mosslike things gathering on the minimum respect he had for himself. He had seen Sudha a few times on College Street or Esplanade, but avoided to meet her, past his evenings walking on the streets in this meaningless Kolkata. Moreover, since his childhood a bull like similarity never escaped him and spiralled around his being like a Money plant, the only face he had shown to the world is the face of Dr. Jekyl for the sake of earning bread and butter only. He removed his mask every day after his evening shower. He had distanced himself from Sudha, but came closer to Rum and Whiskey, but still he had only one stainless steel glass with him and enjoyed the Rum with bread. He had left this city many times and came back only to find himself a beggar again and found his life flowing in gutter between his two legs. A two and half inch thick mattress on the floor was their bed, their perspiration mixed up while they slept, Suchetana passed a chewed chewing gum from her mouth to his like birds feeding their kids, frequent changes of rented house, tired by shifting the household packed up in bed sheets corners tied up in knots; still they felt the taste of heaven, Suchetana followed him to the bus stand to see him off in the morning and came back taking the road through the bazaar in search for cheap vegetables and fishes during the closing time of the market. Mobile Phone was yet to arrive and there was no communication with Ananya after he left for his Office. Amitava made wireless phone. He had a brain of a scientist. He made fire crackers during Diwali and once he experimented on bombs by packing gunpowder in a container of shoe polish and that tiny bomb had such tremendous explosion that the whole town was shaken and horrified. That time there was no decibel parameter and people enjoyed any type of fire crackers. Our childhood was desperate and fearless. Sanyal Sahab in his last days was asked to work at night in the factory. The Production was already stopped and a few employees like Sanyal Sahab were still in the company and were getting irregular wages. They actually didn't have any specific task to perform and were asked to visit the factory to watch the machineries and other assets. One day Sanyal Shab and Dutta Sahab saw Lakshman Mahato in the factory at night. They spoke to him, Lakshman giggled at them and said he went for a bowel clearance. When he left and both the Sahabs started walking they suddenly remembered Lakshman's body was separated in two pieces last week by Howrah-New Delhi Express. They immediately turned back flashing their light, He was just standing here, Dutta Sahab lifted the Bougainvillea branches and found the invasion of useless wild plants, Sanyal Sahab, did you not see him, he had saluted you.

Days were passing by smoothly, suddenly one day Mastan told him, Don't teach me anything today, let's have some other thing to chat Sir.

Sanyal murmured, Yes Dutta, didn't you ask him, How are you Lakshman? didn't you say, you are looking pale and thin? They silently returned back to the laboratory, where they actually worked and paid for. There was thick layer of dust on the beakers, funnels and all other laboratory things, spider web at the corner of the walls, Sanyal Sahab reduced his habit of smoking, these two Sahabs were among the remaining few Sahabs who could not escape, who had not even been paid for the last two months and everyday asked the old drunken clerk Unnikrishnan when the salary would arrive from Head Office. Sanyal Sahab took out a fine paper and started rolling out a cigarette with trembling hands, alzheimer's disease had already penetrated his nerves. Seeing Dutta's hand coming towards him Sanyal Sahab stopped making his fag and stared at his eyes, You told me you don't smoke anymore, Dutta! Yes, I don't smoke, but that Lakshman Mahato... I have once slapped him! Sanyal made a cigarette for him with little less tobacco and said, Are we awake Dutta? Sometimes I really forget.

Sanyal Sahab looked outside... the window and could see Lakhshman Mahato again, he was trying to say something waving his hands beside the bougainvillea branches. Staring at him with tired and dumb eyes Sanyal Sahab kept on smoking and tried to forget Lakshaman Mahato.

Some memories came back like vultures, and where they returned the place stank, one could smell the putrid and decomposed stench of skin and flesh and placenta washed by the drain water. Suchetana failing to keep him at home absenting from his office even for a single day as he didn't have leave granted except Sundays went with him to Sealdah in train without a ticket as they could afford only one ticket and seeing him off at the gate of the office returned back again taking the train again without a ticket. The passengers of Bandel and Sonarpur local knew everything. Everything was printed on the daily newspapers. One newspaper was shared by the entire compartment and they all came to know that Saurav Ganguly was given out by a wrong decision by the umpire in yesterday's match. Suchetana went to sell her silver anklet at the famous jewellery market of Bowbazar and couldn't find her expected price. But finally it was sold and they had noodles from a roadside vendor, sharing a single plate. Before boarding the train Ananya asked Suchetana to wait at the station, Why, Suchetana asked. Ananya spoke in the language only Suchetana could understand and indicated to a tiny stall near Baithakkhana Bazaar where candle sticks, incense and condoms were sold from a table. Suchetana caught hold of his shirt and pulled him to the station whispering, Don't you know how to control and withdrawing at the specific moment? They came back home and the Moon spoilt them again, Ananya couldn't control. Sitting beside the Nursing Home of Dr. Ghosh in a Tea stall Ananya could remember Sealdah Station, the stall selling candle stick, incense and Condoms and the first flower of the result of their love flew down the sewerage in front of the Tea Stall.

Sanyal Sahab used to walk with both hands folded and joined behind him, on his hip, always thinking something. Hearing his footsteps on the garden Mom immediately rushed out and asked, Did you get it, your salary? Sanyal Sahab replied, No, a few days

more. One month, two months and it was now three months delay in getting the salary. Many had already left the colony, the garden looked shabby, no gardener attended now and at this time Ananya passing his High School was adamant about going to Kolkata for graduation and started his life almost like a refugee. The hostel fee for him was enormous, although all of his friends were happy with the cheap Hostel canteen and education fee. He started teaching a few students to carry on his education and pay the Hostel bill. The day he received his remuneration from any of his tuition he immediately rushed to the Foreign liquor off shop at Bidhan Sarani and hiding a small bottle of Rum inside his shirt, went straight to his room number thirty one. Within a few days his room was named notorious thirty one. The juniors as they were afraid to speak to him finally found out this man was useless, no one could trace his day's routine, nobody knew when he woke up, when he came out and when he returned back and slept. One day, after extreme consumption the Rum wanted to come out of his stomach and brought with it all that he had at dinner. He vomited in the room, and late at night after the effect of the alcohol diminished, he came to the ground floor to find a broom to sweep his room. In that odd hour he found a guy with a red towel wrapped around his waist returning from the common lavatory swinging a bucket in his hand. The guy asked him, Who are you and what do you want here in our floor? but coming closer they recognised each other. Oh, you are thirty one? Oho, you are the great Johney the actor? They both found out that Johney the actor had a tiny cot just below the bed Ananya slept in, only there was a barrier of bricks and cement. They became friends and the best of friendships quickly developed.

Afterwards Ananya lived a sort of theatrical life led by Johney the actor and all the theories of Physics and Mathematics started rolling down a slope disrespecting all kinds of friction and he realised that the life was actually built upon uncertainty principle. But all the frictions he neglected accumulated later and suddenly prostrated in front of his journey and made his road uneven. Sudha, Johney the actor, loneliness, financial blackhole, rather his entire life being flowed in an illusion, all the Rasgullas vanished from his plate. They learnt the word Vanish from Mukul (a famous character of a movie, Sonar Kella), seeing the movie in television I had a desire to watch it in a cinema hall, on large screen and went to Nandan (a cinema hall), alone and this time Feluda (the Detective character) destroyed me completely. I had a temptation to light a Charminar cigarette like him, the naked Charminar as we called it (as it had no filter) and this time I was earning, so there was no obligation to get ruined by my own money. I was desperate and so fearless, and I didn't care about the burglars either and eventually lost my suitcase from a train containing all my belongings including my High School and University certificates and all the letters from Suchetana. But earning money to carry on his education at Kolkata was difficult. Getting an offer from a Police of Armherst Street Police station to instruct his eight-year-old kid how to draw apples and peacock, I accepted. The Police man was scared of his fat wife and was in search of a drawing tutor for a long time and was scolded by his wife everyday after returning from his duty without accompanied by that most wanted human being. Ananya could have

accepted any kind of offer, even he was ready to take the job of a music tutor, at least one month's salary he could have earned before being kicked out. One day Johney the actor asked him whether he would teach Physics to a student whom he taught English. He took him to Mastan, he was sitting on the veranda of a typical North Kolkata house built in ancient time. Mastan squatted on the veranda folding up his Lungi up to his loins to have a comfortable posture, had high power concave lenses and asked how much I wanted. I asked, where are your parents? No need to talk to my parents. How much do you want, three hundred? No, my dad would not pay that much. We negotiated and finalised two hundred and fifty. I would teach him two days a week, Tuesday and Friday, at eight in the morning. The first day he was introduced to Mastan's mother, a very talkative and coquettish sort of woman. She entered the room every now and then making some excuse and wanted to start a conversation. She told him, Please realise Sir, my son doesn't have any intention to carry on his education, but it's Higher Secondary and as you know Higher Secondary is so tough, but see he doesn't have any interest. Scold him, Sir, beat him if you like, but he should pass the exam. Mastan sometimes dozed off and drooled during our gossip, his mother immediately came back with a fan made of palm leaves and started beating him, shouting crazily. After a few days, the master understood that he just had to carry on with this job to get the payment as Mastan was not even going to write even a single letter on the exam sheet. However, after a few months he discovered that the payment was also getting delayed. Every tuition day the Mother offered him tea in a cup cracked at the rim and two cream biscuits and told him that Mastan's father couldn't remember to give her the money to pay his remuneration. But Mastan was helpful and took a pity on the condition of his tutor. He whispered to his ear once the mother left for the kitchen, You can find my father at Manasa Utensil shop. Where is it? Ananya was eager to know and could not wait. Mastan said, it's in Chhatubabu's bazaar. But don't go away if his staff tells you that Babu is not present. My dad keeps himself hidden behind the big aluminium utensils for fear of the creditors. There are many types of them who always disturb my dad. But Mastan didn't help him without being favoured. In exchange he had to give up his right to scold him, beating was a far away dream and he had to tell his mother that the student was learning very fast and he had to mark the book with pen for Mastan to show his dad what his master was teaching him. Days were passing by smoothly, suddenly one day Mastan told him, Don't teach me anything today, let's have some other thing to chat Sir. He had gifted the Physics book to some poor student and said, Sir, I can't continue the course, all bogus. But I know that you need money. You carry on with your tuition. Just don't say anything to Mom, otherwise you will lose your job. That day I came back to Hostel and worried for my two hundred and fifty rupees monthly payment and waited for Jonhney the actor to return back at his room late at night. He came back from his rehearsal of a drama and listening to my story of Mastan laughed out and said, He is the easiest student to handle. Just teach him anything and keep your job as long as you want. But what do you teach him? you are his English teacher? Yes, I teach him English. I just ask him to buy some English book what I want to read but can't afford to purchase

immediately. He buy the book and I read the book. Sometimes I underline with a pencil a few pages. That's it, very simple. Yes, it was indeed very simple. I told his mother to buy a few books, one was of Milan Kundera, another was of Gunter Grass, told her that without these two it was impossible for Mastan to even dare to sit at the exam of that prestigious Higher Secondary. When I read the book, Mastan dozed and whenever I heard the footstep of his mother coming with Tea in a cracked rimmed cup and two cream biscuits I pocked him with a pencil, and waking up Mastan immediately wiped off his saliva drooping off his chin.

But when a student discovered the weakness of his master, the master would definitely lose his dignity. One day Mastan insulted him, at least Ananya felt something like that. It had been raining incessantly for twenty four hours and Kolkata was almost drowning in rainwater mixed with overflowing drains. Finding one morning trying to warm itself with the bright Sunshine coming thorough the gaps of dark clouds I went to Mastan. His mother accompanied me on the staircase to their bedroom where Mastan was still sleeping and telling me Mastan had returned late at night and how they were worried and couldn't sleep the entire night thinking about his future. Even after we politely asked Mastan to wake up, he didn't. His mother suddenly started beating him furiously with the handle of the fan made up of palm tree leaves. Mastan woke up but once his mother left threw his body again on the bed and stretching his legs spoke in indistinct tone, Leave me today Sir, please leave me. The Two hundred and fifty rupees sparked in front of me, his father gave me One hundred rupees for the last month's job, another One hundred and fifty rupees was still due. I called Mastan politely, drenching my voice in as much Honey as I could create in my throat with my cough and saliva. Mastan sat on the bed resting his back on the wall and opening one eye grinned at me and said, Leave me Sir, yesterday I went to a very bad place. He stretched his arms and legs and keeping the legs pointing to me said, My friends Sir, they took me to that place. But Sir, it was a beautiful place. Hebby entertainment. He stared at me grinning, You must also visit the place Sir, very colourful nice place.

I couldn't control myself, I slapped him on the face. Mastan couldn't believe that an outsider, a person who was not anyone like his parents could slap him. I didn't wait for a single moment, coming down by the staircase made space for his mother to pass by with a cup of tea and two cream biscuits on a dish.

His mother sent a messenger to me after a few days requesting me to visit her. She had no grievance as the messenger assured me. I took time and thinking that she might be calling me to pay back my balance payment visited their home. The woman asked me to sit, brought me my cup of tea in the same cup with two cream biscuits and sitting in front of me suddenly sobbed and covered her face with her Saree. I had just started chewing the biscuits, but stopped immediately as the crunching sound seemed abnormal in that moment. I came to know that the woman lost her elder son a few years back, what a brilliant son he was, not interested in business, only liked to play guitar. She suddenly held my hands and asked me, Who is going to teach my son now? Please don't leave. He doesn't listen to any other tutor. Please come again.

Her tears were running like the Nohkalikai waterfalls, the tea was cold and the cream of the milk had already coated the surface of the tea, I saw the book of Milan Kundera on the bed, Life is elsewhere. But still I stood up, coming down I found Mastan squatting on the veranda like the first day we met. He stared at me and said, Go right away to my dad's shop. I have seen cash in his store yesterday night and it's still there. Ask him for your balance One hundred and fifty rupees, my Dad doesn't yet know that you have left.

I asked him, What is the date today? He tried to count with his fingers and replied, it's third day of August, I think. I smiled at him and said, In that case it's not One hundred and fifty, you should add another two hundred and fifty, how much is it now?

Sudha told him, Let's go to Digha. He stared at her with his dull eyes. To realise whether it was a serious proposal or just a fun he needed another stich from Sardar Uncle, Sardarjee tailor asked him, You brought them again? But how could he have brought them so early, there was no question of getting his balls so heavy within this short span of time. His sperm might have become more active in those dark and dense night waiting for someone to really offer him something amusing and thrilling. He asked grinning, What's there in Digha? He could feel five hundred rupees, all he had in his pocket. Sudha immediately cancelled her proposal, said, Yes, there is nothing in Digha. She might have wanted to get rid of this city for a few days. They had a falling aristocracy and felt the pinch of this every miserable day, finding slabs of marble stones stolen from their staircase and courtyard. But when the poor met the other poor they found that they could both be easily broken, they could not bow to command. They would never cry for water even in a desert, but Ananya had seen many a times someone to appear before him with an entire oasis unexpectedly; now he returned to his room number thirty one in his Hostel leaving the seashore of Digha behind a Jhau plantation. The night was spent with Johney the actor and they discussed art. Creativity couldn't be just so arbitrarily chosen form of some kind of expression, it definitely had some commitment, but what was that commitment for them? It was eleven or a few minutes more when Sanyal Sahab returned home from a B shift duty. Ananya was alert and immediately opened the door upon hearing the knock, as every other person was asleep by then. Sanyal Sahab had his rice and folding his Lungi sat comfortably to discuss literature with his son. He was fond of Jibanananda, a real Ghost in Bengali literature losing his life in an accident influencing generations afterwards. A chemist by profession, Sanyal Sahab started explaining the yellow legs of Starlings. Ananya felt himself like a Ghost, he sat on the windowsill with a book when at the opposite side of the road Mitrababu's daughter came to the window. Actually he

all the chimneys of the factory are silent, the heap of ashes, the tiny hill is laid down anticlockwise.

was reading nothing. Tushu ? what was her name ? Dad was in front of their Telerama TV, squatting, the wooden cover pushed on both sides to open up the universe of bioscope. What was the name of that Ghatak? Ananya knew only Anughatak (catalyst). Concentrated Sulphuric acid, acetic acid with ethanol, the laboratory filled with fruity smell, a melancholy Kite landed on the roof of the laboratory and suddenly became thoughtful inhaling the piece of flesh it was holding with its claws. Sudha pulled Ananya close to her bosom and said, You were drunk. When? You forgot! Suchetana suddenly hugged him and kissed, and the kiss was so long that he couldn't speak for an hour. A moon appeared beside the Papaya tree without touching its branches indebted by the light of his creditor, whom it would never pay back. The more the moon became bright the lives of people also brightened and the moon dropped down to every home, even to the shelters of the refugeesengulfing every Kojagori (a night of full moon when people of Bengal worship the Goddess of wealth and prosperity) with peace and harmony.

Let us imagine that during such a night of Kojagori, in the full moon of Autumn, a group of people moving towards the land which survived with the name of India, crossed rivers, canals, forests and escaping poisonous snakes and mosquitoes reached a land they never set foot on. Ritwik Ghatak's camera rolled on with the sound of a steam engine and suddenly stopping in front of a wooden barricade uttered, I don't have any audience here, I have only thirteen readers, here scoundrels after scoundrels entertain themselves with DJ in a marriage party, disturbs the neighbours with fire crackers, here Sudha sips a mouthful of cold drink and dreams about having an air conditioner in her ancestral house, here Johney the actor shouts for commitments and observe their clever colleagues taking roles in Soap operas wiping the window panes of the studios. Let us assume that human is X and an animal is Y. X + Y, X+Y eventually X x Y and what a brilliant sum this became, life found the land coming out from the water, losing the fins and metamorphosed into the Gold button of the arm of a Shirt. Shakti uncle was in charge of the swimming pool, and during the rainy season he came to the border of the pool and asked everyone to come out whenever there was a chance of thunderstorm, but the kids were naughty, they knew how to get Snacks from the dishes, they swam deep into the swimming pool. Johney Wisemuller was a Tarzan, he made himself Tarzan by making wild sound covering his mouth from both sides with his palms. Being an ape man, one was proud to influence his kingdom of apes. The seashores were not like Digha, the group of tribes, wherever they found a little grass, a little pond, a white horse, a bull and a bullock cart which could offer them a loan, with low interest, a source of water from a hose pipe sounding like a shower, Saraswati never died, one could get some donation in the name of the Goddess of education and Sanyal Sahab telling them, the bunch of kids collecting donation for the festival to perform the worship of the Goddess, First spell the name of Saraswati, then I will give you five rupees.

The history had taken a different path, with the figure of the river taking the shape of a sickly branch of spinach. Otherwise there was granary, good sewerage and jacuzzi and although a question mark could be put on the

possibility of getting something special like Taj and there were wheels and intention to roll on, intention to go ahead, even if there was dildo it was submerged in the past within the earth; Sexuality being prehistoric natural aspect, people would only realise post societal formation the hollow dumb foundation underneath and the art and literature would again be taught with Kalashnikov held at one's back and eyes blindfolded with condoms; the artists would be mum as they still would have their mask on.

The God of the water came again for a few more times, some accepted the boon and some returned back the fishes to Damodar, some couldn't catch even a tiny fish, their Rasgullas were vanishing in nature. Sanyal Sahab couldn't catch even a fly in his life time.

Once, there was a grand picnic. The arrangement for the party was made beside the reservoir carved out breaking the heart of the range of hills which was visible from their courtyard and looked like an elephant sitting on it's folded legs. The day started with the sound of an alarm clock early in the morning and they all started dressing up, spraying perfume under the armpit, making the neck look white with powder. Packing up the kids in buses and sending off the Officers and Managers in cars, the clerks and junior staffs started in open Truck, shouting and cheering up the team. They swayed in the truck like cane branches, like Sanyal Sahab one day swayed and swung on the roof of a trekker unable to drive off the flies sitting on his face and reached the bank of Damodar. What a hurry he showed always, as if finishing off the game in this third planet of Sun as fast as possible. The Sanyasi asked Ananya, would your mother look nice without a Saree? it was the answer to his innocent question why the Mother Kali was wearing a Saree in the temple beside Damodar. He had never seen Kali in such a gorgeous dress before and he believed Maha Kal is also undisguised, we adorned him with our clumsy desires and he thought eternity as a nude cigarette like filterless Charminar and kept on questioning him, what next? They asked the What next since they learnt to make stories, since they were Neanderthal being, squatting and circling the fire pit and expected the storyteller to fabricate the ending according to their desire. Wrong ending could end up the storyteller in a wrong place.

And the tradition continued. Bought a trouser

Then?

The trouser was short

Then?

Then what! my balls were coming out

Oho! then, then then then then?

Sardarjee smiled and said, brought again? Sardarjee and Ananya had built up a kind of friendship. One day he was coming back home with a photo of Rabindranath Tagore in a decorated wooden framework for the occasion of birthday celebration of the poet. On the way he visited the tailor to take back a few trousers which he was still working on. Sardarjee stopped his work and staring at the photo asked him, is he your Guru? Good, Good, there should be some Guru.

Ananya couldn't fabricate any answer and said faintly, this is the photo of Rabindranath. We call him Kabi Guru (the Guru of the poets).

Harbinder Singh the tailor took the needle and the thread and smiled, Your Rabindernathjee had done a good job, he didn't shave.

Ananya also hated shaving throughout his life, his fair chick after the shaving always took on a greenish hue as if he had offered a family of algae to make their home there.

The Mother dressed up in Saree, wore garland and her forehead was decorated with Sandal paste; the Mother was offered bangles made up of conch shell and coral, her Bengali kids remained in milk and rice. Coming back from Library near Piplani bazaar he took out 175 ml bottle of Rum and pouring unadulterated into his throat remembered the stainless steel glass, sharing his drink with Sudha and trying to hug her. Sudha, wading him off said, You are drunk Ananya. After that nobody ever called him drunk. He never lost his senses even that day with Sudha. Gabuda never rescued anyone, never disrupted any scene, the history wrote itself in its own way, Ananya only saw Sudha's perpendicular position shifting to a horizontal position and a range of hills coming into shape on the surface of the earth.

Almost everyone finished their lunch, Shakti Das was calling for those who thought the Sun would not set today and continued with their drinks and gossip. Ananya was also left out, waiting for his father. Shakti Babu now yelled covering his mouth with the palms of both hands, This is the final call for the last batch, come quickly to have your lunch. They were served a little Fried rice and chicken, both were cold and the fish fries already exhausted. Outside the periphery of the picnic area, the beggars became impatient, although lots of plates with leftover were thrown at them. They had been taking the possession of those plates fighting with the stray dogs since the time of Bijan Bhattacharya, (Bijan Bhattacharya's play Nabanna on famine.) but nobody was uttering a single dialogue as it was in the play, rather they became violent. They finally snatched the Rasgulla from my plate. My dad just uttered a word to ward them off and suddenly stopped, letting my plate vanish from my hand. They entered the picnic premises finding a weak gap somewhere, they came in a huge group and attacked to have some fun, a kind of enjoyment in snatching food. They might have been furious and vindictive observing the white round bright sweets on so many plates, Ananya's hand coming down to the plate found the ground with scattered and burned out grass instead of his food. Hey, Sanyal Sahab, the Rasgulla finally vanished.

Not only Rasgulla, so many things slipped away from our lives, and new flesh started to come out on our stories beneath new feathers. The water droplets on the Dopati flowers condensed to form a kind of melancholy glue after the old gardener left. Aananya stared at the water drops on the petals and found that time had condensed to form a story now. He sat on an abandoned, unnoticed log of a broken tree electrocuted long time back and opened his laptop. He stared around with the inexpressive eyes of Jesus and saw a few listeners squatting and encircling him. He saw a funeral pyre nearby the Damodar in the distance. The Sannyasi held his chin and said, would your mother look good without a Saree? That's why we draped our Mother in Red Benarasi. Before going to offer his Puja to the Mother, Sanyal Sahab booked our Kachuris at the nearby shop where he kept his

sandals and told the confectioner to serve them hot Kachuris after the Puja. What wonderful Kachuris they made, white and plump, saliva dripping out and tongue ready to adore them. Ananyabrata started reading from his story sitting on the log, but after a few pages could not remember where the story started from. The story abruptly stopped at a station to change the engine, like the train to Ranchi stopped at Gomo station twenty five years back. They were served lentils with rice on a kind of plate having several compartments to keep different items and he remembered they oghurt which was like the vomit of a kid suffering from indigestion. Once the blue uniformed canteen workers took away the plates after their lunch the engine gave a melancholy whistle. The platform started moving, they crossed Kita, Ramganga, Johna and finally reached Ranchi where his grandfather lived. Various kinds of fruits were sold, Kend, Mother and Jackfruit. From the top of a Hill one could get a glimpse of the entire city. A temple on the hilltop, a well with water so deep inside one could not see it even, people in groups walked up to the hilltop during the night of Shivaratri, childless women kept promise to return back to worship the God at the temple at Mukteswar and performed a ritual to test themselves whether they were capable to give birth to the next generation. They were asked to pass through a slanting piece of stone precariously hanging from a cliff as a test to justify their claim to prove themselves fertile. Ananya could remember the Old Bangali Baba sitting on the lap of Himalaya advising his disciples, he could see clearly any time he closed his eyes the Sunrays shining on the snow-capped Himalayan mountain range, the Nandaghunti, Trishul, the Panchachulli, his dream of taking Sudha to a hotel at Digha broke with the sound of cups and dishes produced by the cooks of his Hostel and finding no money tried to pretend to sleep again folding his legs to his abdomen like an embryo. But he was shaken violently from the security of the womb, and somebody said, Let's have some Rum, water poured on the rum like the Gardener pouring water on the flowers and he finished his glass with just one gulp. Gabuda hearing their footsteps sat immediately on his bed, Sudha woke up from her siesta and saw with her round eyes Ananya sitting at her bedside wooden chair with a broken handle and swaying his legs. It was not something very astonishing to have Sudha sleeping with the door ajar. No Ravana was ever born to take her away to his Lanka. Sudha rubbed her eyes with the back of her hands and asked for a cigarette. Ananya could see Vivien Leigh when she held the cigarette with her lips, and he imagined himself in Sunglasses and felt like Uttam Kumar or Marcello Mastroianni but suddenly his story came near the slim and dry Khude river where the poor people used to graze their pigs, his story stopped near the mound of ashes which was a replica of a tiny hill for them. Unnecessary gossip tilted the clock and he returned to his Hostel room where the mammoth book of Thermodynamics and a bulb of twenty five watts were waiting for him.

They stood up from the grass field where the seating arrangement for the lunch was made. The plates were already looted and the picnic was over. They all returned in the same manner, kids in the buses, Officers in the cars and clerks in the open trucks, but most of the adults were now in a different mood, shouting and even saying those things which seemed

impossible to say in normal condition and suddenly someone raised the volume of the loudspeaker and a particular song reminded Ananya of a distant uncle of Amitava who could play the song with the sound of his fart. He could apply various tune to his farting sound and he was so skilled at this performance he could demonstrate this art to anyone and whenever asked to. He appeared sometimes during his visit to Amitava's house and his friend shut his mouth and wanted his uncle to leave the room. When he left after showing them his art the room remained in a silence for a few moments, much like the picnic spot which immersed in a serenity after the party ended and the beggars had claimed their rights and the train leaving a station accelerated in search of a new station, a new destination and even leaving the hope of going to Digha human relationship found new seashore, observed wave after wave, the ripples on the surface of a remote pond in a countryside, we looked at the sisters of our friends to establish new relationship, appreciated the beauty of a lady, now the wife of a friend, in a party, pretending to be drunk and observed the friend suddenly inventing some excuse left the party pulling the hand of his wife and searching desperately for a cab. Sensing some impatience among the listeners Ananya lifted up his eyes from his laptop and observed a few listeners leaving the group of people encircling him. He tried to read again and found his eyes moist, the commas, dashes and the words, all blurred, he wanted to have his glasses to get an addition of One dioptre, but would it serve the purpose? All he needed was a lens under which the ants would grow enormous wings, under which the Sun could be focussed on the things once obliterated, things not supposed to be brought back, memories once shared would instigate the agony and uneasiness of his relatives and they would stop calling him on the phone and the soul of Sanyal Sahab continuously uttered Vasamsi jirnani yatha vihaya, Vasamsi jirnani yatha vihaya, Vasamsi jirnani yatha vihaya and his body was uploaded on the roof of a trekker car and the lens focussed the Sun right on his slightly parted lips and when he found the coconut trees from the bazaar, and the open gate, and entered the half lit garden and stood near the slightly ajar door of their home, his elder sister came out and took his bag, and someone uttered in his ear, Everything is finished, everything is finished, we couldn't wait any longer, we cannot wait anymore, the people of this colony are tired of waiting, all the chimneys of the factory are silent, the heap of ashes, the tiny hill is laid down anticlockwise.

Chantal Rosengurt
(Argentina)

Artículo sobre mi arte

Cuando amás todas las artes en general, hacer un video musical animado en stop motion se convierte en la oportunidad de hacer confluir estéticamente tantos lenguajes artísticos en una sola obra (visual, musical, poético, literario, cinematográfico, de animación…) que finalmente poder verlo realizado es uno de los mayores placeres del universo, y ni que hablar cuando empieza a ser reconocido y aceptado por la comunidad internacional.

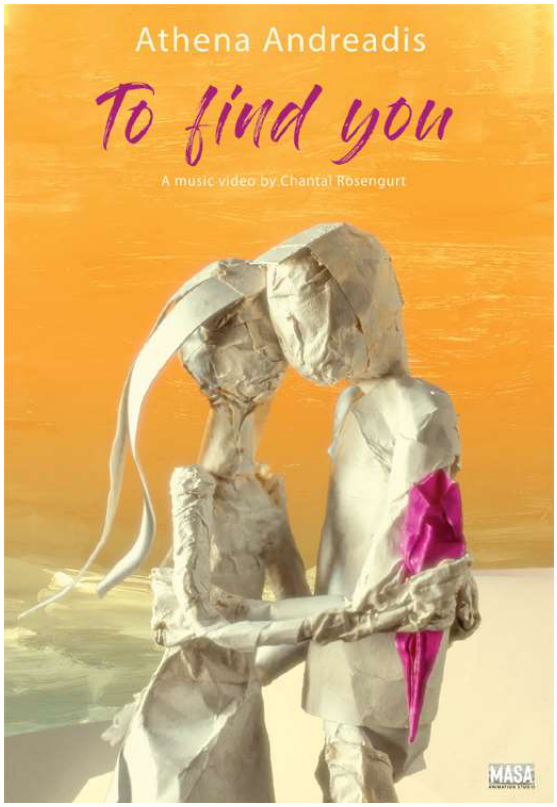

El año pasado, en 2022, tuve la oportunidad de hacer el video musical de la canción “To findyou” de la cantante y compositora greco estadounidense AthenaAndreadis. Si bien yo ya había trabajado como artista visual, ilustradora y animadora en diferentes proyectos, nunca había hecho como animadora una pieza de esta extensión y de la cual yo fuera la directora o realizadora integral. Siempre había sido parte de proyectos realizando alguna parte, o piezas más breves, alguna publicidad, algún explainer animados para alguna empresa, etc. Pero nunca este género ni esta magnitud de complejidad. Por lo que tenía bastante miedo. Afortunadamente y luego de mucho esfuerzo, terminé el trabajo, está subido ya al canal de Youtube de la artista con 10.000 vistas, y está siendo seleccionado en festivales de cine y animación de todo el mundo. Para que un poco más mis temores y de qué estoy hablando, esto quisiera contarles en qué consiste la aniamción en stop motion y cómo se realiza, el proceso, desde cero hasta la obra finalizada.

¿Qué es la animación en stop motion?
Es una de las formas de animación más antiguas en las que vemos muchas fotos, a una velocidad tan rápida ante nuestros ojos, que en vez de ver fotos nuestro cerebro interpreta eso y se genera la ilusión de movimiento. Es una forma de animación maravillosa, porque como artista uno puede jugar con cualquier cosa a la que pueda fotografiar. Desde objetos reales de la vida cotidiana, papeles coloreados en acuarelas, plastilina, puppets o marionetas creadas adrede, arena, sal, café, la luz de un celular en movimiento, hasta personas reales uno puede dirigir y animar en stop motion, lo que se llama pixilation.

¿Cómo es el proceso o workflow para realizar un video musical animado en stop motion?
Primero hay que conocer la letra de la canción y la melodía. Esa es la materia prima principal. Luego, yo siempre al trabajar con clientes charlo con ellos para saber cómo son, qué cosas les gusta, qué vínculo tienen ellos con la canción o el tema que quieren llevar al mundo de las imágenes, qué significado ellos le atribuyen a la letra, etc.
Esto me permite a partir de ahí generar un

concepto, una idea que puedo llevar a un guión, tla vez contar una historia, darle una estructura narrativa. Porque en el mundo audiovisual no se trata como en ilustración de convertir una idea en una imagen estática, sino en una sucesión de imágenes durante el tiempo que dura la canción para contar algo en ese tiempo y a través de esa sucesión de imágenes o escenas.

Una vez que está elaborado el guión y aprobado se empieza con el arte para la animación, la creación de un storyboard (como una historieta dibujada así nomás donde se ven las diferentes escenas, planos, composiciones visuales para narrar visualmente ese guión), y se empiezan a elabora visualmente los personajes, los fondos. Se elige una estética, un estilo visual que vaya acorde al guión y a las preferencias del cliente, o incluso del público al que esté orientada la pieza, por ejemplo si es infantil o no.

Una vez que se elaboran los diseños de personajes y de fondos se construyen los puppets. En el caso del vidoe Musical de To FindYou elegimos trabajar con fondos pintados al óleo sobre vidrio, y con personajes y props y escenografía realizada en papel y en origami. Esta mezla de óleo y papel yo ya la había trbajado antes en una ilustración y en una breve animación que había gustado mucho, por lo que teníamos confianza en que iba a funcionar. También elegimos (y hablo en plural porque yo le iba proponiendo cosas a Athena pero siempre fue con su acuerdo y aprobación y en un diálogo constante) trabajar con origami porque nos permitía generar formas reconocibles, con una belleza singular, pero donde no hay detalles; por ejemplo, no hay rostros. Esto lo tomé de otro video musical que amo, y de otras animaciones, etc, que es genial. Porque es increíble, cuando en arte no damos ciertos detalles abrimos la obra para que el espectador, el público, rellene ahí, e intereprete (A lo Umberto Eco con Obra abierta) con su imaginación, generándose un efecto maravilloso y a veces más conmovedor que con un rostro con boca y ojos. Pero el origami es un mundo y descubrí que los diseños de Origami tienen propiedad intelectual. Por lo que tuve, con la increíble ayuda de Jerónimo Paoletti, un origamista de mi ciudad (La Plata, Argentina) y quien realizó todas las piezas de origami que se ven en el video, pedir la cesión de derecho a cada origamista de cada prop que quería incorporar. Entonces por ejemplo le tuve que pedir derecho a uan chica de Vietman que diseñó el Dragón, a alguien de Italia, a alguien de México por los delfines, a alguien de Brasil por la brújula y así varios más. Por lo que en este video musical terminaron colaborando artistas de todo el mundo. Y eso fue un trabajo de dedicación, pedirle a cada uno esto, pero que hizo que el video musical tenga este plus que nunca se había visto antes. Una vez hecho el

arte, construidos los props en origami, los puppets en estructuras de alambre y masilla epoxi cubiertos de papel y cinta de papel, viene la parte de la animación en sí.

La animación es la captura fotográfica de cada instante para generar la sensación de movimiento. Así, si uno decide filmar en 24 FPS (frames o cuadros por segundo) ello significa que para tener 1 segundo de animación hay que tener 24 fotos. Y así uno va moviendo todo milímetro a milímetro y con la mayor precisión posible para generar movimietnos fluidos, creíbles, expresivos… Tirada hacia adelante, con la cintura rota, durante horas al calor de las luces del set. Luces que con un director de fotografía configuramos para cada escena, cada plano semanas antes.

En el video musical de "To findyou, optamos, gracias a Juan Martín Fourcaud, el genio que trabajó en la edición y posproducción, por filmar, capturar o animar por separado las figuras de papel del fondo pintado, entre otras cosas, para que por ejemplo los puppets no se mancharan de óleo. Es decir que usamos la famosa pantalla verde,

Finalmente, una vez terminado esto se pasa a lo que estaba anticipando: la edición, el montaje y la posproducción. EL montaje es eso, montar, juntar, como en un collage todas las secuencias que filmamos desordenadas para hacerlas entrar en lo que habíamos planeado en el story y el animatic, una versión animada del story. Había que quitar el fondo verde (nada fácil en algunas escenas), y luego de eso modificar digialmente el color, y agregar los efectos especiales apropiados.

Esto es la posproducción, trabajo que en stop motion es tan grande y complejo como el de animación. Porque no es como cuando se filma liveaction, donde todo está mayormente en escena, sino que es gracias a la posproducción que todo finalmente se ve armado y funcionando bellamente.

Y ahí sí, terminada la posproducción tenemos la obra lista.

Para que se den uan idea de los tiempos, este video musical de 3 minutos y medio nos llevó, y fuimos súper rápidos con la realización, 6 meses, medio año. Pero valió la pena.

La animación tiene eso de maravilloso. Yo he hecho ilustración, artes plásticas, escrito cuentos, tocado en bandas de música o improvisando con la batería y la percusión, incursionado un poquito en el teatro. Pero la animación tiene eso. La animación, y más en la de un video musical donde tenemos la letra y la música, lo que hacemos es dar vida, damos alma a algo, tan soberbiamente como Dios en su soplo a Adán, al viejo Adán de arcilla, como en una claymation, la primera claymation. Y la sensación de ver como todos esos fragmentos estancos finalmente y luego de tanto sudor y cansancio cobran vida, y llegan al alma de un hipotético espectador a través de los recursos poéticos y estéticos es simplemente maravilloso.

Ojalá pueda seguir haciendo esto mucho tiempo más. Cuando se aman las artes es un camino casi obligado, por lo menos sumamente deseado. Y qué mejor que dejarse llevar por estos senderos.